

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১: স্মার্ট বাংলাদেশের পথরেখা বনাম অভিভাবকদের উৎকর্ষা ও বাস্তবতা

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ ও স্মার্ট বাংলাদেশ

বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তার গতিপথ ঘোষণা করেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর নির্মল ও স্বচ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, যেখানে ভোগান্তিছাড়া স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা পাবে এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ এক সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এই প্রত্যয়গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব। উপরোক্ত প্রত্যয়গুলোর সারমর্ম হলো-

স্মার্ট সিটিজেন: দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে;

স্মার্ট ইকনোমি: অর্থনীতির সব কার্যক্রম তারা প্রযুক্তি ব্যবহার দ্বারা পরিচালনা করবে;

স্মার্ট গভর্নমেন্ট: স্মার্ট গভর্ন্যান্স বলতে বোঝায় সহজ, জবাবদিহিমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বচ্ছ শাসন। এক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের নীতি-নির্ধারণ, পরিধান ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণসহ একটি ব্যবহারবান্ধব সরকারের রূপরেখাকে বোঝায়। স্মার্ট সোসাইটি: সমাজে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনাচার প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করেই পার করতে সক্ষম হবে এবং তারা তাতেই অভ্যস্ত হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চারটি মৌলিক উপাদান স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি গড়ার জন্য প্রয়োজন স্মার্ট প্রজন্ম। একটি আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, সুখী, অভিযোজনে সক্ষম বিশ^নাগরিক গড়ার জন্য এ প্রজন্মকে তৈরি করতে প্রয়োজন শিক্ষার আধুনিকায়ন। এজন্যই সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ প্রণয়ন করেছে যেটি ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কাজে মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষা সংক্রান্ত ধারা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-‘১৭। রাষ্ট্র।

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদৃষ্টিপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’

‘সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে

যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য'-ই সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ প্রণয়ন, বিস্তারণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

শিক্ষাক্রমের ধারণা

আক্ষরিক অর্থে যাই হোক না কেন শিক্ষাক্রম শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যুগের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শিক্ষাক্রমের ধারণা ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে। তাই শিক্ষাক্রমের সর্বজনস্বীকৃত কোন একক সংজ্ঞা বা ধারণার উদ্ভব হয় নি। প্রাচীনকালে মানুষের বেঁচে থাকার দক্ষতা অর্জনই ছিল শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয়। ফলে তখনকার অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাক্রমের ধারণা বাস্তবরূপ পেতে থাকে এবং স্কটল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে তা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমেরিকায় শিক্ষাক্রমের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাক্রম বলতে course of study কতগুলো পাঠ্যবিষয়কে বুঝাত, যা অনুসরণ করে শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদান করতেন। সে সময় শিক্ষাক্রমের মূল ফোকাস ছিল শিশুর মানসিক এবং জ্ঞানের বিকাশ। এজন্য শিক্ষাক্রমে বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও মানসিক শৃঙ্খলা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদদেরও ধারণা ছিল, শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ ঘটাতে হলে স্কুলে শিক্ষাক্রমে কতগুলো অপরিহার্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এগুলো হলো মাতৃভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, পশ্চিমা ও দেশীয় ভাবধারার বিষয়। ফলে সে সময় শিক্ষাক্রমে বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ও সংকীর্ণ ধারণার পরিবর্তন হয়ে আধুনিক ধারণার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এসময় শিক্ষাক্রম বলতে স্কুল কর্তৃক পরিচালিত সকল শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে বুঝানো হতো। এ প্রসঙ্গে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাসওয়েল ও ক্যাম্পবেল (Caswell and Combell) শিক্ষাক্রমের পুরাতন ধারণার অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন ধারণা 'শিক্ষাক্রম হল শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা' প্রস্তাব করেন। সে সময়ের অন্যান্য শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণও (Smith et.al, ১৯৫৭ এবং Korr, ১৯৬৮) শিক্ষাক্রমের এ ধারণাকে সমর্থন করেন। এভাবে শিক্ষাক্রম তার সংকীর্ণ ধারণার গন্ডি পার হয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং শিক্ষাক্রম কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তে স্কুলের নিয়ন্ত্রিত সকল শিখন-অভিজ্ঞতার সমষ্টিরূপে পরিগণিত হতে থাকে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় স্কুল কর্তৃক কোন কোন অভিজ্ঞতা প্রদান করা হবে? শিক্ষার্থী ও বৃহত্তর সমাজ স্কুলের কাছে কোন অভিজ্ঞতাগুলো প্রত্যাশা করে? তাছাড়া স্কুল কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতারগুলোর মধ্যে কোনগুলো কাক্সিক্ষিত বা অনাকাক্সিক্ষিত তা শিক্ষাক্রমের এই ব্যাপক ধারণা থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রমের আরও সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য ধারণার অনুসন্ধান করতে থাকেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ রাফ টাইলার কর্তৃক প্রদত্ত ধারণায় শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত এ সমস্যার কিছুটা সমাধান পাওয়া যায়। তিনি প্রথম বলেন- শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুল কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত শিক্ষার্থীর সকল শিখন অভিজ্ঞতা। এতে দেখা যায় তিনি শিক্ষাক্রমকে স্কুল পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতা করার উপর জোর দিয়েছেন। এছাড়া ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি শিক্ষার্থীর জীবনে স্কুলের প্রভাব প্রকটরূপে দেখা যায়। ফলে এ সময় শিক্ষাক্রমের ধারণা পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে আমেরিকায় বেশ কিছু শিক্ষামূলক প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্রমকে ‘নির্দেশনামূলক পরিকল্পনা’(Instructional plan) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।

নিচে কয়েকজন মনীষীর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো যার দ্বারা শিক্ষাক্রমের ধারণা বুঝাতে সহায়ক হবে-

- হিলডা তাবা (১৯৬২): যুগের চিন্তাভাবনার অবয়বহীন ফসলই হলো শিক্ষাক্রম।
- হুইলার (১৯৬৭): শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদির একটি বৃত্তাকার গতিশীল কার্যক্রম।
- মার্শ এবং স্ট্যাফোর্ড (১৯৮৮): শিক্ষাক্রম হলো ‘পরিকল্পনা’ ও ‘অভিজ্ঞতার’ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি সেট যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।

শিক্ষাক্রমের বিবর্তন এবং উপরিলিখিত ধারণাগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় শিক্ষাক্রমের ধারণা যুগ যুগ ধরে নিম্নোক্তভাবে বিবর্তিত হয়েছে। যেমন: শিক্ষাক্রম হচ্ছে: ১) বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান, ২) মানসিক শৃঙ্খলা, ৩) স্কুল নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা, ৪) পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতা, ৫) শিক্ষাদান পরিকল্পনা, ৬) শিখনফল, ৭) জ্ঞানমূলক/অনুভূতিমূলক বিষয়বস্তু এবং প্রক্রিয়া, ৮) প্রযুক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ সকল দিক ব্যাখ্যা করে Daniel Tanner and Laurel N.Tanner ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্রমের একটি কার্যকর সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেন: “Curriculum is that reconstruction of knowledge and experience, systematically developed under the auspices of the school (or university) to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience.”

কেন শিক্ষাক্রম পরিবর্তন

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নের পর তার ভিত্তিতে ২০১২ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করে ২০১৩ সাল থেকে নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা হয়। ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে নানাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবন-যাপন প্রণালীতে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে ব্যাপকভাবে। কর্মক্ষেত্র ও কর্মধারার পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে এসেছে মনোজগতে পরিবর্তন যার প্রভাব পড়েছে খাদ্যাভাসসহ দৈনন্দিন আচরণে। এসকল পরিবর্তন দ্রুত বর্তমান প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেবার সহজ উপায় হলো শিক্ষাক্রমে

পরিবর্তন এনে পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা। এছাড়াও অনাগত পেশা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন ও তৈরি করা।

শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো-

- ✿ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময় পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি;
- ✿ বিষয় এবং পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ও চাপ কমিয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতায় গুরুত্ব আরোপ;
- ✿ গভীর শিখন (Deep learning)ও তার প্রয়োগে গুরুত্ব প্রদান;
- ✿ মুখস্থ নির্ভরতার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিখনে অগ্রাধিকার প্রদান;
- ✿ খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনের উপর গুরুত্ব প্রদান;
- ✿ নির্দিষ্ট দিনের শিখনকাজ যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শেষ হয় সে ধরনের শিখন কার্যক্রম পরিচালনা এবং আনন্দময় কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বাড়ির কাজের চাপ কমানো;
- ✿ নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত পারদর্শিতার মূল্যায়ন ও সনদ প্রাপ্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ;
- ✿ জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা।

পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট-

শিক্ষাক্রমপরিবর্তনের প্রেক্ষাপট হিসেবে যে সব বিষয়কে আমলে নেয়া হয়েছে সেগুলো হলো-

- ✿ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে জীবন-জীবিকার দ্রুত পরিবর্তন। যেখানে প্রচলিত পেশার তিনভাগের দুইভাগ ২০৩০ সালের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ৬৫% শিক্ষার্থী যারা এখন প্রাথমিক শিক্ষায় আছে তারা কর্মজগতে প্রবেশ করে যে কাজ করবে তা এখনো অজানা।
- ✿ কোভিডের মতো মহামারী, স্থানীয় ও বৈশিষ্ক অভিবাসন, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, সংঘাত, প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার, জীবিকার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে ভৌগোলিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের জীবনধারা ও মনোসামাজিক জগতে দ্রুত পরিবর্তন।
- ✿ এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
- ✿ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
- ✿ প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রমের নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যবিধান।

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর রূপকল্প (Vision)

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প অর্জনে প্রয়োজন সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। একটি কার্যকর পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই এ রূপকল্প অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। রূপকল্প বাস্তবায়নের

অভিলক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- ♣ সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন;
- ♣ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা;
- ♣ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি ও স্বীকৃতি প্রদান;
- ♣ সংবেদনশীল, জবাবদিহিতামূলক, একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- ♣ শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি নিয়োগ।

মূল যোগ্যতা (Core Competency)

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এযোগ্যতা বলতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতাকে বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়াও সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের অর্জনের জন্য ১০টি মূল যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো-

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।
২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।
৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্লেষণাত্মক প্রদর্শনপূর্বক বিশ্লেষণাত্মক নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।
৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ-ষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।
৫. পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।
৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্লেষণাত্মক কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।
৭. নিজের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বৈশিষ্ট্যক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।
৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।
৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

পূর্বতন ও বর্তমান শিক্ষাক্রমের মৌল পার্থক্য

প্রচলিত ও পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনায় নিলে দেখা যায় এখানে মতবাদ, দর্শন, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ ছাড়াও বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে মূল্যায়নে। শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন পূর্বেও ন্যায় কাগজ-কলমে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন না করে তার অভিজ্ঞতা, আচরণ, কর্মদক্ষতা ইত্যাদিও মাধ্যমে করা হবে। এক্ষেত্রে গাণিতিক নম্বর না দিয়ে জ্যামিতিক প্রতীক (চতুর্ভুজ, বৃত্ত, ত্রিভুজ) প্রদান করা হবে। বাৎসরিক ফলাফলের ভিত্তিতে রোল নং না দিয়ে একটি ইউনিক আইডি নং দেয়া যেটা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

নিচের টেবিলে ছক আকারে পূর্বতন ও বর্তমান শিক্ষাক্রমের প্রধান পার্থক্য দেখানো হলো-

Element	Present Curriculum	New Curriculum
Philosophy/ Theory/ Doctrine	Benjamin Samuel Bloom Taxonomy of Educational Objectives-1956 Based on Three Domains	David A Kolb Experiential Learning-1984 Based on a Cycle consists of Four components
Contents of Text Book	Flat, Narrative, Advice based	Incident, experience and example based
Teaching-Learning Process	Lecture, Participatory and Classroom based	Participatory, Observation and experience based- Indoor and outdoor both
Evaluation	Summative. Knowledge based Exam and roll no indicates merits. Only teachers are evaluator	Formative and Summative. Indicator and Behavior based. No Roll no. Result published by three words- Beginner, Developer/ Intermediate, Skilled. Teachers, students, parents and community are involved in evaluation process.

শিখন-শেখানো কৌশল

শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নয়, আরো অনেকে জড়িত থাকেন। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় জড়িত পক্ষগুলো হলো- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অবিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পাঠের পরিবেশ ইত্যাদি। শিক্ষা কার্যক্রম এখন আর শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বিষয়বস্তুর চাহিদানুযায়ী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের বাইরেও যেতে হবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক নাম হলো পেডাগোজি যা সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। একজন পেডাগোজিস্টের আধুনিক শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশলসমূহ আয়ত্ত্ব করতে হবে এবং

সেগুলো সফলভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের সামর্থ্য থাকতে হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এ শিখন-শেখানো কৌশলের যে দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা হলো-

- ♣ প্রেক্ষাপটভিত্তিক এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক।
- ♣ হাতে কলমে শিখন, প্রকল্প এবং সমস্যাভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ।
- ♣ অনলাইন ও মিশ্র শিখন।
- ♣ শিক্ষক সহায়তাকারী এবং শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।
- ♣ শিখন প্রক্রিয়ায় বিষয়সংশ্লিষ্ট কোনো বাস্তব জীবনধর্মী সমস্যা নির্ধারণ করে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ।
- ♣ শিখন পরিবেশ সহায়তামূলক, একীভূত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী।
- ♣ শিখন পরিবেশ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক।

নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন ও ইনক্লুশন

কোনো বিষয়ের শিখন উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা নিরূপণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিচার-বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই মূল্যায়ন বা উদ্বোধন। নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ জন্য যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো-

- মূল্যায়নকে কেবল শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন, শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন ও সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

- সকল ধরনের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হবে যোগ্যতা এবং পারদর্শিতা।

- শিক্ষাক্রমে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের যে সকল বিষয় অনুসরণ করা হবে সেগুলো হলো-

- ♣ যোগ্যতার মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ;
- ♣ শিখনের জন্য শিখনকালীন মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ;
- ♣ স্ব-মূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়ন, মূল্যায়নে অভিভাবক ও সমাজের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ;
- ♣ মুখস্থনির্ভর সামষ্টিক মূল্যায়ন হ্রাস;
- ♣ শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষাক্রমে ইনক্লুশন

- ♣ শিখনে শিশুর মধ্যে সমস্যা না খুঁজে, শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ধরনের দুর্বলতার জন্যে শিক্ষার্থী শিখনে পারছে না তা চিহ্নিত করা;

- ✿ শিক্ষার্থীর মাঝে সমস্যা খোঁজার পরিবর্তে শিক্ষাব্যবস্থা ও কাঠামোর প্রতিবন্ধকতাকে শনাক্ত ও দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ✿ জেন্ডার, ধর্ম-বর্ণ, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে শিশুর সামর্থ্য, চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যময়তা প্রস্ফুটিত করার উদ্যোগনেওয়া;
- ✿ শিক্ষাক্রমে নমনীয়তার মাধ্যমে ভিন্নভাবে সমর্থ (Differently abled) শিশু ও তৃতীয় লিঙ্গ ও অতি মেধাবী শিশুদের শিখন-চাহিদা, সক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ উদ্যোগনেওয়া।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রস্তাবিত মূল পরিবর্তনসমূহ

- ✿ সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন প্রবর্তন;
- ✿ ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য ১০টি বিষয় (প্রচলিত মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থাকবে না);
- ✿ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বিদ্যালয়, পরিবার ও সামাজিক পরিসরে অনুশীলন;
- ✿ শিখনকালীন মূল্যায়ন;
- ✿ শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে দশম শ্রেণি শেষে মাধ্যমিক সমাপনী মূল্যায়ন;
- ✿ পরীক্ষার চাপ কমানোর জন্য একাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণি শেষে এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি শেষে উচ্চমাধ্যমিক সমাপনী মূল্যায়ন;
- ✿ ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কৃষি, সেবা বা শিল্প খাতের একটি অকুপেশনের ওপর পেশাদারি দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক;

স্মার্ট বাংলাদেশের পথরেখা: জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ বাস্তবায়নের উপায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তা এর রূপরেখায় স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে।

২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে এটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য যা করতে হবে তা হলো-

- ১। সংশ্লিষ্টদের জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর রূপরেখা ভালভাবে পড়ে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করা;
- ২। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর রূপকল্প-‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা’ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা;
- ৩। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর দর্শন ভালোভাবে বুঝতে পারা;
- ৪। পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা অর্জন করা। এ জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকা;
- ৫। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর ১০টি কোর কম্পিটেন্সি বারবার পড়ে নিজে/দলগতভাবে বাস্তবায়নের

সমস্যাচিহ্নিত করে তা ব্যক্তিগত/দলগত/প্রতিষ্ঠানগতভাবে সমাধানের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

৬। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের যুক্ত করে তাদের সহযোগিতা নেওয়া।

৭। সরকার প্রদত্ত সর্বশেষ মূল্যায়ন দলিল সংগ্রহ করে সেটি অনুসরণ করে বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া।

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের নির্দেশনা 'সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য' এ পরিবর্তন অপরিহার্য। তবে পরিবর্তনে শুধু দেশ নয়-বিশ্ব পরিমণ্ডল বিবেচনায় নিতে হবে। যুগোপযোগী ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সহজ কাজ নয়। প্রস্তাবিত কারিকুলাম এবং তার আলোকে লিখিত পাঠ্যপুস্তকে কোন অসঙ্গতি থাকলে তা সংশোধন করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এবং তারও আগে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ হবে আমাদের পথরেখা যার মাধ্যমে আমরা পৌঁছে যাবো কাক্সিক্ষিত লক্ষ্যে।

অভিভাবকদের উৎকর্ষা ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় লেখক ডা. লুৎফর রহমানের কয়েকটি আলোচিত মহৎ জীবন, উন্নত জীবন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'কোনো ছেলে যদি বলে সে বাজারে যায়নি, বা বাজার করেনি কিংবা কোনো মেয়ে যদি বলে সে রান্না ঘরে যায়নি ও রান্না করেনি, তাহলে তারা দুজনই অপদার্থ। কোনো কাজ না পারার ভেতরে কোনো গৌরব নেই, গৌরব পারার ভেতরেই।'

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞান নির্ভর শিক্ষাক্রম অনুশীলন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কাক্সিত জ্ঞান লাভ করলেও দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সবই 'জানে' কিন্তু 'করতে পারে না'।

এখন সময়টা হচ্ছে পারার (doing)- শুধু জানার নয় (not knowing)।

অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিক্ষোভ-প্রতিবাদের আগে তাদের পুরো কারিকুলাম এবং তার আলোকে লিখিত পাঠ্যপুস্তক, অনুসন্ধানী বই, শিক্ষক সহায়িকা ও মূল্যায়ন নির্দেশনা পড়ে দেখতে হবে। কোনো আপত্তি থাকলে তা সরকারকে জানানোর সুযোগ রয়েছে। কারণ, বর্তমান শিক্ষাক্রম সংশ্লিষ্ট সকল প্রকাশনাই 'পরীক্ষণমূলক সংস্করণ' অর্থাৎ একগুলো চূড়ান্ত নয়। এখানে জনগণ বা বিজ্ঞজনের পরামর্শ নিয়ে বইগুলোর সংযোজন-বিয়োজন করে সম্পাদনার কাজটি করে একটি পরিপূর্ণরূপ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

'স্কুলে শুধু আলুভর্তা, ডিম ভাজা আর ভাত রান্না করা শেখানো হয়, এগুলো শিখে কী করবে আমাদের বাচ্চারা?' এমন অভিযোগ অভিভাবকদের। আমার বিনয়ী জিজ্ঞাসা তাদের কাছে, কোনো কিছু

বাস্তবকভাবে শেখা কী অন্যান্য? সিচুয়েশন বলে দিবে সে আলুভর্তা, ডিম ভাজা আর ভাত রান্না করবে কী করবে না।

উচ্চ শিক্ষা বা কর্মোপলক্ষে বর্তমানে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বিদেশে যাচ্ছে, সেখানে যাওয়ার পর তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কে করবে। আমেরিকা বা ইউরোপে কাজের জন্য ঘন্টা হিসেবে মজুরী পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সমান। এখন তাকে যদি কাজের জন্য সাহায্যকারী বা বুয়া রাখতে হয় তাহলে কাজের বুয়ার মজুরী ও নিজ রোজগার সমান হলে জীবন কীভাবে চলবে? অতএব নিজের কাজ নিজেই করতে হবে আর এ শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমে। তাহলে হাতের কাজ শেখাতে সমস্যা কোথায়?

এ প্রসঙ্গে নিজের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই। ২০০৯-২০১০ সময়ে সরকারি একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিলিপাইনের প্রখ্যাত ডি লা সাল্লে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই মাস্টার অব এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করতে। আমাদের একজন শিক্ষক একটি কোর্স পড়াতেন এবং সেখানে ৪ দিন ছিল মুখোমুখি ক্লাস ও ২ দিন অনলাইনে। কোনো পরীক্ষা নেই। মূল্যায়নের নম্বর ছিল এরকম: উপস্থিতি ২৫%, ক্লাস পারফরমেন্স ২৫% এবং এসসাইনমেন্ট ৫০%, মোট ১০০%। এসসাইনমেন্ট লেখার ২টি শর্ত ছিল- ১. ন্যূনতম ১০ টি রেফারেন্স থাকবে, ২. প্রকাশিত রেফারেন্স হবে ২০০০ সালের পর। শর্ত দেখে প্রথমে খুব আনন্দ লাগলেও পরে বুঝেছি এসসাইনমেন্ট লেখার ঠালা। এসসাইনমেন্ট লিখতে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া হারাম, মাথার চুল ছিড়ি সারাক্ষণ। কিন্তু ডিগ্রি অর্জন করে প্রশান্তি লাগে, পরীক্ষা ছাড়াও কীভাবে বিদ্যার্জন করা যায় তা দেখে।

এই কোর্সের অংশ হিসেবে আমরা কিছু স্কুল পরিদর্শন করি সেখানে শ্রেণিভিত্তিক পড়ার চেয়ে কর্মভিত্তিক পড়ার প্রসার দেখেছি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা আমাদের কেক, নুডলস্ বানিয়ে খাইয়েছে, তারা শারীরিক কসরত দেখিয়েছে। ম্যানিলা থেকে জাহাজে সেবু দ্বীপে যাবার পথে শিক্ষার্থীদের দেখেছি কোর্সের অংশ হিসেবে জাহাজ পরিষ্কার করতে। এগুলো তারা আনন্দের সাথে করছে।

সিডা-র সহায়তায় সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘আইসিটি এন্ড পেডাগোজিক্যাল ডেভেলপটমেন্ট’ এর ওপর ডিপ্লোমা কোর্স করতে প্রায় একমাস সুইডেনের স্টকহোম ও কার্লস্টাডে অবস্থান করতে হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্টকহোমের একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনের সুযোগ হয়। আমরা বিদ্যালয়ে পৌঁছলে শিক্ষার্থীরা আমাদের স্বাগত জানায় এবং গাইডের কাজ করে। আমি একটি ক্লাসে ঢুকে দেখি কেউ নেই। পরে শিক্ষকসহ শিক্ষার্থীদের পাওয়া গেল মাঠের পাশে গাছের তলে। বিষয় ও বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে তারা শ্রেণিকক্ষের বাইরে ক্লাস করছে।

প্রাথমিক স্তরের অন্য একটি ক্লাসে গিয়ে দেখা গেল, শিশু শিক্ষার্থীরা ইলেকট্রিক যন্ত্র দিয়ে কাঠের কাজ করছে। প্রথমে দেখে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলেও পরে দেখি প্রত্যেক শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করেছে। একজন শিশু একটি কাঠের টুকরার ওপর যন্ত্র দিয়ে আমার নামটি খোদাই করে লিখে দিয়েছে যা আজো স্মৃতি হিসেবে আমার কাছে রক্ষিত আছে।

সুইডেনে আমার থিসিস সুপারভাইজার ছিলেন ড. হেনরিখ হেনসন। অসম্ভব ভালো মানুষ, দুনিয়াব্যাপি রয়েছে তাঁর পিএইচডি ফেলো। আমার সাথে সম্পর্কের জের ধরে আমি বললাম, ‘ডায়ার হেনরিখ (সুইডেনে সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে, স্যার বলে না), শিক্ষাজীবনে আমার ৮টি সনদ আছে, আমি কী তোমার স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেতে পারি।’

ড. হেনরিখ কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা চুলকিয়ে বলল, ‘ওয়েল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে দেখবে যে কাজের জন্য তোমাকে নিয়োগ করা হবে সে কাজটি তুমি পার কি-না, যদি পারো তাহলে তারা তোমার সনদ খুঁজবে, অন্যথায় নয়।’

বর্তমান বিশ্ব যোগ্য, দক্ষ কর্মী খোঁজে, উত্তম সনদধারীকে নয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী কর্মকুশল জনগোষ্ঠী তৈরিতে বর্তমান কারিকুলাম অত্যন্ত যৌক্তিক। এতে দুর্বলতা থাকতে পারে যা খুঁজে বের করে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। ঢালাও সমালোচনা না করে মাইন্ড সেট পরিবর্তন করে বর্তমান শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সকলের ভূমিকা রাখা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। এই কারিকুলাম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শুরু হবে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথচলা।

: সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা

ইউরিয়া সার কারখানা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় অবদান রাখবে

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ কৃষিজীবী। ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি। এত স্বল্প আয়তনের কোনো ভূখণ্ডে এত বেশি মানুষের বসবাস নেই। তারপরও বাংলাদেশ প্রায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি সম্ভব হয়েছে কৃষকের নিরলস প্রচেষ্টায়। কৃষককে সময়মতো সার, বীজ, সেচের সুবিধা দেওয়ায় বাংলাদেশের কৃষক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। দেশের কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশবাসীর জন্য খাদ্য উৎপাদন করলেও তারা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় কি না তা একটি বড় মাপের প্রশ্ন। এ দেশে অতীতে সারের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে কৃষককে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আশার কথা, সরকার দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। গত রবিবার নরসিংদীর পলাশে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার কারখানা ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কারখানাটি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশে সারের ঘাটতি পূরণসহ আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। ১১০ একর জমির ওপর নির্মিত এ প্রকল্পের ব্যয় ১৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। কারখানাটি চালু হওয়ায় দৈনিক ২ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন ও বছরে গড়ে ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়ার সার উৎপাদন সম্ভব হবে। এ ছাড়া কারখানাটিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হবে কয়েক হাজার মানুষের। খাদ্য ঘাটতি পূরণসহ দেশের কৃষি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে। ২০২২ সালের ২১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকার ৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা আর জাপান ও চীনের ঠিকাদারদের যৌথ কনসোর্টিয়াম ব্যাংক অব টোকিও-মিৎসুবিশি ইউএফজে লিমিটেড ও এইচএসবিসি ব্যাংক ১০ হাজার ৯২০ কোটি টাকার ঋণ দেয়। পলাশের এই ইউরিয়া সার কারখানা দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। শত শত বছর ধরে যে ভূখণ্ড দুর্ভিক্ষ মঙ্গা তথা খাদ্যাভাবের দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে সে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ।

বহুমুখী ঝুঁকিতে আর্থিক খাত: সংকট নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ জরুরি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বহুমুখী ঝুঁকিতে পড়েছে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ব্যাংকগুলোতে সুদের হার বৃদ্ধি, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া, খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়া, এর বিপরীতে মূলধন হ্রাস, আয় কমে যাওয়া, ঋণ আদায় কম হওয়াসহ নানা ঝুঁকির মুখে পড়েছে আর্থিক খাত। বিদ্যমান অর্থনৈতিক মন্দায় ব্যবসা-বাণিজ্য নিম্নমুখী হওয়ায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসার পরিধিও কমে গেছে। বেশি ঝুঁকিতে পড়েছে নন-ব্যাংকিং আর্থিক খাত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ‘আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন : জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩’-এ এসব তথ্য উঠে এলেও পরবর্তী অর্থাৎ জুনে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি, ঋণ থেকে সুদ আয়, এমনকি মূলধন থেকেও আয় কমে যাওয়ায় সার্বিকভাবে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। গুটিকয়েক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভালো থাকলেও বাকিদের মূলধন কমে গেছে।

Advertisement

প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ২০ শতাব্দির বেশি খেলাপি ঋণ রয়েছে আটটি ব্যাংকের। ১৫ শতাব্দির বেশি থেকে ২০ শতাব্দির কম খেলাপি ঋণ রয়েছে তিনটি ব্যাংকের। ১০ শতাব্দির বেশি থেকে ১৫ শতাব্দির কম খেলাপি ঋণ আছে পাঁচটি ব্যাংকের। ৫ শতাব্দির বেশি থেকে ১০ শতাব্দির কম খেলাপি ঋণ রয়েছে ১৪টি ব্যাংকের। ৩ শতাব্দির বেশি থেকে ৫ শতাব্দির কম ১৮টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ। আর ২ শতাব্দির বেশি থেকে ৩ শতাব্দির কম খেলাপি ঋণ রয়েছে সাতটি ব্যাংকের। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কোনো ব্যাংকে খেলাপি ঋণ ৩ শতাব্দির বেশি থাকলেই ওই ব্যাংককে ঝুঁকিপূর্ণ ধরা হয়। বর্তমানে দেশে ৪৮টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৩ শতাব্দির উপরে। সেক্ষেত্রে ৪৮টি ব্যাংকই এখন খেলাপি ঋণের ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আবার ৫ শতাব্দির বেশি খেলাপি থাকলে ওই ব্যাংককে ঝুঁকি হিসাবে বিবেচনা করে। সে হিসাবে ৫ শতাব্দির বেশি খেলাপি ঋণ থাকা ৩০টি ব্যাংকই রয়েছে ঝুঁকিতে।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আইনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংক ও নন-ব্যাংক খাতের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে বিশ্বব্যাংক আগেই এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল। ব্যাংক পরিচালকদের দুর্নীতি, স্বচ্ছতা ও পর্যবেক্ষণের অভাব এবং নজিরবিহীন লুটপাটের প্রভাবে এ খাতের পরিণতি যে ভালো হবে না, তা জানা সত্ত্বেও সরকারের তরফ থেকে কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। কোথা থেকে কীভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তহবিল সংগ্রহ করছে, কার স্বার্থে ব্যবহার করছে-এসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। বড় অঙ্কের

ঋণের ব্যবহারের প্রকৃত অবস্থা এবং সুবিধাভোগী শনাক্তকরণ ও বাস্তব অস্তিত্ব যাচাইয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন হলেও পরিস্থিতি হয়তো এতটা খারাপ হতো না। আমরা বরাবরই বলে আসছি, আর্থিক খাতে খেলাপি ঋণ আদায়ে শিথিলতার সুযোগ নেই। এমনিতেই বৈশ্বিক কারণে ডলারের দাম বেড়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে রিজার্ভের পরিমাণ ক্রমেই কমছে। এ অবস্থায় ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হওয়ার জন্য যারা দায়ী, তাদের চিহ্নিত করাসহ খেলাপি ঋণ আদায়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কঠোর হবে, এটাই প্রত্যাশা।

দ্রব্যমূল্যের সিঙ্কিকেট কেন ভাঙা যাচ্ছে না

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সাধারণ ও স্বল্প আয়ের মানুষকে যে কতটা বিপর্যস্ত করেছে, তা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) গাড়ির সামনে দীর্ঘ লাইন দেখেই ধারণা করা যায়। মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দেওয়া হলেও জনসাধারণ কিন্তু ব্যবস্থাপনাগত ব্যর্থতাকেই দুশ্ছে। গত ৩১ অক্টোবর বেলজিয়াম সফর-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কিছুটা কৃত্রিমভাবে করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, তাহলে এই কৃত্রিম সংকটের সিঙ্কিকেট কেন ভাঙা যাচ্ছে না?

এদিকে প্রতিদিনই লাফ দিয়ে বাড়ছে নিত্যপণ্যের দাম। বিশেষ করে সম্প্রতি যেভাবে সবজির দাম বেড়েছে, তাতে কোনো কিছুই এখন সাধারণ মানুষের নাগালের ভেতর নেই। আজ এক দাম, তো কাল আরেক দাম। মানুষের আয় বাড়েনি, অথচ ব্যয় বেড়েছে দ্বিগুণ। আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক রেখে সংসার চালানোই দায় হয়ে যাচ্ছে।

করোনাকালে মানুষের চাকরি চলে গেছে; কারও বেতন কমেছে, কেউ আবার নতুন করে শুরু করার সংগ্রাম করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে, তখনই হিসাব পাণ্টে দিচ্ছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। অনেকে আছেন যারা মাছ-মাংস তেমন কিনতে পারেন না, ডিম দিয়ে তরকারি রান্না করে খান। সেই ডিমও আজ সিঙ্কিকেটের কবলে। ছোট বাচ্চাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণেও আজ বড় বাধা এ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি।

দ্রব্যমূল্য নিয়ে এ ধরনের নানা সিঙ্কিকেট বুঝতে অর্থনীতি পড়ার দরকার নেই। একসময় সরকারি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রে নিম্ন আয়ের মানুষের লাইন দেখা যেত। এখন মধ্যবিত্তদেরও লাইনে দেখা যাচ্ছে। আমার পরিচিত উচ্চশিক্ষিত বন্ধু-বান্ধব অনেকেই অপেক্ষাকৃত কম বেতনের চাকরি করেন। তারা এখন সরকারি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রে লাইন দিয়ে পণ্য কেনেন। মধ্যম আয়ের বাংলাদেশে যখন ভালো কাপড় পরা মানুষও টিসিবির পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়ায়, তখন বোঝা যায় পরিস্থিতি কী? অর্থনীতির নানা পরিসংখ্যান দেখিয়ে বলা হচ্ছে, আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। তাহলে বাজারে গিয়ে সেই আয় বাড়ার আনন্দময় অনুভূতি আমার মতো অনেকেরই হয় না কেন? কিছুদিন আগে একটি প্রতিবেদনে পড়েছিলাম, বাংলাদেশে ২০২০ সালে এত বেশি অতি বিত্তবানের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছে যে, এর হার বিশ্বের সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। অথচ আমরা মধ্যবিত্তরাও দ্রব্যমূল্য নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে

মনে এই প্রশ্নও জাগে, দেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা **দরিদ্র পরিবার**গুলো নিয়ে কি সরকারের আদৌ মাথাব্যথা আছে? যদি থাকে তাহলে পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হবে কেন? এ কথা কাণ্ডজ্ঞান থেকেই বলে দেওয়া যায়, নিজেদের সচ্ছল মনে করা **পরিবার**গুলোকেও এখন **সংসারের** আয়-ব্যয়ের **হিসাব** নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

এটা ঠিক, টিসিবির পণ্য বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত এসেছিল মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের জন্য উপশম হিসেবে। কিন্তু সেখানও যখন সিডিকেটের কালো থাবা; মানুষ যাবে কোথায়?

বাজার নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে নানা কথা শুনি, কিছু পদক্ষেপও দেখি। কিন্তু সেসব প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতির এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিস্তারের তুলনায় অপ্রতুল। কাজেই সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাব, ক্রমাগত **দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি** প্রতিরোধ করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় কীভাবে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা যায়, সেদিকে নজর রাখুন। পাশাপাশি টিসিবির পণ্য সরবরাহে তদারকি বৃদ্ধি সাপেক্ষে তা যথাযথ বন্টনে মনোযোগ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। সার্বিক বিশ্লেষণে এক কথায় বলা যায়, বর্তমান ত্রাহি পরিস্থিতি অনুকূলে না এলে এর প্রভাব অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই সমানভাবে সামনে আসার শঙ্কা রয়েছে।

দেশে এখন এক ধরনের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। এই রাজনৈতিক নাজুক অবস্থায় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ক্রমেই বিপাকে পড়ছে। এই মুহূর্তে সরকারের উচিত হবে দেশের কথা, জনগণের কথা ভেবে **বাজার** নিয়ন্ত্রণ করা। যদিও তেমন কোনো কার্যক্রম চোখে পড়ে না। বরং বাণিজ্যমন্ত্রী স্বয়ং অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তাহলে সাধারণ মানুষের ভরসা কোথায়? সব মিলিয়ে প্রতিকার-প্রতিবাদ না করতে পারলেও সাধারণ মানুষের ধারণা সরিষার মধ্যেই রয়েছে ভূত। **বাজার** নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব যাদের হাতে, সিডিকেটে তারাই জড়িত।

পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র ব্যবসা

বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে প্রায় ৯০ লাখ ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের উপায় হিসেবে কাজ করছে। তা ছাড়া দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৫ শতাংশই এই খাত থেকে অর্জিত হয়। তবে ২০১৪ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, শুধু ৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম।

তাই দূষণ হ্রাস ও পরিবেশবান্ধব ব্যবসা সম্প্রসারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পরিবেশবান্ধব টেকসই চর্চা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পিকেএসএফের সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্প সম্পর্কে ঠাকুরগাঁওয়ে একজন চাতাল মালিক বলছিলেন, এসইপির সহায়তায় তারা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিবেশ বিষয়ে সচেতন এবং কারখানাতে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহারসহ রপ্ত করেছেন পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা। তিনি জানালেন, চাতালে ধান সেদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ছাই একসময় ফেলে দেওয়া হতো। দূষিত হতো পরিবেশ। এখন সে ছাই জমিতে সার হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিক্রি হয়। পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন এলাকায় ইটের পরিবর্তে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে কংক্রিটের তৈরি ইকো ব্লক। এই ব্লক তৈরি হচ্ছে জমির ওপরের মাটি ব্যবহার না করে, পরিবেশসম্মত উপায়ে। প্রশাসনিকভাবে সেখানে নির্মাণকাজে ইটের পরিবর্তে ইকো ব্লক ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা দেওয়ায় তাদের তৈরি ইকো ব্লক বিক্রি হচ্ছে।

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কুমার সম্প্রদায় বাজারে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় পেরে উঠছিলেন না। এসইপির সহযোগিতায় তাদের কেউ কেউ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নদী থেকে সংগ্রহ করা পলিমাটি বিশেষ ব্যবস্থায় মাটি প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র ব্যবহার করে খালা-বাসন তৈরির উপযোগী করছেন এবং এ মাটি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার তৈজসপত্র ও গৃহসজ্জার সরঞ্জাম তৈরি করছেন। এতে মাটি সংগ্রহের খরচ কমে গেছে এবং কুমাররা এখন অনেক বেশিসংখ্যক তৈজসপত্র

বানাতে পারছেন আগের চেয়ে অনেক কম সময়ে। নতুন যন্ত্রপাতি পাওয়ার আগে তাদের কাঠ পুড়িয়েই বানাতে হতো তৈজসপত্র, যা দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থি।

কেরানীগঞ্জের একজন উদ্যোক্তা প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল করে তৈরি করছেন টাইলস। তাঁর তৈরি প্লাস্টিকের টাইলস দেখিয়ে বলছিলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে যেমন সুইমিং পুল, হাঁটার রাস্তা থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের মেঝেতেও সুলভে সেগুলো ব্যবহার করা সম্ভব। যদিও টাইলস বিক্রি করা নিয়ে তিনি চিন্তিত।

তবে বিক্রিবাটার সমাধান বিষয়ে আশার কথা শোনালেন কক্সবাজারের একজন গুঁটিকি ব্যবসায়ী। তিনি নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে উৎপাদিত গুঁটিকি মাছ অনলাইন সুবিধা ব্যবহার করে বিক্রি করছেন। সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করায় তিনি ভালো মুনাফাও পাচ্ছেন। অনলাইন ব্যবসায় সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ আরও সম্প্রসারণ করতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই অবস্থা অর্জনে বন্ধপরিষ্কার, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং প্রাজ্ঞ আমলাদের এ ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রয়েছে। তারা চাইলে বর্তমান কাঠামোতেই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

প্রতিকূল পরিবেশে যুদ্ধ করেই আজকের অবস্থানে বঙ্গবন্ধুর মানসকন্যা

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মানসকন্যা, ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন ২৮ সেপ্টেম্বর। বঙ্গবন্ধু যে আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন আজ তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ, ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন, তার কন্যা শেখ হাসিনার হাতে তা বিকশিত হয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছিলেন, আর তারই কন্যা একই ধারাবাহিকতায় শেষ করেছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা একজন আজন্ম লড়াই যোদ্ধা। তিনি অবিরাম জেগে আছেন বলেই বাংলাদেশ নিশ্চিত্তে ঘুমোতে পারছে। প্রতিকূল পরিবেশে শেখ হাসিনা যুদ্ধ করেই আজকের অবস্থানে এসেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে এসেছিলেন বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়েছে। শৈশব থেকে সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত শেখ হাসিনা মেধা ও মননশীলতায় ছিলেন অন্যদের চেয়ে উর্ধ্ব। বাবার আদর্শকে ধারণ করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাকে। কখনো অন্যায়-অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেননি তিনি। বাবার মতো বুকভরা সাহস নিয়ে বাংলাদেশকে একটি রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেছার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। পিতাকে খুব একটা কাছে না পেলেও শৈশব-কৈশোর আনন্দেই কেটেছে তার। গ্রামবাংলার ধুলোমাটি আর সাধারণ মানুষের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। গ্রামের সঙ্গে তাই তার নাড়ির টান। গোপালগঞ্জের মধুমতি নদীতীরবর্তী প্রত্যক্ষ পাড়াগাঁ টুঙ্গিপাড়ায় বেড়ে ওঠা অবুঝ মেয়েটির ডাক নাম হাসু। দাদা শেখ লুৎফর রহমান ও দাদি সাহেরা খাতুনের অতি আদরের নাতনি শেখ হাসিনার শৈশব-কৈশোর কেটেছে দাদা-দাদির কোলে-পিঠে ওই গ্রামটিতে। তারা পাঁচ ভাইবোন। অপর চারজন হচ্ছেন শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা এবং শেখ রাসেল। ভাইবোনদের মধ্যে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছাড়া কেউই জীবিত নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালোরাতে পিতা বঙ্গবন্ধু এবং মাতা ফজিলাতুন্নেছাসহ সবাই ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

শেখ হাসিনার শিক্ষাজীবন শুরু হয় টুঙ্গিপাড়ার এক পাঠশালায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে পরিবারকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তখন পুরনো ঢাকার রজনী বোস লেনে ভাড়া বাসায় তারা ওঠেন। বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হলে সপরিবারে ৩ নম্বর মিন্টো রোডের বাসায় তারা বসবাস শুরু করেন। শেখ হাসিনাকে ঢাকা শহরে টিকাটুলির নারী শিক্ষা মন্দিরে ভর্তি করা হয়। এখন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শেরেবাংলা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামে খ্যাত। শুরু হয় তার শহুরে জীবন। শেখ হাসিনা ১৯৬৫ সালে আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ১৯৬৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ (বর্তমান বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়) থেকে উচ্চ

মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। ওই বছরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সে ভর্তি হন এবং ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সদস্য এবং রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রলীগের নেত্রী হিসেবে তিনি আইয়ুববিরোধী আন্দোলন এবং ৬ দফা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

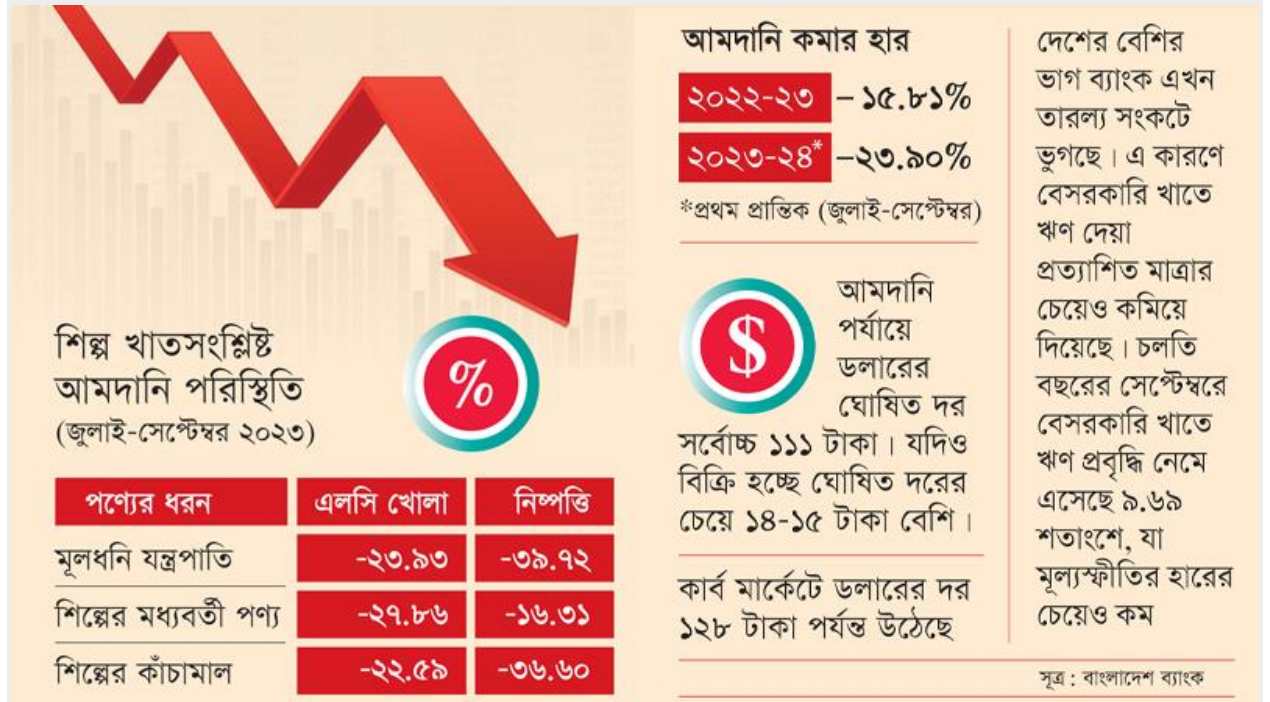
একবিংশ শতাব্দীর অভিযাত্রায় তিনি দিন বদল ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাণ্ডারি। এই অভিযাত্রায় তিনি বাঙালির জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। শত ব্যস্ততার মাঝেও শেখ হাসিনা সাহিত্যচর্চা ও সৃজনশীল লেখায় নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে- ওরা টোকাই কেন, বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম, আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম। শেখ হাসিনা বর্তমানে ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন। বরাবরের ন্যায় নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনেও যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের এক আলোচনায় এ বছরের সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য : ‘একটি সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণ : আন্তঃসংযুক্ত প্রতিকূলতাসমূহের রূপান্তরমূলক সমাধান।’

গত ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের জেনারেল অ্যাসেম্বলি হলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৮তম অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আমরা অস্থায়ীভাবে তাদের আশ্রয় দিয়েছি। গত মাসে রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এখন আমাদের জন্য সত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত মাসে রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আমরা অস্থায়ীভাবে তাদের আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু পরিস্থিতি এখন আমাদের জন্য সত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘প্রত্যাশন নিয়ে অনিশ্চয়তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক হতাশার জন্ম দিয়েছে। এই পরিস্থিতি সম্ভাব্য মৌলবাদকে ইন্ধন দিতে পারে। এই অবস্থা চলমান থাকলে এটি আমাদের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় এবং সেখানে তারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী। আসুন আমরা এই নিঃস্ব মানুষের জন্য তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও বৈধতা নিয়ে মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। এর ফলে একটা শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অর্জিত সাফল্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।’

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা যেভাবে জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনি তার সুযোগ্য সন্তান একইভাবে আমাদের এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বের দরবারে। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের সোচ্চার কণ্ঠস্বর ছিলেন, যিনি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অনবদ্য প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ জুলিও কুরি পদকে ভূষিত হয়েছেন, তার উত্তরসূরি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রদূত হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় এ কথা আজ অবধারিতভাবেই বলা যায় একজন মানবিক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও তিনি পরীক্ষিত একজন বিশ্ব নেতা। সব বাধা পেরিয়ে সত্যিকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ়প্রত্যয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। ইতোমধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তার হারানোর কিছু নেই; কিন্তু দেশবাসীকে দেওয়ার আছে অনেক কিছু।

ডলার নেই, তারল্যও সংকটে, সংকোচনের মুখে বেসরকারি খাত



ডলার সংকটে দেশের আমদানি সংকুচিত হচ্ছে দুই বছর ধরে। চাহিদা অনুযায়ী পণ্য আমদানি করতে না পারায় স্থবির হতে বসেছে অনেক শিল্প। টাকার রেকর্ড অবমূল্যায়নের প্রভাবেও ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এবার ডলার সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাংকের তারল্য সংকট। ঋণ না পাওয়ায় দেশের

অনেক উদ্যোক্তাই এখন কার্যক্রম পরিচালনায় হিমশিম খাচ্ছেন। এ অবস্থায় সমৃদ্ধি নয়, বরং সংকোচনের মুখে পড়েছে দেশের বেসরকারি খাত। যদিও দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও কর্মসংস্থানের বড় অংশই বেসরকারি খাতনির্ভর। এ খাত প্রাণবন্ত থাকলে দেশের অর্থনীতিও সমৃদ্ধির পথে চলে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি জিডিপি প্রবৃদ্ধিও হয় কাজিফত মাত্রায়।

উদ্যোক্তারা বলছেন, ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হওয়া, সুদহার বৃদ্ধি, ডলার সংকট ও ডলারের বিনিময় হার নিয়ে নৈরাজ্য, প্রত্যাশিত মাত্রায় ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পারা, গ্যাস সংকট, উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবে বিক্রি কমে যাওয়াসহ বহুমুখী সংকটে বেসরকারি খাত এখন বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ব্যবসায়ীরা গণহারে ঋণখেলাপি হবেন। তাতে দেশের ব্যাংক খাতের আর্থিক ভিত আরো বেশি নড়বড়ে হয়ে উঠবে।

দেশের ব্যাংক ঋণের সুদহার এখন প্রায় ১১ শতাংশ। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি সুদহারের চেয়েও অনেক নিচে নেমে এসেছে। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বরে দেশের বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ, যা গত ২৩ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, চলতি বছরের শুরু থেকেই বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমছে। সর্বশেষ অক্টোবর ও চলতি নভেম্বরে ঋণ প্রবাহের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে।

ব্যাংক নির্বাহীরা জানান, অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলে ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করছেন না। এ কারণে ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। খেলাপি হওয়ার পথে থাকা ঋণের সঙ্গে নতুন সুদ যুক্ত হচ্ছে। বেসরকারি খাতে যে ঋণ প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, তার বড় অংশই অনাদায়ী সুদের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে বেসরকারি খাতে নতুন ঋণের প্রবৃদ্ধি ২-৩ শতাংশের বেশি নয়।

সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় ডলারের বিনিময় হার বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। গত বছরের জানুয়ারিতেও দেশের ব্যাংক খাতে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল সর্বোচ্চ ৮৫ টাকা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত দর হিসাবে দিলেও প্রতি ডলার ১১১ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। যদিও ঘোষিত দরে দেশের কোনো ব্যাংকেই ডলার মিলছে না। আমদানিকারকদের কাছ থেকে ব্যাংকগুলো ডলারপ্রতি ১২৪-১২৫ টাকাও আদায় করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সে হিসাবে এ সময়ে ডলারের বিনিময় হার বেড়েছে প্রায় ৪৭ শতাংশ। আর কার্ব মার্কেটে (খুচরা বাজার) প্রতি ডলারের মূল্য ১২৮ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। বিনিময় হার নিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে দেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

ডলার সংকটের কারণে ব্যবসায়ীরা চাহিদা অনুযায়ী আমদানির এলসিও খুলতে পারছেন না। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের আমদানি কমার হার ছিল ১৫ দশমিক ৮১ শতাংশ। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আমদানি কমার হার প্রায় ২৪ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতি মাসে যে পরিমাণ পণ্য আমদানি হতো, বর্তমানে আমদানি হচ্ছে তার অর্ধেক। চাহিদা অনুযায়ী মূলধনি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে না পারায় দেশের অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সক্ষমতার বড় অংশ বসে থাকছে।

শিল্প খাতসংশ্লিষ্ট সব পণ্যের আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মূলধনি যন্ত্রপাতির এলসি খোলা কমেছে ২৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। একই সময়ে মূলধনি যন্ত্রপাতির এলসি নিষ্পত্তির হার ৩৯ দশমিক ৭২ শতাংশ কমে গেছে। শিল্পের মধ্যবর্তী পণ্য (ইন্টারমিডিয়েট গুডস) আমদানির এলসি খোলা কমেছে প্রায় ২৮ শতাংশ। একই সময়ে এসব পণ্যের এলসি নিষ্পত্তির হারও ১৬ শতাংশের বেশি কমেছে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানির এলসি খোলা কমেছে ২২ দশমিক ৬০ শতাংশ। আর কাঁচামাল আমদানির এলসি নিষ্পত্তির হার প্রায় ৩৭ শতাংশ কমেছে।

দেশের একাধিক শিল্প উদ্যোক্তা বণিক বার্তাকে বলেছেন, কভিড-পরবর্তী সময়ে দেশের অনেক শিল্প গ্রুপই চাহিদার অতিরিক্ত কাঁচামাল দেশে এনেছিলেন। ডলার সংকটের কারণে আমদানি কমিয়ে দেয়ার পরও স্টককৃত কাঁচামাল দিয়ে শিল্পের উৎপাদন চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখন বেশির ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরই কাঁচামাল শেষ হয়ে এসেছে। এ কারণে উৎপাদন সক্ষমতার বড় অংশ বসিয়ে রাখতে হচ্ছে। এতে পণ্য উৎপাদন খরচও বেড়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মাহবুবুল আলমও মনে করেন, নানামুখী সংকটের কারণে দেশের বেসরকারি খাতের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আসছে। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘সংকটের প্রভাবে সবকিছুর ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এটি ভোক্তাদের জন্য নতুন ক্ষতি ডেকে আনবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ভালো নেই। এ কারণে সংকট থেকে বের হয়ে আসা কঠিন হবে।’

মাহবুবুল আলম বলেন, ‘দেশের ব্যবসায়ীদের টিকে থাকার পথ সংকুচিত হয়ে আসছে। বর্তমান বাস্তবতায় প্রত্যেকটা পণ্যের দাম বাড়ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তো থাকতে হবে। ডলারের প্রবাহ বাড়লে পরিস্থিতি ঠিক থাকবে, না বাড়লে সমস্যা আরো জটিল হবে।’

চলতি বছরের শুরু থেকেই দেশের মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। গত মাসে খাদ্য

মূল্যস্ফীতির হার ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশে গিয়ে ঠেকে। দেশের বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। এ কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে সব ধরনের পণ্য বিক্রি কমে গেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

অর্থনৈতিক নানা সংকটের মধ্যে যুক্ত হয়েছে দেশের বিরাজমান গ্যাস সংকট। বর্তমানে দেশে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা ৪১০ কোটি ঘনফুট। যদিও মাত্র ২৫৮ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। সরবরাহ সংকটের কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো চাইলেও পুরোদমে সচল রাখা যাচ্ছে না। গ্যাস সংকটের কারণে দেশের বেসরকারি খাতের ক্ষতি বেড়ে চলছে।

ডলার সংকট ও মূল্যস্ফীতির প্রভাবে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার প্রভাব তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর ব্যবসা ও মুনাফার ওপরও পড়েছে। গত বছরের জুলাই থেকে এ বছরের জুন পর্যন্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডলারের অবমূল্যায়নের কারণে কোনো কোনো কোম্পানিকে লোকসান গুনতে হয়েছে। অনেক কোম্পানি ডলার সংকটের কারণে চাহিদা অনুসারে কাঁচামাল আমদানি করতে পারেনি। অন্যদিকে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে ব্যয় বাড়ায় পণ্যের দাম বাড়তে বাধ্য হয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু মূল্যস্ফীতির প্রভাবে ক্রয়ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ায় ভোক্তাদের ভোগ কমে গেছে, এর প্রভাব পড়েছে কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়।

গত দুই বছর বিনিময় হার ওঠানামা বা ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে বড় অংকের লোকসান দিচ্ছে সিমেন্ট খাতের তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস পিএলসি। এর মধ্যে ২০২২-২৩ হিসাব বছরে ১০৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা ও এর আগের ২০২১-২২ হিসাব বছরে ১০৮ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে কোম্পানিটির।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রিমিয়ার সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমিরুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, ‘আমদানিকারকরা প্রতি ডলার ১১১ টাকায় কিনতে পারবেন বলে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা ঘোষিত দরে কোথাও ডলার পাচ্ছি না। যে ডলার ৮৪-৮৫ টাকা দর ধরে পণ্য আমদানির এলসি খোলা হয়েছিল, সেটি এখন ১২৪-১২৫ টাকায় পরিশোধ করতে হচ্ছে। বিনিময় হারের এ বিপুল ক্ষতি আমরা কোথা থেকে পূরণ করব।’

স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারে চাহিদা কমার পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় বাড়ার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি (বেক্সিমকো) লিমিটেডের ব্যবসায়। সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২২-২৩ হিসাব বছরে কোম্পানিটির কর-পরবর্তী ৭০৯ কোটি ৮১ লাখ টাকা নিট মুনাফা হয়েছে। যেখানে এর আগের হিসাব বছরে নিট মুনাফা ছিল ১ হাজার ২৫৪ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। এক বছরে কোম্পানিটির কর-পরবর্তী নিট

মুনাফা কমেছে ৪৩ শতাংশ। মুনাফা কমানোর কারণ হিসেবে কোম্পানিটি জানিয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনীতির শ্লথগতির কারণে রফতানি কমানোর পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে চাহিদা কমেছে। এর সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ডলার সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় বেড়েছে। তাছাড়া গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ার প্রভাবও কোম্পানিটির উৎপাদন ব্যয় বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে।

ডলার সংকটের প্রভাব পড়েছে রানার অটোমোবাইলস পিএলসির ব্যবসার ওপরও। ২০২২-২৩ হিসাব বছরে কোম্পানিটির ব্যবসা থেকে আয় এর আগের হিসাব বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ কমে ৬৬২ কোটি ৯৬ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। গত হিসাব বছরে কোম্পানিটির নিট লোকসান হয়েছে ৯৬ কোটি টাকা।

দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদক ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ব্যবসার ক্ষেত্রেও ডলার সংকট ও মূল্যস্ফীতির প্রভাব দেখা গেছে। ২০২২-২৩ হিসাব বছরে কোম্পানিটির আয় হয়েছে ৬ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকা। যেখানে এর আগের হিসাব বছরে ৮ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা আয় ছিল কোম্পানিটির। সে হিসেবে গত অর্থবছরে কোম্পানিটির আয় কমেছে দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি। এ সময়ে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের কর-পরবর্তী নিট মুনাফা এর আগের হিসাব বছরের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ কমে ৭৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সর্বত্রই সংকট দেখছেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক এ চেয়ারম্যান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘আমরা সব সময় দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বুনয়াদ নিয়ে গর্ব করতাম। কিন্তু সংকট এতটাই বেড়েছে যে পুরো সামষ্টিক অর্থনীতিই বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে। আমরা দেখছি, সংকটের প্রভাবে ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। এ কারণে খেলাপি ঋণ লাগামহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। কোনো গ্রাহক খেলাপি হয়ে গেলে তাকে নতুন ঋণ দেয়াও সম্ভব হবে না। ডলার সংকটের পাশাপাশি ব্যাংক খাত এখন তারল্য সংকটে ভুগছে। আগামীতে এ সংকট আরো বাড়বে। জাতীয় নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হলে অর্থনীতি আরো বড় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে পারে।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন শেষে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৯ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপির খাতায় আরো অন্তত ২৫ হাজার কোটি টাকা যুক্ত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। তবে একাধিক ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী জানান, খেলাপি ঋণ কম দেখাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে চাপ রয়েছে। এ কারণে পুনঃতফসিল করে

খেলাপি ঋণ কমানো হচ্ছে। কিছু ব্যাংক খেলাপি হওয়ার যোগ্য এমন ঋণের সীমা বাড়িয়ে নিয়মিত দেখাচ্ছে।

দেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের একটি বেসরকারি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘দেশের ব্যাংক খাতের মোট ঋণের ৭০ শতাংশই চলতি মূলধন কিংবা চলমান ঋণ। এ ধরনের ঋণ নিয়মিত রাখতে হলে আদায়ের পাশাপাশি নতুন ঋণ দিতে হয়। গ্রাহকরা চাহিদা অনুযায়ী আমদানি করতে না পারলে এ ধরনের ঋণ নিয়মিত রাখা সম্ভব হয় না। সংকটের কারণে ব্যবসায়ীদের বড় অংশ এখনই ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। এ কারণে দেশের ব্যাংকগুলোয় খেলাপি ঋণ গণহারে বাড়তে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।’

ডলারের মতোই দেশের ব্যাংক খাতে এখন তীব্র তারল্য সংকট চলছে। ব্যাংকগুলো দৈনন্দিন লেনদেন মেটানোর পাশাপাশি সিআরআর-এসএলআর সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে রেকর্ড পরিমাণ টাকা ধার করছে। গত মাসে প্রতিদিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নেয়া ধারের পরিমাণ ছিল ১০-১৫ হাজার কোটি টাকা। কোনো কোনো দিন এ ধারের পরিমাণ রেকর্ড ২৬ হাজার কোটি টাকায়ও উন্নীত হয়েছিল। চলতি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধারের চাহিদা আরো তীব্র হয়েছে।

মূল্যস্ফীতি কমানোর লক্ষ্য নিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবৃদ্ধির লক্ষ্য কমিয়ে আনা হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয় ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। যদিও সেপ্টেম্বরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি মাত্র ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ। এরপর থেকে এ খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার কমেছে। বিশেষ করে কভিড-সৃষ্ট দুর্য়োগের সময় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের ঘরে নেমে আসে। যদিও ওই দুই অর্থবছরে সরকার ঘোষিত প্রায় লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন হয়েছিল। এরপর ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি ঋণ প্রবৃদ্ধি ১৬ দশমিক ৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল।

দেশের প্রথম প্রজন্মের একটি বেসরকারি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী বলেন, ‘গত তিন-চার বছর দেশের বেসরকারি খাতে নতুন বিনিয়োগ ছিল খুবই কম। এ সময়ে বড় কোম্পানিগুলো ব্যবসা সম্প্রসারণের চেয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখায় বেশি জোর দিয়েছে। এ কারণে দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি একেবারেই থমকে

গেছে। তবে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ বের করে নিয়েছেন। অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে নেয়া ঋণের বড় অংশ দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে।’

২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে দেশের ব্যাংক খাতের ঋণের সুদহার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তবে চলতি বছরের জুনে এসে সর্বোচ্চ সুদহার নির্ধারণের কাঠামো পরিবর্তন করা হয়। এ পরিবর্তনের ফলে চলতি নভেম্বরে ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদহার ১০ দশমিক ৯৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

সুদহার বাড়ানোর মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে কঠিন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে জানান এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘সুদের হার বাড়লে ব্যবসার খরচ বাড়ে। জিনিসপত্রের দামও বাড়ে। মুনাফা করা কঠিন হয়ে যায়। এ কারণে ব্যাংকের ঋণ খেলাপি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের এ চরিত্র বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদ হতে হয় না। দেশে ডলারের বিনিময় হার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এতে আমদানি খরচও বেড়ে যাচ্ছে।’

জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণ-২০২২ ও কিছু কথা

শিক্ষাক্রম শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Curriculum। কারও মতে Curriculum শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে এসেছে। যার অর্থ Course of study অর্থাৎ পাঠ্যবিষয়। অন্যদের মতে এটি ল্যাটিন শব্দ Curre থেকে এসেছে। যার অর্থ ঘোড়দৌড়ের মাঠ। একটি নির্দিষ্ট স্তর বা শ্রেণির শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিকল্পনাই হল শিক্ষাক্রম।

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ হুইলার (1967) এর মতে, “শিক্ষাক্রম বলতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদির একটি বৃত্তাকার গতিশীল কার্যক্রমকে বুঝায়।”

শিক্ষাক্রম বা কারিকুলামের মূল উপাদান চারটি। যথা- ১। উদ্দেশ্য ২। বিষয়বস্তু ৩। শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কয়েকবার জাতীয় শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা হলেও তা নিয়ে এত আলোচনা সমালোচনা হয়নি “জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণ-2022” নিয়ে যত আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে।

এই শিক্ষাক্রমে বড় ধরনের পরিবর্তনগুলো হলো:-

১. ৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ধর্মশিক্ষা, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি, জীবন ও জীবিকা, শিল্প ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়গুলো পড়ানো হবে। ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে কোনো বিভাগ থাকবে না এবং সকল শিক্ষার্থীকে কেবল ১টি কোর্স বিজ্ঞান বিষয় পড়তে হবে। এর ফলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে মাত্র ২ বছর জীববিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত পড়েই চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় পড়তে যেতে হবে। যেখানে আগে চার বছর এই বিষয়গুলো পড়ে উচ্চ শিক্ষায় যেতে হত।

২. বাংলাদেশে বেঞ্জামিন ব্লুম এর শিক্ষার ক্ষেত্র অনুসরণ করা হয়। তার মতে শিক্ষার ক্ষেত্র তিনটি। যথা- জ্ঞান, (Cognitive Domain), আবেগ (Effective Domain) মনোপেশিজ (Psychomotor)। নম্বর ভিত্তিক পরীক্ষাগুলো দ্বারা শিক্ষার্থীর আবেগিক দিক ও মনোপেশিজ দিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না বিধায় নম্বর ভিত্তিক পরীক্ষার পরিবর্তে প্রতীক দিয়ে PI (কর্মদক্ষতা ইনডিকেটর) BI (আচরণগত ইনডিকেটর) ক্ষেত্র মূল্যায়ন করা হবে। এ মূল্যায়ন কার্যক্রম সারা বছর জুড়ে চলবে। এ ধরনের মূল্যায়নের ফলে

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কোনো মেধা তালিকা করার প্রয়োজন থাকবে না। কোনো শিক্ষার্থীকে আর অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে না।

৩. শিখন পদ্ধতিতে নবতর সংযোজন হলো- এ্যাসাইনমেন্ট। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য দিবেন। শিক্ষার্থী তা তার বাস্তব অভিজ্ঞতা, চারপাশ ও ইন্টারনেট হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলো লিপিবদ্ধ করে শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করবে।

৪. পাঠ্যবইগুলোকে শিক্ষার্থীদের নিকট আনন্দময় করে তোলার জন্য অন্যান্য বইয়ের সাথে গণিত, বিজ্ঞান বইতেও বিভিন্ন গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। আবার প্রত্যেক অধ্যায়ে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও ব্যাপক অনুশীলনী বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫. নতুন দুইটি বিষয়ের মধ্যে জীবন ও জীবিকা বিষয়টি পড়বেন ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় ও কৃষি শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকগণ এবং শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয় পড়বেন অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকগণ। নির্বাচিত শিক্ষকগণ স্নাতক পর্যায়ে এ বিষয় না পড়লেও উনাদেরকে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের মতে একটি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়:

১) রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবন দর্শন বা আদর্শ ২) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত ব্যবস্থা ৩) আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ৪) জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ৫) জনগণের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস ৬) বস্তুগত সম্পদের প্রাপ্যতা ৭) শিক্ষার্থীর সমকালীন ও ভবিষ্যৎ চাহিদা ৮) শিক্ষার্থীর অভিযোজন ক্ষমতা ৯) অভিভাবক ও স্টেক হোল্ডারগণের মানসিকতা ১০) শিক্ষকবৃন্দের দক্ষতা ১১) ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের রূপরেখা ১২) শাখায় শিক্ষার্থীর পরিমাণ ১৩) শ্রেণিকক্ষের অবকাঠামোগত অবস্থা।

বাংলাদেশে বিদ্যমান অবস্থার সাথে জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তারন-2022 এর সামাজ্য বিধান এর উপর এর সফলতা নির্ভর করছে।

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরও সংবেদনশীল হতে হবে

মূলত উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং অস্থির বিনিময় হারের কারণেই বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে ঘিরে বিশেষজ্ঞ ও প্রধান প্রধান অংশীজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলছে। এসবের প্রভাব জনগণের মনেও পড়ছে। তাদের প্রতিদিনের জীবনচলায় চাপ ও তাপ দুই-ই বাড়ছে। তাই নীতিনির্ধারকদের দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে আরও সংবেদনশীল হতে হবে সে কথা তো সত্যি। তবে এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না। প্রবৃদ্ধির দৌড়ে এখনো বাংলাদেশ এগিয়েই আছে। তাছাড়া সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়েও খুব বেশি দ্বিমত নেই। কিন্তু গোল বেঁধেছে সমকালীন সামষ্টিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে। সামনে বিপুল নীল সমুদ্র। তাকে পাড়ি দেয়ার সক্ষমতা আগামী দিনের বাংলাদেশের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বিরাট যেসব ঢেউ এই মুহূর্তে তীরে এসে ধাক্কা মারছে তাতেই শঙ্কা বাড়ছে। অথচ বাংলাদেশের অর্জন তো মোটেও হেলাফেলার নয়। কিন্তু তবু কেন এই শঙ্কা? এই দুর্ভাবনা কি খুবই সাময়িক? নাকি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার মতো কোনো বাস্তব কারণ রয়েছে? আমাদের অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের দিকে কী আমরা যথেষ্ট নজর দিইনি? নাকি বিশ্ব অর্থনৈতিক চাপের মুখে আমরা খানিকটা অগোছালো পদক্ষেপ নিয়েছি? বাজারের গতিপ্রকৃতি বুঝে কি আমরা যথেষ্ট বিচক্ষণ নীতি-সক্রিয়তা দেখাতে দ্বিধাস্থিত?

এ কথা ঠিক, শুধু বাইরের অর্থনৈতিক সংকটকে দায়ী করে আমরা আমাদের এগিয়ে চলার পথ কণ্টক মুক্ত রাখতে পারব না। আমাদেরও যে দায় আছে সে কথাটি মানতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘কালান্তর’ পর্বের লেখা ‘বাতায়নিকের পত্র’-এ ঠিকই অনুভব করেছিলেন যে ‘জাহাজের খোলের ভেতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে তখনই জাহাজের বাইরেরকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ভেতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এই জন্য বাইরের ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের ওপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে, নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে আসল মরণ ঐ ভেতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত শীঘ্রই পারা যায় সেচে ফেলতে হবে। ...মনে রাখা চাই যে সমুদ্র সেচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ, খোলের জল সেচে ফেলা।’ নিঃসন্দেহে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস যদি কোনো ঘাটতি দেখা দিয়ে থাকে সেদিকে আগে নজর দিতে হবে।

আমাদের অর্থনীতিতে এখনও নিশ্চয়ই বাইরের বাধা প্রচুর রয়ে গেছে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে। ডলার বাজারে আঙুন আমদানি করা পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। তাই বলে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আমাদের মূল্যস্ফীতি, বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে বাগে আনার পরিচিত কামান কি আসলেই আমরা সজোরে দাগিয়েছি? সমন্বিত মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতির তীর কি সময় মতোতূণ থেকে বের করেছি? মুদ্রার

একাধিক বিনিময় হারকে কি সমন্বিত করেছি? শ্রীলঙ্কা এবং হালের তুরস্ক যদি নীতি সুদের হার এতটা বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কমানোর পথে হাঁটার সাহস দেখাতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারছি না? এসব প্রশ্নের সোজা উত্তর দেওয়া মুশকিল। এরসঙ্গে অনেক কাঠামোগত প্রশ্ন নিশ্চয়ই জড়িয়ে আছে। এ কথাও মানি, নির্বাচনের এই বছরে অনেক ভেবে চিন্তেই পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। তবু মূল্যস্ফীতি ও ডলার সংকটের মতো প্রধান সমস্যাগুলোর সামনা-সামনি দাঁড়াতেই হবে আমাদের।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই মুহূর্তে বিদেশি মুদ্রার বাজারটিই আমাদের বেশি ভোগাচ্ছে। আবার এর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে মুদ্রানীতির ভঙ্গিটির সঙ্গে। অন্য কথায় সুদের হারের নমনীয়তার মাত্রার ওপর। কভিড সংকট ও ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে আমাদের আমদানি মূল্য বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই মূল্য শুধুই রপ্তানি ও প্রবাস আয় দিয়ে পুরোপুরি শোধ করা সম্ভব হয়নি বলেই বাণিজ্য ঘাটতির হাত ধরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার কমতে থাকে। তাই টাকার মান অবমূল্যায়ন করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ৩০ শতাংশ অবমূল্যায়নের ফলে আমদানিকরা পণ্যের দামও বেড়ে গেছে। প্রায় একই হারে আমদানি শুল্কও বেড়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শুল্কের হার কিছুটা কমালেও সার্বিকভাবে আমদানিকরা পণ্যের দাম বাড়ন্তই রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার বেশ কিছু প্রশাসনিক উদ্যোগ নিয়েছে। আমদানির ওপর নিশ্চয়ই এসবের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আমাদের আমদানি করা নিত্য ব্যবহার্য পণ্য, শিল্পের কাঁচামাল ও বিলাস পণ্যের সরবরাহ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তাই হালে বাণিজ্য ঘাটতি অনেকটাই কমেছে। এর প্রভাবে আমাদের চলতি হিসাবেরও উন্নতি হয়েছে। যদিও এই উন্নতির পেছনে অনেক ছোটখাটো আমদানি আনুষ্ঠানিক চলতি হিসাবের বাইরে চলে যাওয়ার কারণেও হতে পারে। কেননা ছায়া বাজারে লেনদেনের চাহিদা এখনো বেশ চাপা বলেই মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে হুন্ডির বাজার কম করে হলেও ১৫ বিলিয়ন ডলারের কম বলে মনে হচ্ছে না।

এ কারণে আনুষ্ঠানিক প্রবাস আয় কমছে। একইসঙ্গে নিট এফডিআইও বিদেশি সহযোগিতার ছাড়সহ আমদানি ঋণ ও রপ্তানি বিল ডিসকাউন্টিং কমে যাওয়ার কারণে আমাদের আর্থিক লেনদেন ভারসাম্য নেতিবাচক হয়ে গেছে। এর প্রভাব সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের ওপরও পড়েছে। এটিও এখন নেতিবাচক। এসবের চাপ রিজার্ভের ওপর পড়ছে। তা দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। যদিও আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার এখনো মন্দ নয়। তবু অর্থনীতির বাড়ন্ত আকারের কথা মনে রাখলে এই ক্ষয়ের ধারা নিয়ে তো শঙ্কা হতেই পারে।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের রপ্তানিকারকদের নানা সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও কেন তাদের রপ্তানি আয় আগের চেয়ে কম নগদায়ন হচ্ছে, তা বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। আনুষ্ঠানিকও অনানুষ্ঠানিক বিনিময় হারের এতটা ফারাকই কি এর জন্য দায়ী? এর ফলে কি এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে ডলারের দাম আগামী দিনে আরো বাড়বে? তাই পুরোটা দেশে না আনলেই তাদের জন্য ভালো, নাকি বাকিতে পণ্য রপ্তানি আয়

আগাম নগদায়নে বিদেশি ব্যাংক আগ্রহী হচ্ছে না? টাকার অবচিতির ধারা হালের প্রবাস আয় কমে যাওয়ার পেছনেও খাটে? নাকি প্রবাসীদের অনেকেরই আনুষ্ঠানিক কাজের যথাযথ কাগজপত্র নেই? না কি রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান অনেক সূক্ষ্মভাবে সব আমদানি এলসি দেখতে গিয়ে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে না? তাই তারা ছায়া বাজারে গিয়ে ডলারের চাহিদা বাড়াচ্ছে। তাহলে এই চাহিদা কমানোর উপায় কী? মুদ্রানীতিও রাজস্ব নীতিকে আরও সংকোচনমূলক করাই কি এই সংকটের অন্যতম একটি উত্তরহতে পারে? এসব প্রশ্ন না এড়িয়ে বরং এসবের ভালোও মন্দ দুই দিক নিয়েই অংশীজনদের সঙ্গে আলাপের কোনো বিকল্পনেই বলে আমার কাছে মনে হয়।

আমদানি নির্ভর শিল্পায়নের সুফল আমরা অনেকদিন ধরেই পেয়ে আসছি। কাঁচামাল, মধ্যপণ্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি না করা গেলে আমদানি বিকল্প কিংবা রপ্তানি শিল্পই বাসচল রাখা যাবে কী করে? ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পগুলোকে ও বিইউ বা অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের মাধ্যমে আমদানি মূল্য সেটলমেন্ট করার বিশেষ সুযোগ বাংলাদেশ ব্যাংকই চালু করেছিল। কিন্তু কী কারণে বিদেশি ব্যাংকগুলোর এ ধারায় স্বল্পকালীন আমদানি ঋণ দিতে অনীহা তা জানা দরকার। অবিলম্বে বিদেশি ব্যাংকগুলো ও তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে নিবিড় আলাপের প্রয়োজন রয়েছে।

আর বিনিময় হারকে বাজারভিত্তিক করার পাশাপাশি (এরই মধ্যে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে) চলতি হিসাবে বাণিজ্যিক লেনদেন, বিজ্ঞাপনী ব্যয়, চিকিৎসা ব্যয়, কার্ড পেমেন্টস কী করে সহজ ও 'সিমলেস' করা যায়, তা এফুনি ভাবে হবে। তাহলেই এসব লেনদেনের জন্য তারা ছায়াবাজারে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রপ্তানিকারকদের তাদের রপ্তানি পণ্যের আয় দেশে আনতে হয়। বিভিন্ন পয়েন্টে (ব্যাংক, কাস্টমস, ইপিবি ইত্যাদি) তাদের রিপোর্ট করতে হয়। একইকথা সার্ভিস রপ্তানির বেলায় খাটে না। তাদের সে জন্য কর সুবিধা ও অন্যান্য প্রণোদনা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে এই আয়ও ছায়াবাজারে চলে যেতে পারে।

বিদেশি মুদ্রায় পরিবহন খরচের একটি বড় অংশ আমরা নিজেদের জাহাজ চালু করে বাঁচাতে পারতাম। এ বিষয়টির পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপনও জারি করেছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন সমানতালে সক্রিয় হলে এ ক্ষেত্রে বড় মাপের বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় করা

সাম্প্রতিক সম্পাদকীয়

RESEPHS CAREER CARE

Cloud technology: Governing it and managing risks in business

Illustration: TBS

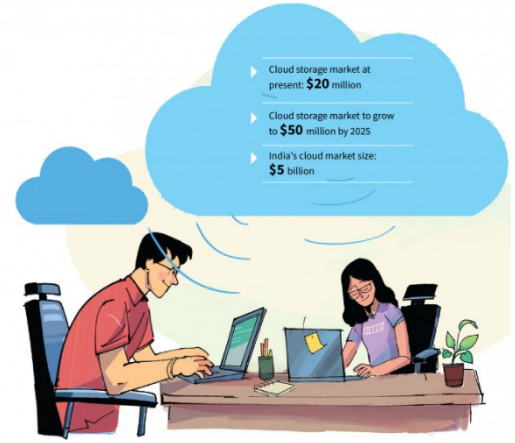
Many businesses worldwide have embraced cloud technology as an essential component of their digital transformation journey. In Bangladesh, most leading organisations have started migrating and implementing their enterprise resource planning (ERP) applications on cloud infrastructure and storing many of their business documents on cloud storage.

These new practices symbolise progress towards building a digital enterprise and help organisations drive new business models and create value for their stakeholders. However, business leaders of these leading organisations must be mindful of a critical component of this transformation journey – managing risks and compliance.

Inadequate focus on risk management while transforming the business may lead to severe consequences, including cyberattacks, interruption of business operations, regulatory non-compliance and cost overrun. Each can be impactful enough to erode all the business benefits envisaged through adoption.

It should be noted that all organisations that have adopted cloud technology are not necessarily cloud-powered. A cloud-powered organisation understands and acknowledges that its transformation journey will likely create new business risks. So, it revises its risk management plan and implements it accordingly. According to a PwC analysis, cloud technology can impact risks and controls in several ways. There should be a multi-pronged approach to address risk management while running cloud adoption programs.

First, a cloud-powered organisation should implement a mature cloud governance framework. PwC's analysis found a direct correlation between an organisation's cloud maturity and its risk management maturity. The cloud-powered organisations are likely to assess their cloud controls more regularly than non-cloud-powered organisations. Moreover, these organisations are likely to develop more formal controls which are relevant to cloud operations. They are also likely to define the responsibilities of various functions internally and externally, including those of the cloud service providers.



For example, one of the critical risks of cloud adoption may be unallocated costs. A cloud-powered organisation involves its finance function to prepare and implement the cost allocation model and regularly reviews it through the governance framework. Next, a cloud-powered organisation must understand the importance of collaboration in managing its risks and incorporate risk management into its cloud strategy. While a PwC analysis recommended organisations start planning their risk mitigation strategy at an early stage, more than half of the organisations surveyed did not begin their risk management processes early enough.

Remediation at a later stage of the transformation will likely be more costly and may lead to delays in the value-creation process. Therefore, it is essential to collaborate and work together through the transformation process.

For many organisations in Bangladesh, CEOs make key transformation decisions. They must be actively involved in revising and reviewing the risk management plan along with the organisation's risk management leader and transformation leader.

Finally, a cloud-powered organisation should be aware of the regulatory landscape and the impact of the changing regulations on the business. The rules around cloud technologies will likely remain ambiguous and mutually overlapping soon. Multiple regulators are also likely to control the risks of cloud technology through various measures.

Though essential, relatively newer regulations, such as those on data protection and data privacy, are likely to create hindrances in the cloud adoption journey if they are not understood and complied with. Bangladesh's organisations have made significant progress in cloud adoption over the last few years. The time has come for business leaders to plan and implement robust cloud governance frameworks and leverage them to create value for their stakeholders. Arijit Chakraborti is a Partner with PwC.

Gender equality is the investment we need to make

The SDG Gender Snapshot 2023 report was launched earlier this month. This publication is the latest instalment in the annual series jointly produced by UN Women and UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). The report provides a comprehensive analysis of gender equality progress across all 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Even with significant progress in certain sectors, as we approach the halfway mark of 2030 Agenda for Sustainable Development, monumental challenges remain.

Let's take a closer look at the progress made towards each goal. Goal 1 of the 17 SDGs is "No poverty." Regarding this, the report forecasts that by 2030, 8 percent of the global female population (approximately 342 million women and girls) will continue to live on less than \$2.15 a day. Only 42 percent of countries have sex-disaggregated poverty data readily available, impeding targeted interventions. For "Goal 2: Zero hunger", the report finds that while progress in narrowing the gender gap in food insecurity has been made, roughly 24 percent of women and girls may still experience moderate to severe food insecurity by 2030. Gender disparities in agriculture persist, with limited access to land, resources, and ownership affecting productivity. Regarding "Goal 3: Good health and well-being" the report finds that while maternal mortality reduced globally from 2000 to 2020, progress has stagnated since 2015. High maternal death rates in sub-Saharan Africa and Central/Southern Asia highlight and inequalities in healthcare access and quality.

For "Goal 4: Quality education" the report finds that increases in girls' enrolment in education are commendable, but nearly 110 million girls and young women could remain out of school by 2030 if the progress stalls. Gender gaps in education and training opportunities persist, affecting future earning potential and overall development.

On the other hand, "Goal 5: Gender equality" has witnessed limited progress with just two of this goal's indicators nearing their targets. No indicator has fully met its aim. Deep-seated biases persist, marked by unequal health access, unequal political representation, economic gaps, and inadequate legal defences. Critical data for monitoring progress is missing in many countries. Furthermore, 28 countries do not recognise women's equal rights in marriage and divorce. Globally, 19 percent of young women are married before age 18, and there is a notable disparity in leadership roles.

Analysing "Goal 6: Clean water and sanitation", the report states that while more women now have access to safe drinking water, around 380 million women and girls live amid high or critical water stress, a number projected to increase to 674 million by 2050 due to climate change. Similarly, in "Goal 7: Affordable and clean energy", approximately 341 million women and girls could lack access to electricity by 2030, with clean cooking fuels remaining out of reach for many. Universally electricity could elevate 185 million women and girls from poverty by 2050, and modern cookstoves could prevent 6.5 million pollution-related deaths.

As for "Goal 8: Decent work and economic growth," disrupted careers, care responsibilities, and wage discrimination mean women only earn a third of the global income generated by labour. For each dollar men earned in labour income, women earned only 51 cents. The gender wage gap and underrepresentation of women in the labour force continue, indicating the need for policy reforms to ensure equitable opportunities and wages.

When it comes to "Goal 9: Industry, innovation and infrastructure," women hold 21 percent of STEM (science, technology, engineering, and mathematics) jobs and only one in three researchers is a woman. Gender disparities in technology and innovation persist, hindering women's participation in STEM fields and impeding progress in emerging technologies like artificial intelligence. On "Goal 10: Reduced inequalities", gender discrimination comes in many forms and remains commonplace, undermining human rights. According to the latest available data, up to 21 percent of people living with HIV reported being denied health care in the past 12 months, and up to 26 percent of women living with HIV reported that their treatment for the virus was conditional on taking contraceptives.

On "Goal 11: Sustainable cities," by 2050, urban areas are expected to house 70 percent of the world's female population, totalling 3.3 billion. Alarming trends suggest a third of these women and girls could find themselves living in inadequate housing or slums. Moreover, women and with disabilities, representing approximately 18 percent of the female population, face heightened challenges. A 2022 study indicated that a mere 27 percent of 190 countries and regions explicitly protected the rights of women with disabilities.

Regarding "Goals 12-15: Responsible production and consumption, climate action, life below water, life on land," up to 158 million more women and girls might find themselves in poverty by mid-century due to worsening conditions fuelled by global warming. This represents 16 million more than their male counterparts. An alarming 236 million more women and girls may experience food insecurity, compared to 131 million men and boys. Despite these numbers, only 55 of the world's national climate action plans include gender-specific adaptation measures, and only 23 recognise the vital role of women as change agents in the fight against climate change.

For "Goal 16: Peace and strong institutions" the snapshot report states that since 2017, the number of women and girls in conflict-ridden areas has surged by 50 percent, tallying up to 614 million by 2022. In 2023, those in extremely fragile areas were especially vulnerable, facing higher poverty rates and increased food insecurity. Intimate partner violence is 2.4 times higher in extremely fragile contexts compared to non-fragile settings.

Regarding "Goal 17: Partnerships", a dire need for enhanced financial backing exists in countries where gender equality lags the most. The yearly budget dedicated to gender equality as a principal objective remains low at \$5.7 billion, just 4 percent of total bilateral aid. This minimal support, coupled with the fact that only one in four countries actively tracks gender equality funding, underscores the challenges faced in achieving parity

The 11 biggest hurdles for women's equality by 2030 are lack of women in leadership, poverty and lack of economic opportunities, workplace discrimination and inequalities, and imbalance in unpaid care work, social norms and cultural practices, inadequate access to education and health care, food insecurity, violence against women and girls, inadequate funding for gender equality initiatives, legal barriers and poorly enforced legislation, and lack of access to clean energy and sanitation.

The SDG Gender Snapshot 2023 report advocates for an integrated, holistic approach to advancing gender equality, involving multistakeholder collaboration and sustained financial backing. Neglecting to amplify efforts and invest in gender parity jeopardises the entire 2030 Agenda for Sustainable Development.

It is evident we are doing even worse than we realised on gender equality. The price tag for SDG 5 – achieving gender equality and women's empowerment – is in. We can afford it, we need to pay for it. We know that an additional \$360 billion per year is needed to achieve gender equality in developing countries across key global goals. This is less than one fifth of the \$2.2 trillion spent globally on military expenditure in 2022. *Gitanjali Singh is country representative of UN Women in Bangladesh*

ডেঙ্গু প্রতিরোধে যে কারণে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি

ডেঙ্গুর ছোবলে মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি এবং আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কোনোমতেই থামানো যাচ্ছে না ডেঙ্গুর ভয়াবহ অগ্রযাত্রা। ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা সফল হচ্ছি না কেন? ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আদৌ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি? এরকম বহু প্রশ্ন এখন নানাদিক থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার কতগুলো মৌলিক নীতি রয়েছে। তার অন্যতম হচ্ছে শত্রুর সামর্থ্য, বিস্তৃতি, স্বভাব চরিত্র, আঘাত হানার ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। বিষয়টি ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ। ডেঙ্গুর বাহক হলো এডিস মশা। এর দুটি প্রজাতি দ্বারা ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমিত হয়। এগুলো হচ্ছে এডিস ইজিপ্টাই বা গৃহবাসী এডিস মশা এবং অন্যটি হলো এডিস অ্যালবোপিকটাস বা বুনো এডিস (এটাকে এশিয়ান টাইগার নামেও ডাকা হয়)। সাধারণভাবে গৃহবাসী এডিস ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মহামারির সময়ে বুনো এডিস মশাও ডেঙ্গুর বাহকে রূপান্তরিত হয়। ডেঙ্গুপ্রবণ দেশ বা অঞ্চলে ডেঙ্গু প্রতিরোধ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য থাকে এডিস মশা নির্মূল করা।

আমরা জানি পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রভাবে অন্যান্য প্রাণীর মতো মশার আচরণেও পরিবর্তন আসতে পারে। এজন্য মশা, বিশেষ করে এডিস মশার বাসস্থান, প্রজনন স্থল, আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করতে হয়। বাংলাদেশে এই কাজটি একেবারেই হচ্ছে না। সাধারণভাবে আমরা জানি এডিস মশা জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে। এই মশা সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় মানুষকে কামড়ায়। ইতিমধ্যে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ও কীটতত্ত্ববিদ তার নিজস্ব ছোট পরিসরের গবেষণায় দেখতে পেয়েছেন বাংলাদেশে এডিস মশার আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই মশা এখন জমে থাকা পরিষ্কার ও ময়লা-নোংরা উভয় ধরনের পানিতে ডিম পাড়ে এবং দিনরাতের যেকোনো সময় মানুষকে কামড়াতে শিখেছে। স্বাভাবিকভাবে তিনি এই নতুন তথ্য দেশবাসীকে জানানেন। জনসাধারণ এবং ডেঙ্গু নিয়ে কর্মরত সবার মধ্যে এই নতুন তথ্য দারুণ সাড়া ফেলে দেয়। এর কয়েকদিন পর আরেকদল কীটতত্ত্ববিদ রীতিমতো সভা করে জানানেন বাংলাদেশে এডিস মশার আচার-আচরণ ও স্বভাব চরিত্রে কোনোধরনের পরিবর্তন হয়নি। যিনি পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য দিয়েছেন তার গবেষণা গ্রহণযোগ্য মানের নয়। তাহলে সঠিক কোনটি?

তা জানতে হলে এডিস মশা নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানের একটি গবেষণা করা জরুরি প্রয়োজন। এবং সেই গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মশা নির্মূলের কৌশল নির্ধারণ করা হবে। দুই যুগের বেশি সময় ধরে দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ চলছে। কিন্তু এডিস মশা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি।

মশা নির্মূলের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। আমাদের মতো দেশের জন্য রাসায়নিক, পরিবেশগত ও জিনগত নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কর্মকৌশল গ্রহণ করা উত্তম। রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ হলো ওষুধ দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক বা উড়ন্ত মশা এবং মশার লার্ভা বা শূককীট মেরে ফেলা। বছরের পর বছর ধরে মশা মারার ওষুধ কেনা হচ্ছে, ছিটানো হচ্ছে কিন্তু মশা মরছে না। কারণ ওষুধগুলো মোটেই কার্যকর নয়। মাঝখান থেকে শুধু জনগণের করের শতশত কোটি টাকা খরচ হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে এই অর্থের বিপুল অংশ দুর্জনের পকেটে প্রবেশ করেছে।

পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, এডিস মশার প্রজননস্থল ও আবাসস্থান বিনষ্ট করা। জনসাধারণের যুক্ত করে এই কাজটি দেশের কোথাও করা হয়নি। ২০১৯ সালের আগে ডেঙ্গুর প্রকোপ ঢাকাসহ কয়েকটি বড় শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পরিকল্পনা সহজেই বাস্তবায়ন করা যেত। সেইসময় দায়িত্বশীলরা কথার ফুলবুরি ছুটিয়েছেন কিন্তু মশা নির্মূলে প্রদর্শনবাদী কার্যক্রম ব্যতিরেকে তেমন কিছুই করেননি। ২০১৯ সালের মহামারির মধ্য দিয়ে ডেঙ্গু সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন গৃহবাসী এডিসের সাথে বুনো এডিস মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহকে রূপান্তরিত হয়। ২০১৯ সালের আগে যে কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বর্তমানে তা পর্বত সমান ও কঠিন হয়ে গিয়েছে।

এখন রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মশা মারার কার্যকর কর্মসূচি নির্ধারণ করা দরকার। এই কর্মসূচিতে রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের সাথে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণও যুক্ত রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি ছাত্র, যুবক, স্বেচ্ছাসেবী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সব স্তরের জনসাধারণ যুক্ত করে পাড়া মহল্লা এলাকা ভিত্তিক ‘মহামারি প্রতিরোধ কমিটি’ গঠন করা জরুরি। এই কমিটি নিজ নিজ এলাকায় এডিস মশা নির্মূলের লক্ষ্যে গঠিত ‘জাতীয় মহামারি প্রতিরোধ কমিটি’-র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই কমিটিগুলো অন্য মহামারি (যেমন কোভিড-১৯) প্রতিরোধেও কাজ করবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত কোনো সু-সমন্বিত জাতীয় কার্যক্রম সারাদেশে যুগপৎ বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু ভাইরাসের ধরন, সংক্রমণ ক্ষমতা, রূপান্তর ইত্যাদি নিয়ে কোনো ধরনের গবেষণা হয়নি এবং এখনো হচ্ছে না। ফলে এক্ষেত্রেও আমরা অন্ধকারে থেকে যাচ্ছি। এদিকেও নজর দেওয়া অতিশয় দরকার। ডেঙ্গুর প্রবল সংক্রমণের মুখে মানুষ অসহায় এবং দিশেহারা। মানুষের এই অসহায়ত্বকে পূঁজি করে একদল অসৎ মানুষ সবসময় মুনাফা শিকারের নেশায় থাকে। করোনা মহামারির সময়ে তেমনটি আমরা দেখেছি। ডেঙ্গুর এই দুঃসময়ে একদল মুনাফা লোভীর কারসাজি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গু চিকিৎসায় অতিপ্রয়োজনীয় শিরাপথে দেওয়ার স্যালাইন জাতীয় ওষুধের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দুষ্টচক্র দমন করার কোনো পদক্ষেপ জনসাধারণের চোখে পড়ছে না। ডেঙ্গু প্রতিরোধের আরেকটি দিক হলো, আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা। ডেঙ্গু রোগীর শরীর

থেকে রক্ত খাওয়ার পর সেই এডিস মশা কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে ওই মানুষটির শরীরে ডেঙ্গুর ভাইরাস প্রবেশ করবে। এজন্য ডেঙ্গু রোগীকে মশারির ভেতর রাখা হয়। কিন্তু অনেক সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর জন্য মশারির ব্যবস্থা নেই। অথচ একটি বা দুইটি বিলাসবহুল গাড়ির দাম দিয়ে প্রয়োজনীয় সব মশারির জোগান দেওয়া যায়।

শুধুমাত্র চিকিৎসা দিয়ে ডেঙ্গুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এটা শুধু আমাদের দেশ কেন পৃথিবীর কোনো দেশেই সম্ভব নয়। কারণ কোনো দেশের হাসপাতালে অগণিত সংখ্যার শয্যা থাকে না। কেবলমাত্র এডিস মশার দ্বারাই মানুষের শরীরে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রবেশ করে। এজন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধের কার্যকর উপায় হচ্ছে এডিস মশা নির্মূল করা। ডেঙ্গু বিরোধী লড়াইয়ে অসংগঠিতভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ করা হয়েছে। তাতে কোনো সুফল মেলেনি। বড় বড় কথা বা মুখরোচক বক্তৃতা দিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। মশা মানুষের কথা সম্ভবত বোঝে না। ডেঙ্গু বিরোধী যুদ্ধে সফল হতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং জনসাধারণ যুক্ত করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ডা. লেলিন চৌধুরী ।। চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

বাজারের উত্তাপে দিশেহারা মানুষ : হুমকিতে খাদ্য নিরাপত্তা

নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সুখবর নেই। প্রতিদিন কোনো না কোনো পণ্যের কৃত্রিম সংকট হচ্ছেই। যার কারণে সরকার প্রথমবারের মতো ৩টি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে করে ঐ পণ্যের বাজার কিছুটা হলেও স্থিতিশীল রাখা যায়। ভোক্তাদের জাতীয় সংগঠন কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)সহ অনেকে স্বাগত জানালেও কিছু কিছু রাজনৈতিক সংগঠন আবার মতপ্রকাশ করেছেন মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এভাবে দাম নির্ধারণ করে দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যেহেতু এই কয়টি পণ্য নিয়ে কিছুদিন ধরেই কারসাজি চলমান ছিল। তাই সরকার বাধ্য হয়ে এই কাজটি করেছে, যাতে ঐ পণ্যের দামে কিছুটা হলেও রেশ ধরা যায়।

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, দাম নির্ধারণ করে দিলে হবে না। প্রয়োজন এই সিদ্ধান্ত মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং কৃষি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে নিয়ে সমন্বিত বাজার তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। তাদের মতে, ব্যবসায়ীরা বাজার তদারকিকে হাস্যকর করার জন্য নানা ফন্দিফিকির করতে চায়। এজন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রথা অনুসরণ বাদ দিয়ে যেসব পণ্য নিয়ে কারসাজি হবে সেইগুলো দ্রুত আমদানি করে বাজার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সংকট কেটে গেলে আবার পুনরায় আগের স্থানে ফিরতে হবে, এই নীতি অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই এই সংকটের আশু সমাধান হবে। অনেকের মতে, অতি মুনাফা এখন সামাজিক সংক্রমণে পরিণত হয়েছে। আর এজন্য আইনের প্রয়োগ না হওয়াই দায়ী। এক সময় কিছু পণ্য নিয়ে কারসাজি হতো, আর এখন কারসাজি হয় না এমন পণ্য পাওয়া ভার। ব্যবসায়ীরা নীতি নৈতিকতা ভুলে শুধু লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশনি সংকেত। ব্যবসায় সুস্থ ধারা ফেরাতে ব্যবসায়ী সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের এই সংকটে সরকারের পাশে থাকতে হবে।

ব্যবসায়ীরা একবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে বিশ্বে পণ্য সরবরাহব্যবস্থা সমস্যার কথা বলে নিত্যপণ্যের বাজার অস্থির করেছিল। আবার ডলারের মূল্যবৃদ্ধি ও সংকট, এলসি খোলা যাচ্ছে না, আবার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এভাবে নানা অজুহাত সামনে এনে অস্থিরতা তৈরি করে। এর ফলে বাড়ে আমদানি করা পণ্যের মূল্য। যার ফলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে খাবারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২ বছরের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ। ২০২৩ সালের আগস্টে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১২.৫৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে খাদ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ২০১১ সালের অক্টোবরে ১২.৮২ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেশি বেড়েছে গ্রামীণ এলাকায়। সেইখানে এর পরিমাণ ১২.৭১ শতাংশ। ২০২৩ সালের জুলাইতে তা ছিল ৯.৮২ শতাংশ। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৪০ শতাংশ।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এফএও এর তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট মাসে সারা বিশ্বে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমে সর্বনিম্ন হয়েছে। এমন এক সময়ে দেশে এই মূল্যস্ফীতি বাড়ছে যখন আশেপাশের দেশসহ সারা বিশ্বে এটি কমে আসছে। খাবারের দাম কমেছে সারা বিশ্বে, দেশে উল্টো রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি। এই সময়ে চাল ও চিনি ছাড়া বিশ্ববাজারের প্রায় সব খাদ্যপণ্যের দামই কমেছে। তবে উল্টোচিত্র দেখা গেছে বাংলাদেশে। অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা ছাপিয়ে ধার দেওয়াটা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ সুদহার বাড়িয়ে যেখানে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করছে সেইখানে বাংলাদেশ হাঁটছে উল্টো পথে। ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে এখনো কৌশলে সুদহার কমিয়ে রাখা হয়েছে। তাছাড়া বাজার অব্যবস্থাপনার কারণেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু মূল্যস্ফীতি কমাতে সরকারের লক্ষণীয় কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি এক বছরের বেশি সময় ধরে। যার কারণে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত সব ধরনের জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। চাল, ডাল, তেল, চিনি, পৈয়াজ, মাছ-মাংসসহ সব ধরনের খাবারই নয়; দাম বাড়ছে তেল, সাবান, প্রসাধন সামগ্রী, পোশাক-আশাক, শিক্ষাসামগ্রী, গণপরিবহনসহ সবকিছুর।

নিত্যপণ্যের দাম কতটা বেড়েছে, তার চিত্র উপস্থাপন করার প্রয়োজন না হলেও সবাই বাজারের উত্তাপ সম্পর্কে অবহিত আছেন। সবজি, মাছ অথবা নিত্যপণ্যের বাজারে দামের উত্তাপ। সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ক্রেতারা বেশি সংকটে আছেন। বাজারে গেলেই সাধারণ মানুষের ‘বুকে ব্যথা বেড়ে যায়’। বাজারে গেলেই পণ্যমূল্যের সবকিছুর দাম শুনলে বুক ধড়ফড় করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন বাজারে খবর নিলেই ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বললে মোটামুটি একই চিত্র পাওয়া যাবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সীমিত আয়ের বেশিরভাগ মানুষকে সংসার চালাতে এখন প্রতিটি খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হচ্ছে।

বর্তমানে প্রচলিত বাজার তদারকির মডেল একটি সফল মডেল হলেও কিছু ব্যবসায়ী বাজার তদারকির এই কার্যক্রমকে ব্যর্থতায় রূপান্তরিত করতে নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছে। বাজার তদারকিতে এখন ভোক্তা অধিকার ছাড়া সরকারের অন্য কোনো দপ্তর দেখা যায় না। এক সময় জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, ডিএমপি, বিএসটিআই বাজার তদারকি করলেও এখন তাদের আর এই কাজে দেখা যায় না। আর ভোক্তা অধিকারের লোকবল একেবারেই সীমিত। জেলা পর্যায়ে মাত্র ১ জন কর্মকর্তা দিয়ে এই কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

ক্যাব থেকে বারবার দাবি করা হচ্ছে, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অফিস স্থাপন ও লোকবল পদায়ন করার পাশাপাশি জেলা ও কেন্দ্রীয়ভাবে আরও লোকবল বাড়াতে হবে। বর্তমানে ১৬টি জেলায় ভোক্তার কর্মকর্তা নেই। তাহলে তারা কীভাবে এই তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করবে? ঢাকা শহরে সিটি কর্পোরেশনের ১০০টি বাজার আছে আর এর বাইরে হাজার খানেক বাজার থাকলেও ভোক্তার টিম মাত্র ২টি। তা দিয়ে এই বিশাল কার্যক্রম তদারকি সম্ভব নয়। তাই সরকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভোক্তার কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার দিকে মনযোগী হতে হবে। একই সাথে বিদ্যমান আইনের সংস্কার করতে হবে। অনেকগুলো অতাবশ্যকীয় সেবায় আইনের আওতায় প্রতিকার দেওয়া যায় না। এস এম নাজের হোসাইন ।। ভাইস প্রেসিডেন্ট, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে যখন বাংলাদেশ

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার জাতীয় তেল কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতান আল জাবেরকে কপ ২৮ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করেন। যিনি দুবাইয়ে ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনের তত্ত্বাবধান করবেন। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প স্তরের থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত করার লক্ষ্যে বিশ্বকে কীভাবে অগ্রসর করা যায় তা নিয়ে যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিতে ১৯০টিরও বেশি দেশের রাজনৈতিক নেতারা এই সম্মেলনে একত্রিত হবেন। তেল, গ্যাস, জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানির প্রতিনিধিরা কপ ২৮ বা কোনো ধরনের জলবায়ু সংলাপেরই নেতৃত্ব থাকতে পারেন না। থাকলে তা হবে সাধারণ মানুষের থেকে জলবায়ু অধিকার কেড়ে নেওয়া। আবুধাবি তেল কোম্পানির প্রধানকে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনের সভাপতি করে বিশ্বকে এক কঠিন জলবায়ু সংকটে প্রেরণ করল। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত রেখে কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। তবে সাধারণ মানুষের জলবায়ু অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া বিগত কয়েকটি কপ সম্মেলন থেকেই শুরু হয়েছে। ২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ ২৬ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৫০০ জন জীবাশ্ম জ্বালানি এবং তেল, গ্যাস শিল্পের লবিষ্ট ছিলেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালে মিসরে অনুষ্ঠিত কপ ২৭ সম্মেলনেও তেল, গ্যাস কোম্পানির পক্ষ থেকেও প্রায় ৬০০ জনেরও বেশি লবিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এভাবেই প্রতিনিয়ত বিশ্বের সব থেকে বড় জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি লবিষ্টদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা এক বিশাল অঙ্কের মুনাফার লোভে সজ্ঞানে সাধারণ মানুষ তথা পৃথিবীর ক্ষতি করছি। এছাড়া তারা দূষণকারী দেশের রাজনীতিকদের প্রভাবিত করছে, জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম আরও একটি কারণ প্লাস্টিক। ১৮৫০ সালে প্রথম প্লাস্টিক উদ্ভাবিত হয় তারপর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮৩০ কোটি মেট্রিক টন প্লাস্টিক উৎপাদন করেছে মানুষ। এর মাঝে প্রায় ৬৩০ কোটি মেট্রিক টন প্লাস্টিক পরিণত হয়েছে আবর্জনা। মাত্র ৯ শতাংশ রিসাইকেল করা হয়, ১২ শতাংশ পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং প্রায় ৭৮ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য হিসেবে রয়ে যায়। প্রতিবছর প্রায় ৮০ লাখ টন প্লাস্টিকের আবর্জনা নদী-নালা, খাল-বিলে গিয়ে সমুদ্রে জমা হচ্ছে। এক রিপোর্টে উঠে এসেছে, এখন পর্যন্ত যত প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে এবং স্থলভাগে রয়েছে, সেই সব বর্জ্য যদি এক জায়গায় জড়ো করা হয় তবে তা সর্বোচ্চ এভারেস্টের থেকেও সুউচ্চ হবে।

পরিবেশের আরেকটি ভয়াবহ রূপ মাইক্রো প্লাস্টিক। মাইক্রো প্লাস্টিক হচ্ছে প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রতম কণা। এর আকার ৫ মিলিমিটারেরও কম। মাইক্রো প্লাস্টিকের উৎস আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র। সমুদ্রে ভাসমান প্লাস্টিক বর্জ্য সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সহায়তায় ভেঙে মাইক্রো প্লাস্টিকে পরিণত হয় এবং খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে চলে আসে মানব শরীরে। দক্ষিণ এশিয়ার ৮০০ মিলিয়নেরও বেশি

মানুষ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ হটস্পটগুলোয় বসবাস করে, যে অঞ্চলগুলো ২০৫০ সালের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হবে, যদি তীব্র কার্বন নিঃসরণ অব্যাহত থাকে।

এই অঞ্চলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং মানব সম্পদের আরও দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবহার করার পরিস্থিতিতে ত্বরান্বিত করতে পারে। একজন জলবায়ুকর্মী হিসেবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভয়ংকর তীব্র তাপদাহ অনুভব করেছে। যা এর আগে কখনো অনুভব করেনি। আমি দেখেছি এই তীব্র গরমে অসহ্যকর পরিস্থিতিতে পড়া মানুষ এবং পশুপাখিদের, দেখেছি তীব্র খরা যার অন্যতম কারণে তীব্র তাপদাহ। যা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। বাংলাদেশও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেশ বড় ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদি সবদিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও অনেক বেশি। তাই উল্লিখিত পাঁচটি মানদণ্ডেই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় শীর্ষে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এই সমীক্ষা চালানো হয় ১৯৯০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৯৩টি দেশের ওপর। উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৭ এবং ২০০৮ সালের প্রতিবেদনেও বাংলাদেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমরা তখনই সফল হতে পারবো যখন বিশ্বনেতারা এর মর্ম বুঝতে পারবেন এবং প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশে সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়ন করবেন। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে, দেশে পেট্রোল চালিত যানবাহনের ব্যবহার কমিয়ে, সাইকেল এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে, প্লাস্টিকের ব্যবহার সীমিত করাও হতে পারে আরও একটি বড় পদক্ষেপ।

শুধু জলবায়ু কর্মীরাই নয়, এই জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। মানবজাতির এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে করে বিশুদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব হয় যার ফলে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্থভাবে বসবাস করতে পারে। সুদীপ্ত চন্দ্র রায় ।। জলবায়ুকর্মী এবং অ্যামাডেন প্রকাশিত বই ‘দ্য গ্রেট পলিটিক্যাল লিডারশিপ’-এর লেখক

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যেভাবে যানজট কমাবে

ভূমি বা সমতলের রাস্তায় যান চলাচলের যুগ থেকে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সড়কের ওপরে আরেকটি রাস্তা তৈরি করে যান চলাচলের সূচনা হয় ২০০৪ সালে মহাখালী ফ্লাইওভারের মাধ্যমে। এরপর আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আধুনিকায়ন হতে থাকে আর আমরা ২০২২ সালে মেট্রোরেলের সূচনা করে, রাস্তার ওপর রেল চলাচলেরও সূচনা করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যুক্ত হলো যা ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নামে পরিচিত। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে ফ্লাইওভারের একটি পার্থক্য রয়েছে তা হলো, ফ্লাইওভার কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান বিশেষ করে রাস্তার সংযোগস্থল বা লেভেল ক্রসিং-এর ওপর নির্মাণ করা হয় যাতে করে ঐ নির্দিষ্ট স্থানকে ওপর দিয়ে অতিক্রম করা যায়। এর দৈর্ঘ্য সাধারণত কম হয়। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হলো, রাস্তার ওপর নির্মিত আরেকটি রাস্তা যা শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্য আরেকপ্রান্তকে সংযোগ করে। এর দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হয়। যেমন নিকটবর্তী দেশ থাইল্যান্ডের ‘Bang Na Expressway’-এর দৈর্ঘ্য ৫৫ কিমি। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে অনেক আগেই।

বিভিন্ন দেশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

পৃথিবীর সব দেশ কয়েকটি লক্ষ্য নিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প হাতে নেয়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো যানজট কমানো। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পেছনেও অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যানজট কমানো। যদিও এর একপ্রান্ত (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) থেকে অন্য প্রান্ত (কুতুবখালি, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক) পর্যন্ত ১২.৭৩ কিলোমিটার কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা শহরের যানজট ও যানবাহনের কথা বিবেচনা করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে এগারো কিলোমিটার যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কীভাবে যানজট কমাতে সাহায্য করবে

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বিভিন্নভাবে যানজট কমাতে সাহায্য করে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যেহেতু নিজেই একটি রাস্তা তাই এর নির্মাণে শহরের মোট রাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রাস্তার পরিমাণ যত বাড়বে একই সংখ্যক গাড়ি তখন বিভক্ত হয়ে যাবে ফলে নির্দিষ্ট একটি রাস্তার ওপরে চাপ কমে যাবে।

দ্বিতীয়ত, রাস্তার সংযোগস্থলে যত বেশি গাড়ি থাকবে তত বেশি যানবাহন পরিচালনা করতে সময় বেশি লাগবে যা যানজট তৈরি করে। এখন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে কোনো সংযোগস্থল থাকে না এবং যত বেশি যানবাহন ওপরের রাস্তা ব্যবহার করবে নিচের রাস্তার সংযোগস্থলে তত গাড়ির চাপ কমে যাবে এবং ব্যবস্থাপনা সহজ হবে।

তৃতীয়ত, যে গাড়িগুলো এতদিন এক জেলা থেকে ঢাকার ভেতর দিয়ে চলাচল করে, অন্য জেলায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করতো তারা এখন থেকে ঢাকার মূল সড়কের গাড়ির সাথে যুক্ত না হয়ে সরাসরি ওপর দিয়ে রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারবে। এক্ষেত্রে দুটো সুফল পাওয়া যাবে। একটি হলো, যে গাড়িগুলো এতদিন ঢাকায় কোনো গন্তব্য না থাকলেও শুধুমাত্র বিকল্প রাস্তা না থাকায় ঢাকার সড়ক ব্যবহার করে যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ তৈরি করতো, তা হ্রাস পাবে।

দ্বিতীয় যে সুফল তা হলো অর্থনৈতিক, যা পাওয়া যাবে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্পূর্ণ কার্যক্রম শুরু হলে। এতদিন পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রাক দিনের বেলা ঢাকা প্রবেশ করতে পারত না, তাই এগুলো মালামাল নিয়ে সারাদিন ঢাকার কাছাকাছি অপেক্ষা করতো। এর ফলে পণ্য পরিবহনের খরচ ও সময় বেড়ে যেত এমনকি অনেক মালামাল নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সম্পূর্ণ অংশের যাত্রা শুরু হলে পণ্যবাহী ট্রাক সারাদিন যাতায়াত করতে পারবে এবং এতে করে একদিকে সময় ও খরচ কমে যাবে অন্যদিকে পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা রাখবে।

শুধু তাই নয়, অনেকসময় দেশের বাইরে গার্মেন্টসসহ অনেক পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে যানজটের কারণে শিপমেন্টের সময় বেশি লাগত কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সেই সমস্যা হ্রাস করবে। চতুর্থত, ঢাকা থেকে সড়কপথে বের হওয়া বা অন্য জেলা থেকে ঢাকায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প ব্যবহার করে সহজেই যানজট এড়িয়ে যাতায়াত করা যাবে। এতে করে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারকারীর যেমন সময়, জ্বালানি খরচ কম হবে তেমনি নিচের সড়কের যানবাহনের চাপ কিছুটা কমে যানজট কমাতে সাহায্য করবে।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উপরোক্ত যে সুবিধা, তা অর্জনের জন্য কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে যা পূরণ না হলে যানজট কমে না বরং শুধুমাত্র স্থান পরিবর্তন করবে। যেমন, ঢাকা শহরে ছোট গাড়ির আধিক্য এবং বৃদ্ধি হার অস্বাভাবিক বেশি। আমাদের প্রয়োজন বেশিসংখ্যক ছোট গাড়িকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করানো। এর ফলে নিচের যতটুকু সড়ক ফাঁকা হবে সেইখানে গণপরিবহন অগ্রাধিকার দিয়ে তার ব্যবহার উপযোগী করার পাশাপাশি সাইকেল ও হাঁটার জন্য নিচের সড়কের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে, ছোট ব্যক্তিগত গাড়ি বা মোটরসাইকেলের সংখ্যা যেভাবে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে অল্প সময়ে নিচের সড়কের চাপ পুনরায় বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রতিটি র‍্যাম্প একেকটি যানজট তৈরির পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে যদি না র‍্যাম্প ও তার কাছাকাছি সংযোগস্থলের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়। র‍্যাম্পের নিকটবর্তী রাস্তার সংযোগস্থলে যানজট তৈরি হলে তার প্রভাব এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প পড়বে অথবা র‍্যাম্প থেকে একসাথে অনেক গাড়ি নিচের রাস্তায় চলে আসলে তা নিকটবর্তী সংযোগস্থলের পরিচালনা সময় বাড়িয়ে দেবে।

শুধু তাই নয়, র‍্যাম্পের সামনে অহেতুক গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার না করলেও র‍্যাম্পের সামনে জটলা করে কৃত্রিম যানজটের সূচনা হতে পারে। র‍্যাম্পের মুখে যেন কোনো প্রকার পার্কিং বা অব্যবস্থাপনা না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্পগুলো রাস্তার একপাশ থেকে সংযুক্ত হয়েছে যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ফুটপাথ ভেঙে ফেলা হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে পথচারীরা এলোমেলোভাবে রাস্তা ব্যবহার করতে গিয়ে র‍্যাম্পের সামনে চলে আসতে পারে এতে করে দূতগামী গাড়ির সাথে দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভাবনা রয়েছে। ফুটপাথ নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে যাতে করে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় ও র‍্যাম্পের যান চলাচল বিঘ্ন না ঘটে। ঢাকা শহরের ভেতরে যেসব আন্তঃজেলা বাস ও ট্রাক টার্মিনাল রয়েছে তাদের মূল শহরের বাইরে সরিয়ে নিয়ে আন্তঃজেলা বাস ও ট্রাক বাধ্যতামূলক এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দীর্ঘমেয়াদি সুফলের জন্য সড়ককেন্দ্রিক মেগা প্রকল্পগুলোর সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে সড়ক দুর্ঘটনা যাতে না হয় তার জন্য নির্ধারিত গতিসীমা, মূল এক্সপ্রেসওয়েতে ৬০ কিমি/ঘণ্টা ও র‍্যাম্প ৪০ কিমি/ঘণ্টা, নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে গাড়ির গতি ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শন করলেই হবে না পাশাপাশি যদি কেউ ওভারস্পিড করে তাহলে পরবর্তী টোলার সাথে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এখন পর্যন্ত যতটুকু সম্পন্ন হয়েছে তা নিচে অবস্থিত রেলপথের ওপর দিয়ে নির্মাণ করার কারণে জমি অধিগ্রহণসহ অন্যান্য জটিলতা ও দুর্ভোগ কম হয়েছে। কিন্তু ফার্মগেট থেকে কুতুবখালি পর্যন্ত অংশে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না। তাই অবশিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের সময় জনদুর্ভোগ কমিয়ে দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শুধু একটি স্থাপনা মাত্র এবং আমাদের পরিকল্পিত ব্যবহারের সুফল বয়ে আনতে পারে আবার একইভাবে খামখেয়ালি বা ভুল সিদ্ধান্ত একে পরিণত করতে পারে এক ষ্ঠেত হস্তিতে। কাজী মো. সাইফুন নেওয়াজ ।। সহকারী অধ্যাপক (অন-লিভ), এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বুয়েট; সার্ভিলেন্স কো-অর্ডিনেটর, বিআইজিআরএস

প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

আধুনিক বিশ্বে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান ১ শতাংশের কাছাকাছি। বাংলাদেশের এফডিআই যদি ৫-৬ শতাংশে উন্নীত করা যায়, তাহলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ১০ শতাংশ। এই পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। এর জন্য দেশী উদ্যোক্তাদের পুঁজি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কার্যকর সুযোগ করে দিতে হবে। প্রকৃত অর্থেই বাংলাদেশে টেক্সটাইল, চামড়া জাত সামগ্রী, ইলেকট্রনিকস দ্রব্য, রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কাঁচা পাট, কাগজ, রেশম শিল্প, হিমায়িত খাদ্য (বিশেষত চিংড়ি), পর্যটন, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, সফটওয়্যার ও ডাটা প্রসেসিংয়ের মতো রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে সবার আগে দেশী-বিদেশী, সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে নানা সময়ে তুলে ধরা প্রতিবন্ধকসমূহ সরিয়ে ফেলতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে সরকারকে পৃথিবীর উন্নয়ন ইতিহাসে এ কথা প্রমাণিত, আজকের উন্নত দেশগুলোর ধনী হওয়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে দেশাভ্যবাস সম্পন্ন চেতনার সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল। ধনী দেশগুলোর কোনোটিরই ধনী হওয়ার পেছনে নব্য-উদারবাদীদের মুক্তবাণিজ্য বা মুক্তবাজার মতবাদ কাজে আসেনি। বরং কাজে লেগেছে বাণিজ্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশজ শিল্প সুরক্ষা এবং তা বিকশিত করার পথ-পদ্ধতি, যেখানে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। অথচ ১৯৯১ সাল থেকে দেশীয় শিল্প সুরক্ষার কথা বিবেচনা না করেই অনেকটা বলকয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গা ভাসিয়ে বেসরকারি খাতকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে। তারপরও এই দীর্ঘ চার দশকে বাংলাদেশ কল্যাণমূলক কোনো অর্থনীতি ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। এর কারণ, বাংলাদেশের অর্থনীতির এই বিকাশ মূলত দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র মানুষের খুদে খুদে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসনির্ভর (যা-ও আবার বড় বড় পুঁজিপতিরা ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে)। একবিংশ শতকের দ্বি-দশকে এসে বাংলাদেশ তার উন্নয়নের যাত্রায় বিশ্বের ৫০টি বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের তালিকায় ৪৬৫ বিলিয়ন ডলারের জিডিপি নিয়ে ৩৫তম স্থানে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু সেখানে উন্নয়নের অন্যতম অনুঘটক প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা এফডিআই) ভূমিকা ছিল খুব সামান্য। এখন বাংলাদেশের সরকার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা এফডিআই আকর্ষণে উঠেপড়ে লেগেছে। নানা আহ্বান জানাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। তারপরও বাংলাদেশের মতো এত সহজে টাকা উপার্জনের দেশে কিছুতেই বাড়ছে না এফডিআই।

এর কারণ কী? অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও বিদেশী ব্যবসায়ীরা অনেক দিন ধরেই বিদেশী বিনিয়োগের অপ্রতুলতার পেছনের কারণগুলো বলে আসছেন। সে অনুযায়ী সরকারও নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তবু প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় এফডিআই আসছে না দেশে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে এফডিআই বা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ) এসেছে ৩৪৪ কোটি ডলার। এর মধ্যে নিট পুঁজি ১৩৫ কোটি ডলার, যা মোট এফডিআইর ৩৯ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫১ কোটির মধ্যে নিট পুঁজি ৮২ কোটি ডলার, যা মোট এফডিআইর ৩৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩৭ কোটির মধ্যে নিট পুঁজি ৭৩ কোটি ডলার। অর্থাৎ মোট এফডিআইর ৩১ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৮৯ কোটি ডলারের মধ্যে নিট পুঁজি ১২০ কোটি ডলার, মোট বিনিয়োগের ৩১ শতাংশ। ২০২২ সালে বিশ্বে এফডিআই কমলেও বাংলাদেশে বেড়েছে। এ সময় দেশে এফডিআই প্রবাহ ২০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪৮ কোটি ডলার, যা এখন স্থানীয় মুদ্রায় ৩৭ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকার মতো (প্রতি ডলার ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা ধরে)। দেশে ১৯৯০ সালের পর এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এফডিআই।

দেশে গত ৩৩ বছরের মধ্যে ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ৩৬১ কোটি ডলারের এফডিআই এসেছিল। তবে এই হিসাবে শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে। এফডিআইর বড় অংশই এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানির ঋণ ও অর্জিত মুনাফা থেকে এসেছে। মোট বিনিয়োগের মধ্যে নিট পুঁজি হিসেবে আসে ৩০ থেকে ৩৯ শতাংশ। বিনিয়োগের এই চিত্র বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির বাংলাদেশের জন্য মোটেও সুখকর নয়। এফডিআই প্রসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ক একটি ডকুমেন্টারির তথ্য তুলে ধরতে সর্বাগ্রে মন চাইছে। ডকুমেন্টারিতে দেখা যায়, অতীতে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ‘কালোমানিক’ এক রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য তুলে ধরে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের আমলা-ব্যবসায়ীরা বিদেশে বসে যখন বিনিয়োগবিষয়ক আলোচনা করেন, তখন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ফিরিস্তি তুলে ধরেন। কিন্তু কোনো ফাইলে স্বাক্ষর করার সময় এলে সবার আগে বিদেশী বিনিয়োগকারীর কাছে তার দেশে আবাসন খাতের নিয়মকানুন জানতে চান, সিটিজেন হওয়ার শর্তসমূহ বুঝতে চান, সন্তানের লেখাপড়ার ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেন। ফলে চতুর বিদেশী বিনিয়োগকারী

চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও কিছুদিন বাংলাদেশে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরেফিরে যা বোঝার বুঝে নেন এবং কিছুদিন পর নিজ দেশে ফিরে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। অথচ সরকারিভাবে বলা হয়, ১০০ শতাংশ সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (ডিএফআই) অথবা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) যৌথ বিনিয়োগ অথবা এই এলাকার বাইরের বিনিয়োগ; স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পাবলিক কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা তালিকাভুক্ত বিনিয়োগ, অবকাঠামোগত প্রকল্পে বিনিয়োগ যেমন ০ বিদ্যুৎ খাত, তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান, টেলিযোগাযোগ, বন্দর, সড়ক ও জনপথ; সরাসরি অথবা প্রত্যক্ষ ক্রয় অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা (বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের শেয়ার), বেসরকারি ইপিজেড বিনিয়োগ প্রভৃতি খাতে যেকোনো বিদেশী বিনিয়োগকারীর জন্য বাংলাদেশে উৎকৃষ্ট। আরও বলা হয়, সরকার ধাপে ধাপে শিল্প ও অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে নিজের সম্পূর্ণতা সরিয়ে বেসরকারি অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে।

অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ক্ষেত্রে সরকার দ্রুত সুনির্দিষ্ট সংস্কার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সবার জন্য উন্মুক্ত বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করছে, যেখানে সরকারের ভূমিকা অনুঘটকের, নিয়ন্ত্রকের নয়। নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধকে ন্যূনতম একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে; সরকার সুসম গতিতে বাণিজ্য ক্ষেত্রে উদারীকরণ করেছে; শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা, যৌক্তিক শুল্ক নির্ধারণ এবং রপ্তানি সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন সাধন করেছে; শিল্পহার কাঠামো ও আমদানি-নীতির বিভিন্ন দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারের এসব কথা সত্যি হলেও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বাস্তবতা ভিন্ন। সরকারি কাগজেকলমে অনেক কিছু থাকলেও বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের অনেক বাধা রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানিতে কর ও কোটা সুবিধা পাওয়ায় দেশে গার্মেন্ট খাতে অনেক বিদেশী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। কিন্তু দেশের গার্মেন্ট খাতের উদ্যোক্তারা এর তীব্র বিরোধী। তাদের দাবি, বিদেশীরা প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করুক। কারণ, দেশে মৌলিক ও বড় শিল্প স্থাপন করা জরুরি। এই উদ্যোক্তারা ভাবেন না, আধুনিককালে অর্থনৈতিক নীতির মূল ভিত্তিই হলো সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনে প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির ওপর আস্থা এবং বেসরকারি খাতের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দূর করা। তারা সস্তা শ্রমের দৌলতে অধিক আয়ের মানসিকতা ত্যাগ করতে চান না। করতে চান না প্রতিযোগিতা। বিদেশী উদ্যোক্তাদের বেলায় তারা মানতে চান না যে, অর্থনীতিতে টাকা বাড়ে তখন, যখন সে উৎপাদনশীল কোথাও বিনিয়োজিত হয়। কারণ, টাকা নিজে হাঁটতে পারে না, উড়তেও পারে না। অথচ টাকাকে উড়িয়ে নেওয়া যায়, যদি বিনিয়োগপ্রত্যাশী কেউ তাকে উড়িয়ে নিতে পারেন। যদি তার মূল্য দিতে পারেন। অদক্ষ শ্রমিক-অধ্যুষিত বাংলাদেশে প্রযুক্তির মতো দক্ষতানির্ভর খাতে বিনিয়োগ করতে বিদেশীদের বয়ে গেছে। আমলাদের দীর্ঘসূত্রতা আর অতিমূনাফালোভী বাংলাদেশী ব্যবসায়ী শ্রেণির এই মানসিকতাই বাংলাদেশ এফডিআই আকর্ষণের পথে মূল অন্তরায়। দুর্নীতিসহ আনুষঙ্গিক আরও সব বাধা এই দুই অন্তরায় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা সত্যি, সাদা চোখে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগে সবচেয়ে বড় বাধা দুর্নীতি। তারপরে রয়েছে যথাক্রমে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা দিতে আইনের দ্রুত প্রয়োগের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও মাত্রাতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ, দুর্বল অবকাঠামো ও গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট, জমির অভাব ও ক্রয়ে জটিলতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় অঙ্কের ঋণ জোগানে অক্ষমতা এবং স্থানীয়দের সঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যোগসূত্র ও সমন্বয়ের অভাব। এর বাইরেও রয়েছে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা।

বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হলে আগে দেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। দেশী বিনিয়োগকারীদের দেখে বিদেশীরা এগিয়ে আসবেন। তাদের মনে আস্থার সঞ্চার করতে হলে বাংলাদেশীদের স্বদেশে বিনিয়োগের উদাহরণ তুলে ধরতে হবে। অথচ ২০২২ সালের শুরুতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা এক প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের বিদেশে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দিয়েছে। অর্থনীতিবিদরা তখন বাংলাদেশী দেশীয় ব্র্যান্ডকে প্রমোট করতে উদ্যোগটিকে ভালো বললেও অর্থ পাচারের ঝুঁকির আশঙ্কার বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করেছিলেন। ওই সিদ্ধান্তের পর অর্থ পাচারের প্রবণতা আরও বেড়েছে। সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের অর্থ সঞ্চয় নিয়ে হইচই হওয়ায় এখন বাংলাদেশীরা সুইজারল্যান্ড বাদ দিয়ে অন্য নয়টি দেশে নিরাপদে টাকা পাচার করছে। যার মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, হংকং ও থাইল্যান্ড। এসব দেশে প্রতিবছর আমাদের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৩৬ শতাংশ অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে, যার পরিমাণ ৮০ হাজার কোটি টাকার কম নয়। অর্থপাচার প্রভাবশালীদের কাছে এখন মামুলি বিষয় মাত্র। সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও আমাদের মানসিকতা অসৎ। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে, সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভালো থাকতে হয়। কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার পাশাপাশি সরকারকেও স্বচ্ছ হতে হয়। অন্যথায়, অর্থ পাচারের গন্তব্য হিসেবে শেল কোম্পানিও প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশে সেটাই হয়েছে। এস আলম গ্রুপ সিঙ্গাপুরে কমপক্ষে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সরকারের কোনো অনুমতি ছাড়াই। অথচ এস আলম গ্রুপ চাইলে অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারীকে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দিতে পারত। কারণ, বিদেশী বিনিয়োগ উদ্যোক্তারা প্রথমেই বড় বাধায় পড়েন যোগাযোগের ক্ষেত্রে। সাধারণত যেকোনো দেশে বিদেশী বড় বিনিয়োগ আসে দেশী উদ্যোক্তার হাত ধরে। কিন্তু দেশের বিনিয়োগকারীরা যৌথ উদ্যোগে কারখানা করতে আগ্রহী নন। তারা একক মালিকানায় শিল্প স্থাপনেই বেশি আগ্রহী। ফলে বিনিয়োগ সম্মেলন, আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক হয়, সেখানে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তবে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের দাবিও অমূলক নয়। তাদের মতে, দেশে ব্যবসায় রয়েছে

নানা জটিলতা। কারখানা চালাতে স্থানীয় পর্যায়ে বড় অঙ্কের চাঁদা দিতে হয়, সরকারি অফিসের নানা ঘাটে চাঁদার চাহিদা মেটাতে হয়। ফলে খরচ বেড়ে যায়। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এ ধরনের উটকো ঝামেলার ঝুঁকি নিতে চান না। এ ছাড়াও দেশে বর্তমানে গ্যাস, বিদ্যুৎ-জ্বালানির সংকটও প্রকট। চড়া দাম দিয়েও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ মেলে না।

অবকাঠামোগত সমস্যা তো আছেই। এগুলোর মধ্যে বিদেশীদের ডেকে এনে বিপদে ফেলতে কার মন চায়! বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) থেকে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় ৫০ ধরনের সেবা দেওয়া হয়। এতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতা কিছুটা কমলেও মাঠপর্যায়ের সেবা পেতে দুর্নীতি থেকে শুরু করে নানা ঝামেলা পোহাতে হয়। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে সময় বলা হয়, প্রায় সব স্তরেই দুর্নীতি আছে বলে ব্যাপকভাবে অনুমান করা হয়, যা বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের দুর্বল প্রয়োগ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্বল অবকাঠামো ও বড় অঙ্কের ঋণ বিতরণের সক্ষমতার অভাবকে অন্যতম সমস্যা। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি সরবরাহের সংকটের কথাও বলা হয়েছে। কয়েক বছর আগে বিনিয়োগের জন্য ১৬টি বাধা চিহ্নিত করেছিল শিল্প মন্ত্রণালয়। সেসব বাধা দূর করতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তেমন কার্যকর ফল আসেনি। চিহ্নিত বাধাগুলোর মধ্যে ছিল কারখানা স্থাপনে পর্যাপ্ত জমির অভাব, বিদ্যুৎ ও গ্যাস প্রাপ্তিতে সমস্যা, দুর্বল অবকাঠামো, চাহিদা ও সময়মতো ঋণ না পাওয়া, কাঁচামালের সমস্যা, দক্ষ জনশক্তির অভাব, পণ্য বিপণনে সমস্যা, যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উদ্যোক্তার অভাব, অসম প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন সংস্থা থেকে ছাড়পত্র গ্রহণে জটিলতা, বিভিন্ন ধরনের কর সমস্যা, নীতির অস্পষ্টতা, চাহিদার তুলনায় গ্যাসের জোগান কম ইত্যাদি। আধুনিক বিশ্বে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান ১ শতাংশের কাছাকাছি। বাংলাদেশের এফডিআই যদি ৫-৬ শতাংশে উন্নীত করা যায়, তাহলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ১০ শতাংশ। এই পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের সামনে।

এর জন্য দেশী উদ্যোক্তাদের পুঁজি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কার্যকর সুযোগ করে দিতে হবে। প্রকৃত অর্থেই, বাংলাদেশে টেক্সটাইল, চামড়াজাত সামগ্রী, ইলেকট্রনিকস দ্রব্য, রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কাঁচা পাট, কাগজ, রেশম শিল্প, হিমায়িত খাদ্য (বিশেষত চিংড়ি), পর্যটন, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, সফটওয়্যার ও ডাটা প্রসেসিংয়ের মতো রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে সবার আগে দেশী-বিদেশী, সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে নানা সময়ে তুলে ধরা প্রতিবন্ধকসমূহ সরিয়ে ফেলতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে সরকারকে। সবার আগে দেশের শিল্পায়ন নীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত পাট শিল্প, বয়ন শিল্প, গ্যাস, তেল, কয়লা, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্য খাতের রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ আরও কিভাবে শক্তিশালী করা যায় অথবা কিভাবে তা শ্রমিকদের মালিকানাধীন সরকারি ব্যবস্থায় (যা সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে আছে) পরিচালনা করা যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দসহ সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রাখতে হবে। তা না-হলে প্রতিবছর ছিটেফোঁটা করে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এলেও, তা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টেকসই রূপ দিতে কোনোকালেই তেমন কাজে দেবে না। লেখক : ড. মো. আইনুল ইসলাম, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন : যেতে হবে বহুদূর

পৃথিবীব্যাপী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পিরামিডের ভিত্তিভূমিতে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে শিক্ষাকে একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথা নির্ধারিত হয়েছিল (অণুচ্ছেদ ১৭)। আইনত দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন বাধ্যতামূলক; সরকার বিনামূল্যে এ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে (বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০)। বহুল আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সর্বজনীন ও সবার জন্য একই মানের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যিকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জন এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলাকে প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করা। উপরন্তু বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘ এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে কাজ করছে যার ৪ নম্বর অর্ডিনেটে রয়েছে গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, যে কোনো পরিবেশ খাপ খাওয়ানো কৌশল আয়ত্ত করা। একই অর্ডিনেটে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ এর কথা বলা হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকার ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের মাধ্যমে যুগান্তকারী পদক্ষেপ রাখেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেন। এছাড়া দেশের বিদ্যালয়বিহীন এলাকার ১ হাজার ৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব্যবস্থা যেখানে ১৬ মিলিয়ন শিক্ষার্থী ও প্রায় ৪ লক্ষ শিক্ষক রয়েছেন। এ সকল সরকারি উদ্যোগের

ইতিবাচক প্রভাব পরেছে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে। বার্ষিক প্রাথমিক শিক্ষা জরিপ ২০২১ অনুসারে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৯% এবং ঝরে পড়ার হার ১৪.১৫ (যা ২০১০ সালে ছিল ৩৯.৮%)। তবে গুণগত শিক্ষা প্রদানে বাংলাদেশের অর্জন কতটুকু সে প্রশ্ন থেকেই যায়। জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০২২ পর্যালোচনা করলে প্রাথমিক শিক্ষায় মানের একটা হতাশাব্যাঞ্জক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

এ জরিপে এসেছে বাংলাদেশের ৫০% এর বেশি শিক্ষার্থী বাংলাই পড়তে পারেনা। ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা তার চাইতেও বেশি। দেখা যায় ৩য় শ্রেণির ৬০% ও পঞ্চম শ্রেণির ৭০% গণিতে কাঙ্ক্ষিত অর্জন করতে পারেনি। এসব অর্জনের আবার ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে ভিন্নতা হয়েছে। আছে স্কুলের ধরণভেদে ভিন্নতা। আবার একই বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থীর অর্জন সমান হয়। গুণগত মান বৈষম্যের কারণ মোটাদাগে চিহ্নিত করা যায় এভাবেঃ শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম, শিশুবান্ধব অবকাঠামোর অভাব, শিক্ষকদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও পেশাদারিত্বের অভাব, আনন্দহীন শিক্ষার পরিবেশ, বিদ্যালয়ে পাঠাগার ও হাতে-কলমে শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য ও অভিভাবকদের আন্তরিকতার অভাব ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বহুধারায় বিভক্ত। একই কারিকুলাম ও একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে ব্যক্ত হলেও এ ব্যাপারে অগ্রগতি সামান্যই। দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাইরে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫৩০০০। এসবের মধ্যে রয়েছে বেসরকারি স্কুল তথা কিন্ডারগার্টেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, এনজিও পরিচালিত স্কুল ইত্যাদি। এদের বেশির ভাগের অবস্থান শহর ও শহরতলিতে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এসব বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের উদ্যোক্তা। শহরের এমনকি গ্রামের স্বহল অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এসব বেসরকারি স্কুলে পাঠিয়ে থাকেন। তবে নিম্নবিত্তের মানুষের সন্তানের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই একান্ত গন্তব্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মিত হলেও দেখা যায় স্কুলে যাতায়তের সড়কটির বেহাল দশা থাকতে নতুন অবকাঠামোর পরিপূর্ণ উপকারিতা পাওয়া যাচ্ছেনা। উপকূলীয় এলাকা ও চরাঞ্চলে এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারেনা। ফলে তাদের লার্নিং লস হয়। চর এবং দুর্গম এলাকায় শিক্ষক ধরে রাখা আরেকটি সাধারণ সমস্যা। নিয়মিত শিক্ষকের পরিবর্তে প্রক্সি শিক্ষক ব্যবহারের বিষয়টি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিভিন্ন সময় উঠে এসেছে। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে শিক্ষক নিয়োগের সময় বিশেষ শর্ত ও নিয়োগের পরে ফলাফল ভিত্তিক বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে উত্তম চর্চা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত শিখন ফল অর্জনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় একটা বড় সংখ্যক বিদ্যালয়ের মাঠ নেই। অনেক বিদ্যালয়ের কাগজে কলমে মাঠ থাকলেও বাস্তবে তা বেদখল হয়ে আছে। অনেক ক্ষেত্রে মাঠ পুরো বর্ষা মৌসুমে খেলার অযোগ্য হয়ে থাকে। পাঠদানকে আনন্দময় না করতে পারলে কাঙ্ক্ষিত মান অধরা থেকে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাম্য অনুপাত এখনো অর্জন করা যায়নি। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ অনুপাত হওয়ার কথা ১:২০ যা বাংলাদেশে ১:৫৪। এ অনুপাত নিয়ে শ্রেণীকক্ষে তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে আলাদা যন্ত্র নেয়া কঠিন। নতুন করে নির্মিত ভবনসমূহের আকৃতি ও পরিমাপ একই রকমের (prototype)। এই ভবনগুলোতে গড়ে ০৫ টি শ্রেণি কক্ষ থাকে। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা মাথায় রেখে ক্লাসরুমের আকার নির্ধারণ করা হয়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ০২ শিফটে ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষকদের অধিক সংখ্যক ক্লাস নিতে হয় বিধায় তারা ক্লাসে কম মনোযোগ দিতে পারেন।

দারিদ্র্যতাকে শিক্ষণ ফল অর্জনে একটা বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আমিষ ও ক্যালরির চাহিদা পূরণ না হলে একজন শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। অপুষ্টি ও ক্ষুধার কারণে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারেনা। প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেনা। বাংলাদেশে ২০২২ পর্যন্ত নির্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু ছিল যা স্কুলে উপস্থিতি ও ঝড়ে পড়া রোধে সহায়ক বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। সরকার বর্তমানে সকল বিদ্যালয়ে মীড ডে মিল চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদানকে আনন্দময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা যায়। সরকার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও প্রোজেক্টর বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় শিক্ষকদের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারে অনাগ্রহ বিদ্যমান। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় বেশিরভাগ ডিজিটাল সরঞ্জাম অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। শিক্ষকদের সম্মান ও সুযোগের অভাবের কথা বিভিন্ন সময় আলোচিত হয়। শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা বাড়লে

মেধাবীরা এ খাতে আসতে আগ্রহী হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব দৃশ্যমান। অনেকে প্রশিক্ষণ পেলেও তা বিষয়ভিত্তিক নয়। যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রশোধনার এর মাধ্যমে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বাইরে প্রাইভেট টিউটরিং কে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

বেশিরভাগ স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি থাকলে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষণ অগ্রগতি মূল্যায়নে তাদের অংশগ্রহণ কম। এক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যেতে পারে। শিক্ষা কার্যক্রমে নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা আনতে স্থানীয় এনজিও, মিডিয়া ও শিক্ষা গবেষকদের যুক্ত করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিক্ষা উপকরণের বিষয়ে স্থানীয় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একসময় এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যোৎসাহী মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত ও পরিচালিত হতো। উপরন্তু সরকারি বরাদ্দের বাইরে প্রয়োজন মেটাতে স্থানীয় সরকারগুলো (উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন) পরিষদ এগিয়ে আসতে পারে।

প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের শিশুদের প্রতি আলাদা মনোযোগের কোন বিকল্প নেই। স্থানীয় উদ্যোগে তাদের জন্য বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছশ্রমের উপর ভিত্তি করে একটি রিসোর্স পুল গঠন করা যেতে পারে যারা পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে কাজ করবেন এবং শিক্ষণ ঘাটতি দূর করবেন। পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সহশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পরিসর বাড়তে হবে। উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে হাইজিন, স্যানিটেশন সহ বিভিন্ন লাইফ স্কিল শেখানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশুর জীবনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জ্ঞানার্জনের মূলভিত্তি তৈরি করে। সে কারণে, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুসংগঠিত করে প্রগতিশীল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট সমাজ বিনির্মাণে সব শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি।

ব্রিকস সম্মেলন ও বাংলাদেশের অবস্থান

২০০৬ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন- এই ৪টি দেশ নিয়ে ‘ব্রিক’ গঠিত হয়েছিল। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তির ফলে এটি ‘ব্রিকস’ নাম ধারণ করে। বিশ্ব জিডিপির ২৩ শতাংশ এবং বিশ্বের জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ এখন এ জোটের। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্যের ১৬ শতাংশের বেশি ব্রিকস প্রতিনিধিত্ব করে। এবারের ১৫তম শীর্ষ ব্রিকস সম্মেলন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের স্যান্ডটনের একটি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি বিষয়কে লক্ষ্য হিসেবে ধরে ব্রিকস এবারের সম্মেলন করেছে। একটি হচ্ছে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা; যা ছিল তাদের বড় এজেন্ডা। আরেকটি হচ্ছে উল্লানের বিপরীতে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড় করানো। নতুন করে তারা ৬টি দেশকে সদস্যপদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; যা ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। তবে বিকল্প মুদ্রা বিষয়ে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। কারণ অর্থনৈতিক কাঠামো এখনো পশ্চিমা দেশগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ব্রিকস সম্মেলনের সংবাদ বেশ গুরুত্বসহকারে প্রচার করেছিল। এর কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, একটা বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্রিকস এবং অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতিতে অবকাঠামো ও টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য সম্পদ সংস্থানে ২০১৫ সালে ব্রিকস তার নিজস্ব ঋণ সংস্থা ‘নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’ স্থাপন করেছিল। বাংলাদেশ ২০২১ সালে ওই ব্যাংকের সদস্যপদ লাভ করে।

এবারের সম্মেলনের স্লোগান ছিল- ‘ব্রিকস অ্যান্ড আফ্রিকান সলিডারিটি’। অর্থাৎ ব্রিকসের সঙ্গে আফ্রিকার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার বিষয় ছিল। সেই দিক বিবেচনায় আফ্রিকার দেশ মিসর ও ইথিওপিয়াকে সদস্য করা হয়েছে। আবার তেলসমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবকে সদস্য করা হয়েছে। তাছাড়া লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে ব্রাজিলের পর বিকল্প হিসেবে আর্জেন্টিনাকে সদস্য করেছে। অর্থাৎ নতুন সদস্যভুক্ত করার ক্ষেত্রে অর্থনীতির দিক, আঞ্চলিকতার বিষয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনায় ছিল। এটি ছিল বড় পরিসরে আয়োজিত প্রথম সম্মেলন, যেখানে প্রায় ৭০ জন বিশ্বেতা একত্রিত হয়েছিলেন। বিশ্বরাজনীতি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বসম্প্রদায়ের মোকাবিলা করা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব, বাণিজ্য, মুদ্রা পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা।

জি-৭ জোটে যে ৭টি শক্তিশালী পশ্চিমা দেশ আছে, এর বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো ব্রিকসের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। কিন্তু জি-৭ জোটকে চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থান ব্রিকস এখনো তৈরি করতে পারেনি। কারণ ব্রিকস জোটে যেসব দেশ আছে, সেগুলো বিশ্ববাণিজ্যে এখনো শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। বৈশ্বিক জিডিপির মাত্র ২৫ শতাংশ ব্রিকস জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর আর বাকি ৭৫ শতাংশ জি-৭ জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর। ১০০ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ ব্রিকস জোটের। বৈশ্বিক জিডিপিতে ভারতের অবদান প্রায় ৩ শতাংশ,

ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাত্র ২ শতাংশ করে এবং চীনের আছে ১৯ শতাংশ। একইভাবে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রাধান্য বেশি।

তবে এই সম্মেলনের ফলাফল নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা খুব বেশি আশাবাদী নয়। কারণ পশ্চিমা দেশগুলোর কাছেই এখনো ক্ষমতা রয়েছে। চীন এখনো খুব বেশি প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। তবে ব্রিকসকে এমন একটি সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়; যার ফলে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ব্রিকস সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। ব্রিকসে এতসংখ্যক দেশের যোগদানের মানে এই নয় যে, এই দেশগুলো চীনের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলবে এবং পশ্চিমাদের সঙ্গে সহযোগিতার দরজা বন্ধ করে দেবে। তাছাড়া ভূরাজনৈতিক কারণে ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং চীনের নেতৃত্বের কারণে চীন-ভারত বিভাজনটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নতুন করে এতে ভারত যুক্ত হওয়ায় দুই দেশের বিভাজনটা খুব বেশি চোখে পড়ছে। তবে ব্রিকস বর্তমানে উত্তর আমেরিকার আধিপত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির একটি নতুন বলয় হতে পারে। এটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে পারে। তবে এটা মানতেই হবে, এখানে আন্তঃব্রিকস রাজনীতি রয়েছে। অর্থাৎ চীন-রাশিয়া বোঝাপড়া বা ভারত-ব্রাজিলের অবস্থান এবং চীন-ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সমস্যা; যা ব্রিকসে চীনা প্রভাবকে বাস্তবায়িত হতে দেবে না। চীন ও ভারত যদি তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান বজায় রেখে কমন ইন্টারেস্টে তারা কাজ করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ আগস্ট ব্রিকসের 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক'-এর সদস্য হিসেবে ফ্রেন্ডস অব ব্রিকস লিডারস ডায়ালগে (ব্রিকস-আফ্রিকা আউটরিচ ও ব্রিকস প্লাস ডায়ালগ) বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। ব্রিকসকে বিশ্বের একটি বহুমুখী বাতিঘর হিসেবে দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত পছন্দ ও বিভাজনকে 'না' বলা উচিত। সর্বজনীন নিয়ম ও মূল্যবোধকে অস্ত্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে আমাদের। নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার চক্র বন্ধ করতে হবে আমাদের এবং সব প্রকার হুমকি, উসকানি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে এসে বিশ্বে জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। বিশ্বশান্তি, ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সবাইকে একসঙ্গে অবশ্যই আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও প্রযুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং জলবায়ু, ন্যায়বিচার, অভিবাসীদের অধিকার, ডিজিটাল ইকুইটি ও ঋণ স্থায়িত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ২৩ আগস্ট সম্মেলনের ফাঁকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলেন তিনি। আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার গুরুত্ব, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, চীনা ঋণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর জননেত্রী শেখ হাসিনা গুরুত্বারোপ করেন। চীনা প্রেসিডেন্ট চীন ও বাংলাদেশকে উচ্চমানের বেস্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া এবং তাদের অর্থনৈতিক পরিপূরকতায় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি, নতুন জালালি, কৃষিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

২৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিল, মোজাম্বিক, তানজানিয়া ও ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, বিশেষ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হয়; যা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহযোগিতা করবে। ২৩ আগস্ট বাংলাদেশ বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সভায় ভার্টুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকান ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। ওই দিন আফ্রিকার দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশ মিশনের প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ব্রিকসের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট দিলমা ভানা রুসেফের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্যও অনুরোধ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৩ সালের জুন মাসে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বৈঠকে যোগ দেয়ার ফাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সঙ্গে বৈঠকের সময় ব্রিকসে বাংলাদেশের যোগ দেয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ জুন বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিকস জোটে যোগদানের জন্য আবেদন করেন। তবে বাংলাদেশ এবারের সম্মেলনে সদস্যপদ লাভ করেনি।

ভারতের ব্রিকস সম্প্রসারণের বিষয়ে পিছপা হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে নতুন সদস্যপদ পাওয়া রাষ্ট্রগুলো যদি চীনের বলয়ভুক্ত হয়ে পড়ে। যারা সমতা বজায় রেখে বৈশ্বিক পর্যায়ে ও ব্রিকসের কাঠামোতে কাজ করতে সক্ষম, তাদেরই এবারের সম্মেলনে ব্রিকসের সদস্যভুক্ত করা হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রদান করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলোর জন্য সমতা প্রণয়ন করে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের যে প্রতিশ্রুতি ব্রিকস প্রদান করেছিল; তা অপূর্ণই রয়ে গেছে। এর জন্য অবশ্য ভারত ও ব্রাজিলই দায়ী। কারণ বৈশ্বিক পর্যায়ে এবং ব্রিকস ফোরামেও নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই মূলত দেশ দুটির এমন আচরণ। ব্রিকসের

সম্প্রসারণ হয়েছে অনেকটাই মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক। ব্রিকস এমন ৬টি দেশকে বেছে নিয়েছে, যেগুলো বাণিজ্যিক সংযোগ, জালালি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিরাপত্তা ও কৌশলগত সহযোগিতা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। ব্রিকসের প্রধান ৫ দেশের বর্ধমান অর্থনীতির জন্য এগুলো অপরিহার্য। তাছাড়া নতুন ৬ সদস্যের জন্য ব্রিকসের প্রধান ৫ সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্ভাবনাগুলো সম্পূরক ও সহায়ক হবে। ব্রিকসের সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত মূলত পারস্পরিক সম্পূরক স্বার্থ বিবেচনা করেই হয়েছে, এমন কথা আমরা বলতেই পারি। ড. মো. মোরশেদুল আলম : শিক্ষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জি-২০ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হোক

ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বহুল প্রত্যাশিত জি ২০ সম্মেলন। এই সম্মেলনকে ঘিরে জি ২০ সদস্যভুক্ত দেশসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহেরও আগ্রহ ও লক্ষণীয়। এর কারণ জি ২০ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের বহু পাক্ষিক বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার হচ্ছে অজীকার ব্যক্ত করা হয়। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী চলমান সন্ত্রাস, জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলায় পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় সম্মেলনে অংশ নেয়া জি ২০ সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য।

এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, “চেতনায় এক পৃথিবী এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ।” মূলত দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব নেতাদের অনেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের বৈঠকের “ এক বিশ্ব, এক পরিবার, ভিসা মুক্ত ” বিশ্ব গড়ার স্লোগান দিয়ে আসছিলো। এ কারণে পুরো বিশ্বের দৃষ্টি ও আগ্রহের কেন্দ্র এই সম্মেলন। গত ৮ অক্টোবর পুরো বিশ্বই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ প্রত্যক্ষ করলো। ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’ স্লোগানে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় ২ দিনের জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন।

দিল্লির ঐতিহাসিক প্রগতি ময়দানের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার ‘ভারত মন্ডপম’-এ এবারের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন জি-২০ এর সদস্যসহ বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশের শীর্ষ নেতা। আমাদের সৌভাগ্য সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্যও বিশ্ব নেতাদের দৃষ্টি কেড়েছে। অন্যদিকে কনভেনশন সেন্টারের সামনেই স্থাপন করা হয়েছে বিশাল এক নটরাজ মূর্তি। জি-২০ সম্মেলনে বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের স্বাগত জানাতে ২৮ ফুট লম্বা এ নটরাজ মূর্তি তৈরি করা হয়েছে।

জি-২০ এবারের সম্মেলন এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, করোনা মহামারির ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর পরই যখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট প্রবল হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ, বিভিন্ন মহামারিসহ ডিজিটাল ডিভাইসের কারণে সৃষ্ট বৈষম্যের পরিস্থিতিতে বিশ্বনেতারা কি বলেন সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছেন সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। সম্মেলনকে ঘিরে সদস্য ভুক্তদেশ ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহও আগ্রহ সহকারে অনেক আশায় বুক বেঁধেছে। কারণ জি ২০ দেশসমূহ তাদের নিজ নিজ দেশের অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ, পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠে অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার অজীকার এবং অর্থনৈতিক, বহু পাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, সামাজিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি কল্পে সংকল্প ব্যক্ত হয়।

সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লিতে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্য নেতারা। সম্মেলন চলাকালে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্মেলনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, অনৈক্য উপেক্ষা করে একতা বজায় থাকবে এমন একটি পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে ভারত বিভেদ, বাধা দূর করে সহযোগিতার বীজ বপনে বদ্ধপরিকর। তিনি লিখেন, এবারের সম্মেলনের মাধ্যমে ভারত শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছাবে আর বিশ্বের কেউই পেছনে পড়ে থাকবে না। এতে ভৌগোলিক সীমানা, ভাষা এবং মতাদর্শকে ছাড়িয়ে ভারত এবার জি-২০ সম্মেলনের মাধ্যমে মানবকেন্দ্রিক অগ্রগতির আহবান জানাবে বলে মোদি উল্লেখ করেন।

এই মূর্তিটিই বিশ্বের দীর্ঘতম ও গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই তৈরি করা হয় দীর্ঘতম নটরাজ মূর্তি। এছাড়াও অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবে এআই নির্মিত অবতারও। ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি’ নামের এক প্রদর্শনী চলে ভারত মন্ডপে। সেখানে ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়। একেবারে আদিম যুগ থেকে আধুনিক যুগ, সবটাই তুলে ধরা হবে ওই প্রদর্শনীতে।

জি-২০ এর সদস্যসহ বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশের শীর্ষ নেতা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি দেশ এবং ১৪টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানসহ বিশ্বের প্রায় ১৪০ দেশ জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেয়। জি-২০ এর সদস্য দেশের মধ্যে রয়েছে- আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, কোরিয়া, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, জার্মানির চ্যান্সেলর

ওলাফ স্কোলজ এবং ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মতো পরিচিত রাষ্ট্রনেতারা সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। অংশ নিয়েছেন আরও বেশ কয়েক জন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী। সম্মেলনে ভারত হয়ে ইউরোপে নতুন অর্থনৈতিক করিডোর গড়ার অঙ্গীকার করেন আয়োজক দেশ ভারত।

পর্যবেক্ষক দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জি-২০র সদস্য না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এই শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছে। জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ লোগো প্রকাশ করে ভারত। লোগোতে সাত পাপড়ির এক পদ্মফুলের ছবি রয়েছে। পদ্ম ভারতের জাতীয় ফুল, ভারতের আধ্যাত্মিক ধারণাতেও এই ফুলটি পবিত্র বলে স্বীকৃত। জি-২০ সভাপতিত্বের লোগোতে পদ্মের চিহ্নকে তাই ভারতের সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, সম্পদের প্রতীক বলেই জানিয়েছে ভারত। লোগো উন্মোচনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, পদ্মের সাতটি পাপড়ি পৃথিবীর সাতটি মহাদেশ এবং সংগীতের সাতটি সুরের প্রতিনিধিত্ব করছে। একইসঙ্গে লোগোতে রয়েছে গেরুয়া, সাদা, সবুজ ও নীল রংয়ের সংমিশ্রণ। জি-২০ সম্মেলন গোটা বিশ্বকে একত্রিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী সংহতি জোরদার করার ও বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। শীর্ষ সম্মেলনে তার চার দফা সুপারিশে এই আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলনে তিনি ‘ওয়ান আর্থ’ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় তার সুপারিশের প্রথম পয়েন্টে বলেছেন, ‘এখানে জি-২০ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ও বাংলাদেশ সংকট মোকাবিলায় কার্যকর সুপারিশ তৈরি করতে তাদের প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে। দ্বিতীয় পয়েন্টে তিনি বলেন, মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে এবং সারাবিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী সাহসী, দৃঢ় এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোকে তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত। তৃতীয়ত, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সদস্য হিসেবে জলবায়ুজনিত অভিবাসন মোকাবিলায় অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষতি এবং ক্ষয়ক্ষতি তহবিল চালু করার অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সব মানুষেরই উপযুক্ত জীবন-যাপনের সমান অধিকার থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক সম্প্রদায় ভুলবেন না এবং তাদের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রত্যাশা জি ২০ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেও সকল সদস্যভুক্ত দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে সার্থক হবে এ সম্মেলন। -লেখক: মোতাহার হোসেন, সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ব্রিকস ও বিশ্ব রাজনীতি

অলোক আচার্য: বিশ্ব সত্যিকার অর্থেই এক অস্থির সময় পার করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব রাজনীতির বহু হিসাব-নিকাশ বদলে দিয়েছে। বদলে দিয়েছে অর্থনীতি, সামরিক সক্ষমতার হিসাব। এই যুদ্ধ এখনো চলছে। যুদ্ধ যে মূলত দীর্ঘায়িত হতে যাচ্ছে সে অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে বৈশ্বিক রাজনীতিতে আরও পরিবর্তন ঘটবে। জোটের সম্প্রসারণ এবং নতুন জোটের সম্প্রসারণ হচ্ছে। আসতে পারে নতুন জোট। সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন জোট গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধের শুরু হওয়ার পর জোটের গুরুত্ব বেড়েছে। আবার জোটের গুরুত্ব যেমন প্রসারিত হয়েছে সেভাবেই সমমনা দেশগুলোও নিজেদের অস্তিত্ব, স্বার্থ এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ফলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে নিরাপদ করাতে একাধিক দেশ জোটবদ্ধ হচ্ছে বা হতে পারে। মাঝেমধ্যেই গণমাধ্যমে সেসব জোট গঠনের খবর আসছে। আবার কমতে পারে কোনো জোটের গুরুত্বও! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষায় বহু জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিকস নিয়ে বেশ জোরেশোরে আলোচনা হয়েছে। এর কারণ ব্রিকসের সম্প্রতি শেষ হওয়া সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা এবং আগ্রহ প্রকাশ। প্রথমত এই জোট সম্পর্কে একটু জানা দরকার। ব্রিকস হলো বিশ্বের পাঁচ উদীয়মান এবং সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশের একটি অর্থনৈতিক জোট। এই জোটের সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো ভারত, চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ইতিমধ্যেই পৃথিবী যে দুটি শক্তিশালী বলয়ে বিভক্ত হয়েছে তার একটি হলো চীন ও রাশিয়া। অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামরিক দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম অবস্থানে এবং সেই সাথে ভারতও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে তার কৌশলগত ভূমিকার কারণে। সমাপ্ত হওয়া ব্রিকসের সম্মেলনে নতুন করে আরও ছয়টি দেশ সদস্য হয়েছে। এটি এমন এক সময় যখন বৈশ্বিক ক্ষমতার কেন্দ্র দুইভাগে বিভক্ত হতে চলেছে। এখানে সদস্য রাষ্ট্র বৃদ্ধি করা এবং জোটকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা রয়েছে। ব্রিকসের এবারের যোগ হওয়া দেশগুলো অর্থনীতিতে শক্তিশালী। ইতিমধ্যেই ব্রিকসের এই সম্প্রসারণ ভবিষ্যৎ অর্থনীতির নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। কারণ যদি তারা নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একই মুদ্রা ব্যবহার করে তাহলে ডলারের ওপর থেকে চাপ কমবে।

এটি বিশ্বের অন্যতম একটি জোট হিসেবে প্রকাশিত হবে। এখন জোট গঠনের ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার সাথে সাথে নিরাপত্তা জোরদার করা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষা করা। বর্তমান বিশ্বে সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য দিক মিলিয়ে আমেরিকা বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মধ্যে এখনো এককভাবেই প্রভাবশালী বলে স্বীকার করতে হয়। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সামরিক খাতে নতুন নতুন অস্ত্র যোগ করা এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এখন প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের প্রবণতা এবং এই প্রবণতা থেকেই এক দেশ অন্য পরাশক্তিকে মোকাবিলায় জোটবদ্ধ অবস্থান গড়ে তুলছে। পশ্চিমা বিশ্ব বনাম চীন-রাশিয়ার যে প্রতিযোগিতা সেখানে জোট একটি প্রধানতম বিষয়।

ব্রিকসের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যদি পশ্চিমা বিশ্বের বিপক্ষে দাঁড় করানো যায় তাহলে সেটি একটি শক্ত অবস্থান হবে। কিন্তু এখানে অন্যান্য অনেক দেশেরই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এবং রাশিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ভারসাম্য নীতি মেনে চলছে। কিছুটা কম বা বেশি হলেও সম্পর্ক দুই দেশের সাথেই ভালো। ফলে এক্ষেত্রে কতটুকু শক্তিশালী করা যাবে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ সফল হতে পারে যদি পরিকল্পনাগুলো কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে দেশগুলো। কারণ বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা ব্রিকসের দেশগুলোতে বসবাস করে। বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশও আসে ব্রিকসের দেশগুলো থেকে। এখন যেহেতু ব্রিকসে আরও অনেক দেশ যোগ দিতে আগ্রহী তাহলে সেটা ব্রিকসের সম্প্রসারণের সাথে সাথে কিছুটা হলেও পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য চিন্তার।

২০১৯ সালের পর এবারই প্রথম সশরীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদস্য বাড়তে চীন ও রাশিয়ার মনোভাবও ইতিবাচক ছিল। এর অর্থ হলো এখন এই জোটকে আরও প্রসারিত করতে চায় তারা। আবার বিভিন্ন দেশের আগ্রহও ছিল চোখে পড়ার মতো। এবারের ১৫তম ব্রিকস সম্মেলনে ৪০টি দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছিল এবং এর মধ্যে ২০টিরও বেশি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করেছিল। এর একটি অন্যতম কারণ হতে পারে অর্থনীতির চাপ সামাল দিতে অর্থনৈতিক শক্তিশালী এই জোটের সাথে থেকে একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা। যতদূর মনে হয়, ব্রিকসের দেশগুলো ভবিষ্যতে অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিবে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থনৈতিক সমীক্ষায়। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলে আসছে রাশিয়া ও চীনের। দুই মূলত বিশ্বে আধিপত্য ধরে রাখার এবং বিস্তার করার। সম্প্রসারিত হচ্ছে জোটগুলো। স্বাক্ষরিত হচ্ছে চুক্তি। বিশ্ব রাজনীতি এখন নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশ্ব আগের চেয়ে আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থানে যাচ্ছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কৌশলগত অবস্থানে থেকে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রত্যায়ন জোট গঠিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে ব্রিকসের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং দেশগুলোর সহাবস্থান ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক, চিকিৎসাসহ অন্যান্য মৌলিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে উঠবে। -লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট মো. মহিউদ্দিন আল হেলাল

শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণরা কেন দেশ ছেড়ে যাচ্ছে

দেশের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকের মধ্যে এমন প্রবণতা দেশ ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ালেও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না করা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক সুরক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ ছাড়ার প্রবণতা বাড়ছে। এসব শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গেলেও পরবর্তী সময়ে সেখানেই স্থায়ী হচ্ছে। ফলে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার জন্য কতশিক্ষার্থী দেশ ছাড়ে, এমন পরিসংখ্যান প্রকাশ করে ইউনেস্কো। ২০২২ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, অন্তত ৪৯ হাজার ১৫১ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ৫৮টি দেশে পড়াশোনার জন্য গিয়েছে। ২০২১ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৪৪ হাজার ২৪৪ জন, ২০২০ সালে ৫০ হাজার ৭৮, ২০১৯ সালে ৫৭ হাজার ৯২০ এবং ২০১৮ সালে ৬২ হাজার ১৯১ জন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। এদের সিংহভাগই বিদেশে থেকে যায়। শিক্ষিত তরুণদের দেশ ছাড়ার প্রবণতা অনেক আগে থেকে থাকলেও বিগত এক দশকে তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে এক দশক আগে দৈনিক ইনকিলাবের একটি জরিপের কথা উল্লেখ করা যায়। ২০১৪ সালে দৈনিক ইনকিলাব শিক্ষিত তরুণদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে তিনটি জরিপ প্রকাশ করেছিল। ২০১৪ সালের ২১ মে ‘অনিশ্চয়তায় দেশবিমুখ এক-তৃতীয়াংশ তরুণ’ শিরোনামে ২৩ মে ‘রাজনীতি বিমুখ তরুণ সমাজ’ এবং ১ জুন ‘দেশ ও অর্থনীতি নিয়ে হাতাশা’ শিরোনামে জরিপ প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের সর্বত্র অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, অতিমাত্রায় অপরাধ প্রবণতা, অপরিাপ্ত কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, নিরাপত্তার ঘাটতিসহ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা থেকে তরুণরা দেশ ছাড়তে চায়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উৎপাদনমুখী ব্যবস্থার অভাব এবং মেধাবীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করায় তারা দেশবিমুখ হচ্ছে। এক দশক আগে করা ইনকিলাবের এ জরিপের কোনো হেরফের হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। বরং রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, দুঃশাসন, মানবাধিকার লংঘন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের অভাবসহ সার্বিক অনিরাপত্তা আরও বেড়েছে।

দুই.

দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির অগ্রদূত তরুণ সমাজ। তাদের হাতেই দেশের ভবিষ্যত। আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক তরুণ রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই এত তরুণ নেই। ইউরোপের দেশগুলোতে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ এখন তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী তরুণদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের দেশের সম্পদে পরিণত করছে। এমনকি রাজনীতিতেও তাদের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকেই আবার আমাদের দেশে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছে। আফসোস হয় এই ভেবে, যখন তারা বাংলাদেশের জন্য নয়, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং বাংলাদেশের রাজনীতি কি হবে, কেমন হওয়া উচিত এই পরামর্শ দিতে আসে। অথচ আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে তাদেরই অবদান রাখার কথা। যে তরুণরা আজ রাজনীতির প্রতি বিমুখ ও বিরক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে বা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, দেখা যাবে পাঁচ বছর পর হয়তো এই তাদেরই কেউ কেউ অন্য দেশের প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট মিটাতে দুতিয়ালির ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। তখন তাদের দেখে ভাল লাগা ও গর্ব করার এক মিশ্র অনুভূতি প্রকাশ করা ছাড়া কিছু করার থাকবে না। আমরা যতই নিজের দেশের সন্তান বলে গর্ববোধ করি না কেন, তারা সেই দেশের স্বার্থের বাইরে একচুলও যাবে না। ট্র্যাজেডি হচ্ছে, দেশের নেতিবাচক রাজনীতির শিকার হয়ে মেধাবী তরুণদের অনেকেই উন্নত জীবনের সন্ধান দেশ ছাড়ছে। যারা ছাড়তে চায় না বা পারে না, তাদেরকে প্রতিনিয়ত হতাশা ও জানমালের অনিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে বসবাস করতে হয়। যে তরুণ রাজনীতি বিশেষ করে বিরোধীদের রাজনীতির সাথে জড়িত তাকে হামলা-মামলা এমনকি গুম-খুনের শিকার হতে হয়। বলাবাহুল্য, এই পরিস্থিতির জন্য তরুণ সমাজ স্পষ্টভাবেই দায়ী করছে দেশের প্রচলিত রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের। ইনকিলাবের জরিপে দেখানো হয়েছিল, শতকরা ৬০.৫ ভাগ তরুণ মনে করে, দেশের বর্তমান অবস্থা ও সব ব্যর্থতার জন্য রাজনীতি ও রাজনীতিবিদরাই দায়ী। তারা মনে করে, রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের ছত্রছায়াতেই সন্ত্রাস, হত্যা, গুম-খুন ইত্যাদি হয়ে থাকে। রাজনীতিবিদদের মধ্যেই দুর্নীতিবাজের সংখ্যা বেশি। অপরাধ করার পর সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে রাজনীতিবিদরাই কাজ করে। ৪৩ শতাংশ মনে করে, বর্তমান রাজনীতি দুর্নীতিগ্রস্ত, সঙ্কটময় ও অস্থিতিশীল। এটি আর রাজনীতিকদের কাছে নেই। চলে গেছে ব্যবসায়ী, স্বার্থেষ্ট্রী ও বিত্তবানদের হাতে। রাজনীতিতে পরস্পরের প্রতি কোনো আন্তরিকতা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নেই। অর্থাৎ যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে সে দল স্বার্থবাদীতার রাজনীতি এবং তাদের অনেক নেতা-কর্মী ‘জোর যার মুল্লুক তার’ যুগের সূচনা করে। দেশের বর্তমান রাজনীতি ও রাজনীতিকদের আচরণ ও কথাবার্তার ধরণ কি, তা বিভিন্ন টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার খবর থেকে জনসাধারণ দেখে ও বোঝে। জনসাধারণের এই দেখা ও বোঝার বিষয়টি বর্তমান রাজনীতিবিদরা আমলে যে নিচ্ছে না, তা তাদের আচরণ থেকেই বোঝা যায়। দুঃখের বিষয়, কিছু দলকানা বুদ্ধিজীবী তাদের বোধ-বিবেচনা দলীয় রাজনীতির মোড়কে আবদ্ধ রেখে রাজনীতিবিদদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে ডিফেন্ড করতে দেখা যায়। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তবে রাজনীতির এই নেতিবাচক ধারার পরিবর্তন কোনদিনই হবে না। শিক্ষিত তরুণ সমাজকে রাজনীতিতে যুক্ত করা এবং তাদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার পলায়নপর মনোবৃত্তি থেকেও ফেরানো যাবে না।

তিন.

বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষিত তরুণদের অনেকে মনে করে, দেশের বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ স্বার্থপর। তারা কেবল ব্যক্তি ও দলের স্বার্থে কাজ করে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে কেউ রাজনীতি করে না। তারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করে। অনেকে মনে করে, ‘মাফিয়াতন্ত্রের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে রাজনীতি। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় ঘটে চলেছে সব ধরনের অপরাধ। খুন-খারাবি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে সংঘাত-সংঘর্ষ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক নেতারা। আধিপত্য সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে একেক স্থানে একেকজন নেতা অপরাধের নেপথ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। খুনি, দুর্বৃত্ত, সন্ত্রাসীরা অপরাধ করে রাজনৈতিক ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে বহাল তবিয়তে থাকে। রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট এসব পেশাদার অপরাধীর কাছে প্রশাসনও অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়ে। দেশে যত ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস হয়, তার নেপথ্যে রাজনীতি ও রাজনীতিকদের কোন না কোন স্বার্থ এবং সংশ্লিষ্টতা থাকে। প্রতিকারহীন এ পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের হতাশা ও অসহায় হওয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে! অথচ শিক্ষিত তরুণ সমাজ থেকে শুরু করে একজন অতি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, একজন রাজনীতিবিদ হবে আদর্শবান এবং কখনই নিজস্বার্থে বা দলের হয়ে কাজ করবে না। তার কথা ও কাজে মিল থাকবে। দেশ ও জনগণের কল্যাণে আত্মনিবেদিত হবে। হবে, জনসাধারণের কাছে সম্মানিত ও নির্ভরশীল ব্যক্তি। দেশের যে খাতেই সম্ভাবনা রয়েছে, নিবেদিত প্রাণ হয়ে তা কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নেবে। বলাবাহুল্য, বর্তমানে যে রাজনৈতিক ধারা, তাতে সাধারণ মানুষের এ চাওয়া পূরণ হবার নয়। রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার জন্য, তাদের সামনে কোন স্বপ্নদ্রষ্টা নেই। অনুপ্রাণিত ও অনুরণিত হওয়ার মতো রাজনীতি ও রাজনীতিবিদ নেই বললেই চলে। শত ভাগ-তিতিক্ষা ও নিখাতন সয়ে জনগণের সামনে হাজির হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন মেন্ডেলা বলেছিলেন, ‘আই স্ট্যান্ড হিয়ার বিফোর ইউ নট অ্যাজ আ প্রফেট, বাট অ্যাজ আ হাম্বল সার্ভেন্ট অফ ইউ, দ্য পিপল। ইউর টায়ারলেস অ্যান্ড হিরোয়িক সেক্রিফাইসেস হ্যাভ মেড ইউ পসিবল ফর মি টু বি হিয়ার টুডে। আই দেয়ারফোর, প্লেস দ্য রিমেইনিং ইয়ারস অফ মাই লাইফ ইন ইউর হ্যান্ডস।’ এমন রাজনীতিক আমাদের দেশে কল্পনাও করা যায় না। নেতার জন্য সাধারণ মানুষের সংগ্রাম করা দূরে থাক, উল্টো নেতাদের দ্বারা নিগৃহীত ও প্রাণ সংহারের আতংকে তাদের দিন কাটাতে হয়। এমনকি মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান

ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মতো জাতীয় নেতাদের আদর্শ ও দর্শন নিয়ে যেসব দল গড়ে উঠেছে, সেগুলোর মধ্যেও এখন আর তাদের আদর্শ ও দর্শন ধারণ এবং চর্চা করার প্রবণতা নেই। ‘আমি এবং আমরা’র মধ্যে রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ করে যা খুশি তাই করার প্রবণতা বিদ্যমান। এই ধারার রাজনীতি এ প্রজন্মের শিক্ষিত ও সচেতন তরুণদের কেন আকর্ষণ করবে? ফিলিপিনের সাবেক প্রেসিডেন্ট জোসেফ এস্ট্রাদা ১৯৯৮ সালে যখন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন, তখন তিনি একটি কথা জনসাধারণের সামনে বার বার বলেছিলেন, ‘আই উইল নট ফেইল ইউ। আই উইল ডাই ওয়ার্কিং টু ব্রিং ব্যাক দ্য গ্লোরি অ্যান্ড প্রাইড টু ফিলিপিনস।’ তার এই কথায় জনসাধারণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে নির্বাচিত করেছিল। তবে ৩ বছরের মাথায় ২০০১ সালে সেই জনসাধারণই তার দুর্নীতি, স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ এবং নারী ঘটিত কেলেঙ্কারীর কারণে গণআন্দোলনের মাধ্যমে বিদায় করে দেয়। আদালতে ছয় বছর বিচার কার্যক্রম চলার পর তার ৩০ বছরের কারাদ- হয়। পরবর্তীতে ফিলিপিনের প্রেসিডেন্ট এস্ট্রাদারই এক সময়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া আরোয়া তাকে ক্ষমা করে মুক্তি দেন। ২০১৩ মালে এস্ট্রাদা একই শ্লোগান দিয়ে রাজধানী ম্যানিলার গোরব ও গর্ব ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। ৭৬ বছরের এস্ট্রাদা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং ম্যানিলাবাসীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য নিজেই রাস্তায় নেমে পড়েন। প্রতিদিন ভোরে রাস্তায় বের হয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যানজট নিরসনে সুশৃঙ্খলভাবে গাড়ি চলাচলের জন্য ট্র্যাফিক পুলিশকে সহায়তা করেন। এক সময় যে এস্ট্রাদা দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তা এড়িয়ে নিজেই শুধরে জনতার কাতারে शामिल হয়েছিলেন। ম্যান্ডেলাকে আদর্শ মেনে জনসেবা করেছেন। ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, রাজনীতিতে ভুল-ত্রান্তি হতেই পারে। তবে সেই ভুল শুধরে এবং শিক্ষা নিয়ে আবার জনগণের সেবায়ও আত্মনিবেদন করা যায়।

চার.

আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই এমন যে, ভুল স্বীকার দূরের কথা, রাজনীতিকরা বিশেষ করে ক্ষমতায় যারা থাকে তারা যেন সকল ভুলের উর্ধ্বে। তারা যা খুশি তা করতে পারে। এর ফলে যা হচ্ছে, রাজনীতি জনসেবার পরিবর্তে আত্মসেবায় পরিণত হয়েছে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ অতল গল্পের হারিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের রাজনীতির প্রতি মেধাবী তরুণদের আগ্রহ থাকবে কেন? শুধু তরুণ মেধাবী শ্রেণীই নয়, অতি সাধারণ মানুষও এ ধরনের রাজনীতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। তারা ভাল করেই জানে, দেশের রাজনীতি স্বার্থবাদিতার মধ্য দিয়ে চলছে। এখানে ক্ষমতায় থাকার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হয়, জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করা হয় না। জনসাধারণের ভাল-মন্দ বা মতামতের উপর নির্ভর করছে না। বরং তাদের ভাল-মন্দ ও মতামত জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। গণতন্ত্র নয়, দলতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র প্রাধান্য পাচ্ছে। যে রাজনীতিতে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে না, সে রাজনীতি দেশকে এগিয়ে নিতে পারে না। রাজনীতিতে ‘শেষ বলে কথা নেই’ এ ধরনের ধোঁকাবাজি, নীতিহীন ও স্বার্থবাদীতার কথা যারা বলে, মূলত তারা ই সুস্থ রাজনীতি ধ্বংস করে দিচ্ছে। তরুণ মেধাবী শ্রেণী তাদের এই কুটকথা বোঝে বলেই, তারা রাজনীতি বিমুখ এবং অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে। এটা কোনভাবেই দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। দেশের মেধাবীরা দেশ ছেড়ে যাবে, দেশের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে, উন্নত জীবনের খোঁজে বিদেশ চলে যাবে, এ প্রবণতা এখন বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেশ মেধাশূন্যতার কবলে পড়ছে। যে মেধাবী শ্রেণী দেশের নেতৃত্ব এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে, তারা বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। একটি দেশের জন্য এটি অত্যন্ত হতাশার এবং মেধার অভাবে অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাওয়ার শামিল। এ পরিস্থিতির অবসান হওয়া জরুরি। শিক্ষিত তরুণদের নার্ভ ক্ষমতাসীন এবং বিরোধীদলগুলোর উপলব্ধি করা অপরিহার্য। দেশের ভবিষ্যত যাদের উপর নির্ভরশীল এবং যারা সত্যিকার অর্থে দেশকে এগিয়ে নেয়ার সক্ষমতা রাখে, সেই শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণদের দেশের সম্পদ ভেবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তা নাহলে, দেশে সুস্থ রাজনীতি, সুশাসন, সমাজনীতি এবং গণতন্ত্র যেমন ভিত্তি লাভ করবে না, তেমনি টেকসই উন্নয়নও হবে না। কামরুল হাসান দর্পণ

মুদ্রাস্ফীতির কষ্ট লাঘব করতে হবে

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে ভোক্তাদের জীবন ওষ্ঠাগত। বাজারে চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, রান্নার গ্যাস, পঁয়াজ, শাকসবজি থেকে শুরু করে এমন কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নেই, যার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে না। দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণহীন ও লাগামহীন উর্ধ্বগতি জনজীবনকে সত্যিই অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নিম্নআয়ের মানুষ যা আয় করছে, তার পুরোটাই জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষায় ইত্যাদির জন্য ব্যয় করার মতো অর্থ তাদের হাতে থাকছে না।

অর্থনীতিবিদরা মুদ্রাস্ফীতিকে অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে গণ্য করেন। কারণ, মুদ্রাস্ফীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের কষ্ট বাড়িয়ে দেয় এবং জীবনমানকে দুর্বিষহ করে তোলে। মানুষ একসময় হতাশায় নিমজ্জিত হয় এবং সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে যায়। নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অস্থিরতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পঁয়াজ, আলু, ডিমের মূল্যবৃদ্ধি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত মাসিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.০২ শতাংশ, যা অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় উল্লিখিত ৫.৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমিত ৭.৫ শতাংশ উভয়কেই ছাড়িয়ে গেছে। জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৩-এর জন্য মুদ্রানীতির বিবৃতি মতে, ২০২২ অর্থবছরে গড় মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৬.১৫

শতাংশ। উদ্বেগজনকভাবে সর্বশেষ বিবিএস এর তথ্য বলছে, আগস্ট ২০২৩ সালে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯২ শতাংশ যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২.৫৪ শতাংশের মতো উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে খাদ্যে ২০১১ সালের অক্টোবরে ১২.৮২ শতাংশ মূল্যস্ফীতি ছিল। গ্রামীণ এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেশি বেড়েছে, সেখানে এর পরিমাণ ১২.৭১ শতাংশ, যা গত জুলাইয়ে ছিল ৯.৮২ শতাংশ। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৪০ শতাংশ। এমন এক সময়ে এই মূল্যস্ফীতি যখন আশেপাশের দেশ ভারত-পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বে এটি কমে আসছে।

দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা চরম মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির কারণে ২০২২ সালে দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে গিয়েছিল। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ৭৩.৭ শতাংশ রেকর্ড করা হয়। আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় জ্বালানি সংকট দেখা দেয়। তখন দেশটি লাগামহীন লোডশেডিং দেখেছে এবং গাড়িতে জ্বালানি নিতে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কার ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৪.৬ শতাংশে নেমেছে। দেশটির পরিসংখ্যান বিভাগ বলছে, মাত্র এক মাসের ব্যবধানে দেশটির খাদ্যপণ্যের দাম বহুলাংশে কমেছে। ন্যাশনাল কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সে বিস্তৃত পরিসরে খুচরা মূল্যস্ফীতি তুলে ধরা হয় এবং প্রতি মাসে ২১ দিনের ব্যবধানে এই সূচক প্রকাশ করা হয়। জুন মাসে শ্রীলঙ্কার ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৮ শতাংশ এবং জুলাইয়ে তা কমে হয়েছে ৪.৬ শতাংশ। শ্রীলঙ্কার আদমশুমারি ও পরিসংখ্যান বিভাগ বলছে, জুনে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ২.৫ শতাংশ বেড়েছিল এবং জুলাইয়ে তা ২.৫ শতাংশ কমেছে। খাদ্যবহির্ভূত পণ্যগুলোর দাম জুলাই মাসে ১০.৯ শতাংশ বেড়েছে এবং আগের মাসে এটি ১৮.৩ শতাংশ বেড়েছিল। জুন থেকে শ্রীলঙ্কার মুদ্রাস্ফীতি আগের মাসগুলোর তুলনায় দ্রুত কমেতে শুরু করেছে। এর পাশাপাশি দেশটির মুদ্রা রুপিও শক্তিশালী হয়েছে। এর ফলে দেশটির জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং আমদানিকৃত খাদ্যের ব্যয় কমেছে।

আমাদের দেশে আয় আটকে আছে অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগাতার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ একটাই, তা হচ্ছে, বাজারের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। নেই বাজার মনিটরিং, তদারকি এবং সে অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সব থেকে বেশি কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়ে নিঋত্তি, অবসরপ্রাপ্ত সং সরকারি কর্মচারী, প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও নিঋত্তি আয়ের প্রান্তিক মানুষ। অধিকাংশ প্রবীণ সবচেয়ে বেশি কষ্টকর পরিস্থিতিতে রয়েছে। যেসব চাকরিজীবী সংভাবে চাকরিজীবন কাটিয়েছে, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ, চাকরি জীবনের তাদের সঞ্চয় পেনশন বা গ্র্যাচুইটির টাকাই একমাত্র সম্বল। জীবনের শেষ সম্বল এ সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে তারা সঞ্চয়পত্র কিনেছে। এ সঞ্চয়পত্রের মুনাফার টাকা দিয়ে তাদের সংসার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে নির্বাহ করতে হয়। যেন নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা কিংবা মরার উপর খরার ঘা!

আসলে সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে একদম নির্বিকার। ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে বিভিন্ন অজুহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলছে। একবার যে পণ্যের দাম বাড়ে, তা আর কমে না। সরকারি বিভিন্ন সংস্থা এ ব্যাপারে কাজ করলেও তা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে তেমন সফল দিচ্ছে না। বর্তমানে চাল, তেল, পৈয়াজ, শাকসবজি ইত্যাদির দাম বেড়েই চলছে। প্রতিটি পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণ হিসাবে ব্যবসায়ীরা এক একটি অজুহাত দাঁড় করায় এবং সরকারও তাদের সাথে সুর মেলায়। অথচ কিছু পণ্য আছে সরবরাহে ঘাটতি না থাকার পরও দাম বেড়ে যায়। তাছাড়া, অতিরিক্ত টাকা দিলে এমন কোনো পণ্য নেই, যা পাওয়া যায় না অর্থাৎ আড়াল থেকে কলক্যাঠি নাড়াচ্ছে একদল দুর্বৃত্ত। আর এর মাশুল গুনছে সাধারণ মানুষ। নিত্যদিন তাদের পকেট কাটছে, কিন্তু দেখার কেউ নেই, ভোক্তারা নির্বিকার ও চরম অসহায়।

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদন খরচ, পরিবহন-ভাড়া, চিকিৎসা ও শিক্ষা খাতের ব্যয়। সরকারি-বেসরকারি সেবার দামও বাড়াচ্ছে। যে হারে দ্রব্যমূল্য বাড়াচ্ছে সে হারে মানুষের আয় বাড়াচ্ছে না। দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে জীবনযাত্রার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একটি পরিবার কীভাবে দৈনন্দিন জীবনকে নির্বাহ করবে তা নির্ভর করে তাদের আয়, চাহিদা এবং দ্রব্যমূল্যের ওপর। প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্যের মূল্য যখন সহনীয় পর্যায়ে এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে, তখন তাদের জীবন কাটে স্বস্তিতে। অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য যখন সাধারণ মানুষের আর্থিক সংগতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়, তখন দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র পরিবারে শুরু হয় অশান্তি। তাই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে একদিকে জনজীবনে নেমে আসে কষ্টের কালো ছায়া, অন্যদিকে মুনাফাখোর, কালোবাজারীদের কারণে দেশে বিরাজ করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে ন্যায়সংগত মূল্যে কোনো পণ্যই আর পাওয়া যায় না। সরকারের ভুল অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনা সংকটকে প্রকট করেছে। পুরো অর্থনীতিতে এখনো ডলার সংকটের মারাত্মক প্রভাব। এর ফলে সরকারের লেনদেনে দেখা দিয়েছে রেকর্ড ঘাটতি, কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, ঋণ পরিশোধের খরচ বেড়েছে, দেখা দিয়েছে জ্বালানিসংকট, অসহনীয় হয়ে উঠেছে মূল্যস্ফীতির চাপ। গোটা অর্থনীতিতে টাকার মান কৃত্রিমভাবে ধরে রাখার খেসারত দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিনিময় হার বহু বছর ধরে রেখেছিল। ফলে যে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা দেশে উচ্চ প্রবৃদ্ধি দিয়েছে, তাও হমকির মুখে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এখন

সরকারের অগ্রাধিকার হতে হবে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু তা না করে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর নীতিতেই আগ্রহ বেশি সরকারের। এতে সংকট আরও বাড়ছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপে পিষ্ট হচ্ছে ভোক্তা সাধারণ। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করতে হলে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। মজুতদারি রোধ করতে পারলে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে না। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় কৃষির উৎপাদন বাড়তে এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি জমি থেকে সর্বোত্তম ফসল লাভের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, প্রচুর সার ও সেচ ব্যবস্থার সমন্বয় করতে হবে। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়লে দাম এমনিতেই স্থিতিশীল থাকবে। বাজারের উপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে লাগামহীন দুর্নীতির অবসান ঘটতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দেশের সকল মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। লেখক: ব্যাংকার ও কলামস্টি মো. জিল্লুর রহমান

জলবায়ু, এডিস মশা-ডেঙ্গু ভাইরাস নেত্রাস

বাংলাদেশে চলতি বছরের নয় মাসেই ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা গত ২২ বছরের মোট সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পুরো দেশ আতঙ্কে দিশাহারা। সবার একটাই কথা, কেন এমন ভয়ানক পরিস্থিতি। কেন বাগে আনা যাচ্ছে না ডেঙ্গুর এমন ভয়াল খাবাকে। এই ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে হলে অবশ্যই নজর দিতে হবে আমাদের ডেমোগ্রাফিক অবস্থান, জলবায়ু, জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক অবস্থান, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, এনথ্রোপোজেনিক বা মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য দৈনন্দিন জীবনযাপনের কার্যক্রম। কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভেক্টর বাহিত রোগের জন্য মূলত তিনটি বিষয়কে নির্দেশ করেছে। তা হলো—

১. বাহক ও পোষকের প্রাচুর্য

২. রোগ সৃষ্টিকারী এজেন্ট বা প্যাথজেনের স্থানীয়ভাবে ঘনত্ব

৩. মানুষের আচরণ ও রোগ সহনশীলতা

বিষয়গুলো অবশ্যই স্থানীয় ও বৈশ্বিক জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। এডিস মশার প্রাচুর্য জলবায়ুর সব উপাদানের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে প্রথমে আনা যায় তাপমাত্রার কথা। অন্যান্য উন্নত প্রাণীতে যেমন থার্মোরегুলেশনের মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যেকোনো ঋতুতে প্রাণী তার সাবলীল জীবনযাপন করতে পারে। ক্ষুদ্র পতঙ্গ মশার শরীরে এমনটি না হওয়ার কারণে তারা পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তাদের স্বাভাবিক বংশবিস্তার ও জীবনপ্রবাহ চালানোর জন্য ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রাকে একটি আইডিয়াল রেঞ্জ হিসেবে ধরা হয়। ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে থ্রেস হোল্ড লেভেল ধরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এডিস মশার মেটাবলিক কার্যক্রম সফল ও দ্রুততার সঙ্গে হতে থাকে। ফলে তাদের মিলিত হওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি যেমন বেড়ে যায় তেমনি স্বাভাবিকভাবে একক মশার ডিম পাড়ার ক্লাস্টারের সংখ্যাও বেড়ে যায়। শুধু তা-ই নয় ডিম ফুটে লার্ভা বের হওয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। এবং লার্ভা থেকে সফলভাবে পিউপায় পরিণত হয় এবং পিউপা নীরোগ থাকে বলে সাবলীলভাবে পুনরায় এডিস মশার জন্ম নিশ্চিত হয়। তাহলে এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনায়ন ধ্বংস ও দ্রুত অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ ও আধুনিক জীবনযাপনের জন্য ব্যবহৃত এসি, ফ্রিজ প্রভৃতি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মশা বিস্তারে কতটা ভূমিকা রাখছে। তাই তো বলা হয়, বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যেমন পৃথিবীকে জ্বরে আক্রান্ত করে, ঠিক তেমনি সেই উষ্ণতা মশার ঘনত্ব বাড়িয়ে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়িয়ে পৃথিবীতে বসবাসরত মানুষের শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলে জরাগ্রস্ত করে এবং মৃত্যু ঘটায়।

এবার আসি আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রভাবে এডিস মশার জীবন চক্রে কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার কথায়।

এডিস মশার ডিম পাড়ার স্থান নির্ধারণ ও ডিম পাড়ার পর তা ফুটে লার্ভা বের হওয়ার জন্য আপেক্ষিক আর্দ্রতা অনন্য ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, এন্ট্রায়োনিক ডেসিকেশন রেজিস্ট্র্যাপের জন্য সরোসার কিউটিকল তৈরি এবং তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আপেক্ষিক আর্দ্রতা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা না থাকে তবে ডিমের ডেসিকেশন অর্থাৎ শুষ্ককরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিম তার সজীবতা হারিয়ে ফেলবে বা সঠিকভাবে ডিম ফুটে লার্ভা বের হবে না। আর লার্ভার মূল আবাসস্থল হলো জমে থাকা পানি। যার মধ্যে লার্ভা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইনস্টার (ধাপ) পার করে পিউপাতে পরিণত হয়। তাই বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপকরণ ঠিক থাকলে ডিম ফুটে লার্ভা উৎপন্ন হওয়ার পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা পূর্ণাঙ্গ মশার পিউপা হতে বের হতেও মূল ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মশা যখন পিউপা হতে বের হয় তখন বেশ কিছুক্ষণ সময় নড়াচড়াবিহীন হয়ে থাকে তার শরীরে শক্ত আবরণ তৈরি হওয়া পর্যন্ত। এ আবরণ তৈরিতেও আপেক্ষিক আর্দ্রতা মূল ভূমিকা রাখে। পূর্ণাঙ্গ মশা বের হওয়ার পর তা চলাফেরা ও উড়ার কাজে ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়।

এবার বলি পানি বা বৃষ্টির প্রভাবের কথা। এডিস মশা ডিম পাড়ার জন্য জমে থাকা পানিতে ভাসমান অবলম্বন খুবই প্রয়োজন। আর এডিস মশার জীবন চক্রের চারটি ধাপের মধ্যে তিনটি ধাপই অতিক্রান্ত হয় পানিতে, তাহলে বুঝতেই পারছেন জমানো পানি না থাকলে

এত লার্ভা পিউপা কখনই সম্পন্ন হবে না। তবে হ্যাঁ পানি যেমন জীবন তেমনি পানিই মরণ হতে পারে। কারণ অত্যধিক ভারি বর্ষণ আবার মশার ডিমের টিকে থাকার সক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ভারি বর্ষণের পর জমানো পানি থাকলে তা আবার ডিমের হ্যাচিংয়ে সাহায্য করে। একইভাবে সূর্যের আলোর উপস্থিতি মশার আচরণগত পরিবর্তন ঘটায় সাধারণত মেঘলা ও কম আলোর উপস্থিতি দ্রুত বংশবৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

একইভাবে বাতাসের গতিবেগ মশার ডিসপারসালে সাহায্য করে এবং ইনসেক্টিসাইড রেজিস্ট্যান্সে ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনায় এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে জলবায়ুর প্রতিটি উপাদানের অপটিমাম মাত্রা মশার বংশবিস্তারে মুখ্য ভূমিকা রাখে এবং মশার শরীরে সব শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ ব্যবহার করে রেন্নিকেশন ঘটানো ডেঞ্জু ভাইরাসের সংখ্যা ও আক্রমণের তীব্রতা দুটোই নিয়ন্ত্রণ করে। জলবায়ু, বাহক এডিস মশা ও ডেঞ্জু ভাইরাসের রসায়ন বুঝতে পারলেই এ ভয়ানক আতঙ্ক হতে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে। তবে এই নেক্সাস বুঝতে অবশ্যই চিকিৎসা কীটতত্ত্ব বিষয়ে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে যা একজন মেডিকেল এন্টোমোলজিস্টের মূল অর্জন।

তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশিত বিষয়াবলির দিকে লক্ষ্য করে বলতে হয়—আমাদের দেশ যেমন অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ঠিক তেমনি জনমিতিক অবস্থানের কারণে বাহক ও জীবাণুর প্রাচুর্য নিশ্চিতকরণের সব উপাদানের সরব উপস্থিতি ও পরিপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ আমাদের এ শোচনীয় পরিণতি তৈরি করেছে। আসুন, সবাই মিলে সমন্বিতভাবে এই নেক্সাস ভেঙে দিয়ে এডিস মশা নিধন করে ডেঞ্জুমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব। ড. মো. গোলাম হারোয়ার: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ

নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনমানে মূল্যস্ফীতির অভিঘাত

সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনীতির পর্যালোচনায় ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের হার নিয়ে খুব আলোচনা হয়, যা এর আগে তেমনটি দেখা যায়নি। গত ১ জুন মহান জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে, যেখানে মূল্যস্ফীতির হার ধরা হয়েছে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছিল ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ২২ শতাংশ। অথচ বাজার বলছে, দ্রব্যমূল্যের যে পরিস্থিতি ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে তাতে মূল্যস্ফীতি এখন ১২ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে গত এক বছরের মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী এবং ১১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি হয়েছে গত মে মাসে (৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ)। একই মাসে গত বছরে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। আগস্টে খাদ্যপণ্য মূল্যবৃদ্ধির রেকর্ড গড়েছে। চাল, ডাল, তেল, লবণ, মাছ, মাংস, সবজি, মসলা ও তামাক জাতীয় পণ্যের দাম বাড়ায় খাদ্যে মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে। ২০২০ সালে খাদ্য খাতে ১০০ টাকার পণ্যে ৫ টাকা ৫৬ পয়সা বৃদ্ধি হয়েছিল। একই পণ্যে ২০২৩ সালের আগস্টে বেড়েছে ১২ টাকা ৫৪ পয়সা। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতিতে অসহায় অবস্থায় পড়েছে স্বল্প আয়ের মানুষ। গত ১৫ বছরে ক্ষুধা জয়ের ক্ষেত্রে অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। মানুষের জীবনমান নিঃসন্দেহে বেড়েছে। তবে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতির যে ভয়াল দৈত্য দেশের মানুষের ওপর চেপে বসেছে তাতে ক্ষুধার জ্বালা না বাড়লেও জীবনমান কমছে। খাদ্যপণ্যের পেছনে অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে অন্যান্য খাতের চাহিদা অপূরণ থাকছে। এমনকি চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কৃঙ্কসাধন চলছে। এ সংকটের সমাধান মূল্যস্ফীতিতে লাগাম টানা। সরকারের সুনামও এর সঙ্গে জড়িত। শহর ও গ্রামের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, গ্রামে এর ধকল বেশি। গ্রামাঞ্চলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ। অন্যদিকে শহরের সার্বিক মূল্যস্ফীতি হচ্ছে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

এটা হচ্ছে আমাদের সার্বিক মূল্যস্ফীতির চিত্র। অন্যদিকে প্রান্তিক আয়ের মানুষের কথা চিন্তা করলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সবার আগে আমলে নিতে হয়। সরকার যে মূল্যস্ফীতির উপাত্ত প্রকাশ করেছে প্রকৃত চিত্র তা হলেও কিন্তু প্রান্তিক আয়ের মানুষের জন্য তা ভয়ানক। মূল্যস্ফীতির হার মাঝেমাঝে একটু কমতেই পারে। কিন্তু এর পুঞ্জীভূত বিরূপ প্রভাব সর্বদা বহমান। গড় দাম কিংবা দামস্তর একবার বাড়লে তা তো নেমে আসবে না যদি না মূল্যস্ফীতি ঋণাত্মক হয়। আনুপাতিক হারে আয় না বাড়লে ভোগের ওপর এর বিরূপ প্রভাব বিদ্যমান থাকবেই। আর উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলতে থাকলে জীবনযাপন কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, এটাই স্বাভাবিক। মূল্যস্ফীতির যে চাপ তা সবার ওপরই পড়ে এবং সেটা বুঝতে কোনো বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোনো দেশে যখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি থাকে তা সবাইকে প্রভাবিত করে। তার পরও উচ্চ ও মধ্যম আয়ের মানুষ চাপ থাকলেও মানিয়ে নেয়। কিন্তু যারা নিম্ন আয়ের মানুষ এমনিতেই তাদের নুন আনতে পানতা ফুরায়, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির মানে হলো সামগ্রিকভাবে অতিরিক্ত চাপ। জীবনধারণের জন্য যে ন্যূনতম ভোগ প্রয়োজন তাদের জন্য তা ধরে রাখা কঠিন। মূল্যস্ফীতি সহসাই যে নেমে আসবে সে রকম আশাব্যঞ্জক কিছু সামনে দেখছি না।

অনেকেই মুদ্রাস্ফীতির কারণকে অনেকভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি; দেশজ উৎপাদনে ঘাটতি; পণ্য সরবরাহে ঘাটতি; মুদ্রার বিনিময় হার; শুল্ক ও বিশেষ শুল্কহার; মুদ্রা সরবরাহ; বাণিজ্য ঘাটতি; বাজেট ঘাটতি; বিদেশের

সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে ভারসাম্যহীনতা; সুদের হার; ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণ; পণ্যের একচেটিয়া মূল্য নির্ধারণ; শ্রমিক ইউনিয়নের মজুরি বাড়ানোর চাপ; শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর মধ্যে খাতওয়ারি মজুরি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা; মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতিতে অসামঞ্জস্য; সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার মতো কারণগুলো। মূল্যস্ফীতির কারণ যেমন একটি নয়, তেমনি এর প্রতিকারও একটি সূচকের তারতম্য করার মাধ্যমে সম্ভব নয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, বাজারে পণ্যের মজুদ ও মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ব্যাংক যখন অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপে, তখন মূল্যস্ফীতি ঘটে।

মূল্যস্ফীতির হার যদি দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সেটি সঠিক হয় না, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে বর্তমানে দেশে জিডিপি চেয়ে মূল্যস্ফীতির হারের প্রবণতা বেশি। এ অবস্থায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে ধরা হয়েছে, যা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের মধ্যে। সম্প্রতি বিআইডিএসের গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকা শহরে গরিব মানুষের অর্ধেকের বেশি 'নতুন দরিদ্র'। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সপ্তম ধাপের (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) ফলাফল অনুযায়ী, এ মুহূর্তে বাংলাদেশী খানাগুলোর প্রায় অর্ধেকই খাদ্যের উচ্চমূল্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে। জরিপে দেখা যায়, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে সবচেয়ে বড় আর্থিক ধাক্কা হিসেবে চিহ্নিত করেছে ৪৮ শতাংশ খানা। এই যে মূল্যস্ফীতি, তা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করছে। মূল্যস্ফীতি মধ্যবিত্তকে নামাচ্ছে নিম্ন-মধ্যবিত্তে, আর নিম্ন-মধ্যবিত্তকে নিয়ে যাচ্ছে নিম্নবিত্তে। এতে স্থানীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

অতিসম্প্রতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুলাই-ডিসেম্বর '২৩) প্রথমার্ধের জন্য গত ১৮ জুন ২০২৩ মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঘোষিত মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ সামগ্রিক বাজার অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সমন্বয়যোগী ও দিকনির্দেশনামূলক। ঘোষিত মুদ্রানীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রেপো হার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে। এতে এ হার ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ, সেই সঙ্গে রিভার্স রেপো হার ২৫ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪ দশমিক ২৫ থেকে ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়েছে; মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে এবার সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে; নীতি সুদহার বৃদ্ধির কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদহার সীমাও তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, সুদহার সীমার বদলে প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারভিত্তিক সুদহার কার্যকর হবে, যদিও তার মার্জিন থাকবে, টাকার সরবরাহ কমিয়ে এনে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাটাই উদ্দেশ্য। তা-ই যদি হয় তবে মূল্যস্ফীতির প্রভাবটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র জনগণকে কীভাবে প্রভাবিত করছে কিংবা এ সমাজের মানুষ কী অবস্থায় আছে তার একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সময়ের দাবি। অর্থনীতিবিদরা এ শ্রেণীকে পরিমাপ করেন আয়-ব্যয়ের নিরিখে, যা একইভাবে চিহ্নিত করাও হয় না। পিপিআরসি নিম্ন-মধ্যবিত্তকে চিহ্নিত করেছে তাদেরকে যাদের আয় মাসে ২০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হোমিও খোরাসের মতে, এ শ্রেণীর জীবনে গুণমান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও আত্মনির্ভরশীলতা থাকে। নানা পেশা থেকে তাদের আবির্ভাব হয় যারা নতুন নতুন পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা তৈরি করে। এ শ্রেণী শুধু আবশ্যিক পণ্যই কেনে না, তারা শৌখিন পণ্যও ক্রয় করে। এটিই তাদের অর্থনৈতিক চরিত্র।

স্থানীয় অর্থনীতি এখন এমন একটা পর্যায়ে রয়েছে যেখানে ছোট দোকান ও কৃষিজমির মালিক কিংবা শিল্প ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বল্প দক্ষ কর্মী। তাদের জীবন সহজ না হলেও ঘরে তাদের পর্যাপ্ত খাবার থাকে। তারা আয়ের অর্ধেক অর্থ মৌলিক প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করে। অন্যান্য অনেক কেনাকাটা সেকেন্ডহ্যান্ড বা অনানুষ্ঠানিক অথবা খোলা বাজার থেকে কেনাকাটা করে। কিন্তু এ গোষ্ঠীর উত্তরণের স্বপ্ন খেয়ে ফেলছে মূল্যস্ফীতি। বরং তাদের অবস্থা আরো নাজুক হচ্ছে। আয়ের এখন পুরোটাই তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য কিনতে খরচ করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে যারা মধ্যবিত্ত পর্যায়ে ছিল, তারাও পড়তির দিকে। তাদের অনেকেই আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে না পেরে দরিদ্রের খাতায় নাম লেখাচ্ছে। স্থানীয় পণ্যের উচ্চমূল্য এবং মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা এটি মনে রাখতে হবে যে মূল্যস্ফীতির চাপ আরো কিছু সময় থাকবে। এটি সারা পৃথিবীতেই অনুভূত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে দুটি বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়তে হবে। এর জন্য দেশের ভেতরে উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানীকৃত পণ্যের সংগ্রহ বাড়তে হবে; দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা দিতে হবে যাতে তারা বাজার থেকে পণ্য কিনতে পারে। তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিতে হবে, যাতে তাদের ব্যবসা ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এ কার্যক্রমগুলোর জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন, এর জোগান কে দেবে? তাই সরকারকে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। যেমন আমাদের রাজস্ব আহরণের পরিমাণ খুবই কম যা বর্তমানে কর-জিডিপি হার মাত্র ৭ দশমিক ৭ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নিম্নতম। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন না বাড়ালে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়তে পারবে না; তারপর বিষয়টি হলো সুশাসন অর্থাৎ সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়তে হবে, অপ্রয়োজনীয় খরচ, প্রকল্প বাস্তবায়নে অপচয় রোধ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে, সরকার এরই মধ্যে ব্যয় কমানোর ব্যাপারে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। সেগুলো ভালো উদ্যোগ। কিন্তু আরো সাশ্রয়ের সুযোগ রয়েছে; আরেকটি বিষয় হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতা

অবলম্বন করতে হবে। যেহেতু আমদানি ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং রফতানি আয় সে তুলনায় বাড়ছে না, রেমিট্যান্স প্রবাহও বাড়ছে না, চলতি হিসাবে বিরাট ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। এটি চলতে থাকলে তা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে চাপ সৃষ্টি করবে। এতে টাকার মান আরো কমবে এবং মূল্যস্ফীতিও বাড়বে। সুতরাং মূল্যস্ফীতি কমানোর বিষয়টি অনেক পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত। এটি পূর্ণাঙ্গ নীতি পদক্ষেপের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে এবং যত দূত সম্ভব সেটি করতে হবে। কেননা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির চাপ অব্যাহত থাকলে তা সমাজে আরো বৈষম্য বাড়াবে, যেটি মোটেই কাম্য নয়। আর স্থানীয় অর্থনীতি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ভোক্তা অধিকার সংস্থা, টিসিবি, পণ্য বিপণন ব্যবস্থাপনা, চাহিদা সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং সর্বোপরি আমদানি-রফতানি ব্যবস্থাপনায় কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা আনয়নপূর্বক এ সমস্যা সমাধানে তৎপর হতে হবে। অধিকন্তু বিভিন্ন বাজার কমিটি দ্রব্যসামগ্রীর গুণাগুণ যাচাই কমিটি, মালামাল সংরক্ষণ ও গুদামজাত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি মহানগর ও পৌর এলাকার বাজারগুলোয় তাদের নিজস্ব পরিদর্শন টিমের আন্তরিকতার সঙ্গে তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। আর সবার সমন্বিত কার্যক্রমে এ দুরবস্থার নিরসন সম্ভব হবে। সব কিছুর দাম বাড়ায় সংসার খরচ বেড়ে গেছে। যে কারণে আয়ের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে নিত্যপণ্যের পেছনে। চাহিদার সঙ্গে দাম যাতে না বাড়ে, সেজন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সংস্থাগুলো দৃশ্যত কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও নিয়ে থাকে। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এসব ব্যবস্থা বাজার নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবির মাধ্যমে খোলাবাজারে পণ্য বিপণন, বাজার মনিটরিং ইত্যাদি যেসব পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, এগুলো যেন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন রাখতে বিশেষ করে কৃষিপণ্যের সরবরাহে যাতে কোনো বাধার সৃষ্টি হতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে সংশ্লিষ্টদের। ড. মিহির কুমার রায়: অর্থনীতিবিদ

Why is Bangladesh so far behind its neighbours in green energy use?

It is quite disheartening, not to mention concerning, to learn that Bangladesh ranks the lowest among all the South Asian countries in terms of using renewable energy. A recent study by Dhaka-based think tank South Asian Network on Economic Modeling (Sanem) reveals that the share of renewable energy in Bangladesh's total power generation capacity stands at a measly 1.90 percent. By contrast, Pakistan's renewable energy usage stands at 6.8 percent, Sri Lanka's at 22.22 percent, and India's at 30.2 percent.

Energy experts in the country believe the government is neglecting our renewables potential – and we cannot help but agree. At a time when the world is moving away from fossil fuels and transitioning to renewables, Bangladesh is doing the exact opposite. According to the Sanem research, the government is increasing LNG and other fossil fuel imports to meet the national demand and reduce dependency on our depleting domestic gas reserves. Leaving aside the question of its environmental impacts, how is that a rational financial decision, given the economic challenges we are currently facing? Our foreign exchange reserves have alarmingly dropped under \$22 billion (as of September 14, 2023) thanks to our rising import bills and less-than-expected earnings from exports and remittances.

So instead of putting more pressure on our dwindling forex reserves, the government ought to explore and invest in renewables, which will help us not only transition to clean energy but also cut down the debilitating air pollution in the country. Take solar power, for example. Sunlight is a natural resource that Bangladesh has in abundance. The government can make use of this resource not just by setting up new facilities, but also by ensuring effective utilisation of the existing solar panels in the country.

The government has set an ambitious plan to generate 41GW of solar power by 2041, as well as a target of meeting 40 percent of our national demand with clean energy by 2041, as per the Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP). But given the state of things at the moment, it is evident that no effective plan is in place to reach these goals. The relevant government agencies

need to redirect their focus and formulate an action plan that will help us become a clean-energy country sooner than later. Renewables are the future, and the government needs to put in concerted efforts if it wants to meet its own goals.

Bay of Bengal drowning in plastic

It is extremely distressing that, despite repeated warnings about the grave dangers of plastic pollution in the Bay of Bengal, unsustainable waste management continues to wreak havoc in our nation's most treasured natural resource. According to a recent study conducted by Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh (ECOFISHBD) – an initiative funded by the United States Agency for International Development (USAID) – around 15 tonnes of non-biodegradable waste are dumped into the sea by fishermen alone. The waste includes plastic bags, bottles, and polythene bags, all of which are disastrous for the environment, wildlife, and human health. The latest study undoubtedly serves as yet another reminder of the dangerous and persisting lack of awareness resulting from the lacklustre implementation of environmentally sustainable policies.

Just last year, another study by ECOFISHBD found that around 22.77kg of non-biodegradable waste is dumped daily on the Kuakata sea beach by tourists and locals. Experts have warned that the large-scale plastic pollution and proliferation of harmful bacteria are likely to make the Bay of Bengal unusable in the next 30-50 years. It goes without saying that the nation would not have descended to this situation had authorities implemented the bold steps taken to protect our environment since 2002, when Bangladesh became the first country in the world to ban polythene bags. Furthermore, in 2010, the country adopted the Jute Packaging Act to promote alternative packaging – with little effect 13 years later. In 2020, the High Court ordered the government to impose a ban on single-use plastic products by 2021, yet no effective measures have been taken to promote multi-sectoral change.

As destruction from plastic pollution continues to plague the environment, all the strides in policy and legislative arrangements have only served as mere rhetoric. It's time we put the jute packaging law into effect to replace the widespread use of plastic. Authorities should also diligently conduct regular drives to stop the indiscriminate use and illegal production of polythene bags and single-use plastics. Measures should also include multi-ministerial monitoring divisions to rigorously prevent the dumping of non-biodegradable waste into water bodies. It is of utmost importance to protect the Bay of Bengal against environmental degradation.

Correcting the dollar's price is the only medicine we need

A good doctor usually does not prescribe too many medicines. Once, the maharaja of Cooch Behar was suffering from various ailments. He invited the noted doctor of the time, Dr Bidhan Chandra Roy from Kolkata, to prescribe him medicines. Dr Roy saw the patient and left a single piece of advice for the maharaja: quit smoking as soon as possible. The ruler was not amused by the doctor's suggestion. Nor was he satisfied to see that no medicines had been prescribed. However, he eventually recovered from all ailments simply by abandoning his habit of smoking, all while no other medicines were needed.

Economic policymaking often works this way. A single, sensible policy can make a motley of weird prescriptions totally redundant. The wrong exchange rate – simply the undervaluation of the US dollar or an artificial overvaluation of the Bangladeshi taka – is the single culprit behind the

country being pushed to the edge of the forex reserve crisis. Our forex reserve, which peaked at \$48 billion in August 2021, has come down to as low as around \$21 billion in September 2023. The figure by August should have been at around \$60 billion, had the reserve maintained its normal growth trend observed since 2009. Moreover, the trend of workers' migration has seen an uptick recently, but this is not reflected in the recent remittance inflow, which was awfully low last month. This is nothing more than a result of the egregiously low valuation of the dollar. Russia's attack on Ukraine is responsible for this decay.

Both the finance ministry and Bangladesh Bank (BB) must be serious about averting the reserve crisis, no matter how they wish to downplay the matter on the surface. This is not only about poor growth in remittances, but also three other worrisome developments that threaten the country's economic stability: 1) forced squeezing of imports, which retards industrial growth; 2) lacklustre performance of exports; and 3) the unprecedented collapse in financial accounts, which has dehydrated the balance of payments and drained forex reserves. The single practice of fixing the dollar's price is responsible for these many ailments.

The finance ministry's peanut-sized incentive on remittance has proven to be worthless, and has actually weakened our already beleaguered fiscal capacity. Remittance senders do not want any sort of grace from the ministry. Rather, they need to get a fair value of their hard-earned money. On the one hand, the ministry wants to look like it's helping BB with the incentive. On the other hand, the ministry is also forcing BB to print more notes to fill up its own revenue gap. These are unnecessary for and harmful to the proper functioning of a market economy.

Various sources suggest that the dollar's price is close to Tk 120 in the street market, while the central bank is offering only Tk 109.5 to remitters. This obviously fails to convince the migrant wage earners to send their money through the official channel, which is financially punitive and still bureaucratic. As rational economic agents, wage earners resort to hundi, which is comparatively more rewarding, faster, and more accessible. But why do policymakers find remitters' use of hundi unpatriotic? Why should migrant workers be responsible for paying out of their pockets for incorrect rates manufactured by policymakers?

Losing almost Tk 8 per dollar naturally does not make any sense to migrant workers. Engaging the police or the intelligence department to chase down hundi or money-changing agents is a complete waste of energy on the government's part. But this hunt will never end if the Bangladesh Bank keeps picking the wrong exchange rates. The central bank governor should coordinate with researchers, economists, and market experts to take knowledge-based actions, rather than employing the police to chase down petty margin-makers who have, in fact, been created due to BB's market-unfriendly dollar prices.

In the central bank's last monetary policy announcement in June, the governor vowed to make the exchange rate market-based. But the governor seems to be depending on oxygen provided by the Bangladesh Foreign Exchange Dealers' Association (BAFEDA) to set the exchange rate. This reflects the lack of confidence that breeds policy hypocrisy. BB seems to be afraid of standing on its own feet. Hence, its claim of policy independence is flimsy. It has incorporated the fixing of

interest rates with treasury bill rates, which are mainly controlled by the finance ministry, indicating that the country's central bank cannot operate independently.

If BAFEDA can fix the exchange rates and the finance ministry can fix the interest rates, do we really need a separate institution like BB? Instead of fighting for independent policymaking based on knowledge and research, BB is making its job unnecessarily complex. Our central bank could outsource some of the tasks which its own machinery or manpower cannot support, and BAFEDA can be a secondary source of suggestions on exchange rates. But recent activities do not shine a light of reliability on BAFEDA's exchange rate recommendations. The underpricing of the dollar is pushing our overall financial position from bad to worse, without any sign of recovery.

There are three reasons why BB is not catching up with the actual price of the dollar: 1) fear of inflation; 2) fear of excessive volatility of the exchange rate; and 3) the typical mentality of making taka's depreciation equivalent to the economic weakness of the regime. The theory suggesting that a higher dollar price will stoke inflation further through the import channel is partly true. But the main inflation, which makes the poor suffer the most, is originating from the high prices of necessities, which do not relate to import channels as much. Inflation remains stubbornly high because of incorrect policy rates and fiscal incapacity. The finance ministry failed to collect taxes from the superrich and resorted to making the central bank print extra notes. This has made inflation furious through the multiplier.

Second, any rate that is surrendered to the hands of the market will be subject to volatility in the initial months, but the price will settle over time and make the economy safer than before. Finally, relating the taka's weakness to the weakness of the economy is a fundamentally flawed exercise. Rather, a market-based rate will increase both exports and remittance inflow, which will be the protagonists in terms of improving Bangladesh's balance of payments, and eventually bring the forex reserve back to a comfortable position. [Dr Birupaksha Paul is a professor of economics at the State University of New York at Cortland in the US.]

What does Bangladesh's space research organisation really do?

India's recent moon landing success raised a lot of curiosity and interest in Bangladesh and Pakistan. The question many people raised was: "Why couldn't we achieve something like this?" Bangladesh's Space Research and Remote Sensing Organisation (SPARRSO) came under scathing criticism from netizens.

Intrigued, I decided to find out more about SPARRSO from its website. Founded in 1968 as the American space programme's Automatic Picture Transmission (APT) ground station, it is supposed to contribute to national development by peacefully applying space science and technology (vision statement). In 1972, when NASA launched its Earth Resources Technology Satellite (ERTS) – later renamed Landsat – SPARRSO continued active collaboration with it and later with Japanese and European space programmes. That partnership has continued since. In May last year, NASA integrated its satellite data with observations from Bangladesh Meteorological Department (BMD) to enhance the country's ability to forecast extreme weather events. That means SPARRSO is active, but either it is not informing the public of its work or not meeting expectations. According to its website, SPARRSO had only two achievements in over 50 years:

1) NASA Group Achievement Award in 1986 and 2) Bangladesh Independence Award by its chairman in 1998. It offers only five data sets to the citizens, which are 33 years out-of-date (maps and images covering Dhaka, Chattogram, and Bangladesh, published between 1985 and 1990). There are only eight ongoing research programmes with a combined budget of just under Tk 88 lakh (\$80,000 at the current exchange rate). With such a paltry allocation, we cannot expect any earth-shattering (or moon-shattering?) performance.

We, however, must be realistic. SPARRSO's mission is not necessarily sending lunar missions but using space technology for peaceful purposes. As such, it can focus on leveraging this technology and supporting Bangladesh's development journey. A few cases in other countries might clarify this point.

In 2012, India launched a programme called KisaanMitr (Farmers' Friend) to give farmers free personalised weather forecasts (from satellite data) and agricultural advice via SMS three times a day. Research showed that it led to greater compliance with agro-meteorological advisories in scheduling operations based on crop growth cycle. It also increased the use of rainwater as a groundwater or surface irrigation substitute.

In Brazil, the police hardly ever investigated environmental crimes because locating isolated illegal deforestation was difficult. In 2018, it adopted the online forest monitoring platform Global Forest Watch, which detects areas of tree cover loss using satellite imagery. With this, the police can quickly identify areas of illegal deforestation and combat them more effectively.

Senegalese farmers have improved their yields and reduced losses due to disease by monitoring crop health and identifying areas of crop stress with satellite imagery. The programme, in collaboration with the Global Partnership for Sustainable Development Data, uses Artificial Intelligence (AI) to predict crop yields and enhance food security by guiding the farmers, planning food storage and transport, and helping policymakers focus on the most vulnerable communities.

In Kenya, satellites map soil moisture levels with which farmers optimise their irrigation schedules. It improves crop yields and saves water, reducing the risk of crop failure due to drought. The Directorate of Resource Surveys and Remote Sensing (DRSRS) is working on a national digital programme for a satellite-based AI-powered crop monitoring and yield forecasting system. With it, the farmers will make smart and data-driven farming decisions, and monitor crops. Last year, Kenya joined UNCTAD's CropWatch programme to monitor its crops better and protect them from floods and other hazards. CropWatch uses satellite data to monitor crop conditions and integrates this with other climate-related data on drought, pests, and disease for better farm management.

None of these countries, save India, sent satellites into space but effectively uses data from others' satellites. Essentially, they collect relevant data from various sources, process them to produce useful information, and deliver the products effectively to the end users (e.g., farmers).

Aside from agriculture, there are many other fields where satellite imagery and advanced data processing can offer valuable insights. These include environmental conservation, disaster management, urban planning, infrastructure development, water resources management, public

health management, and disease control. Each area can immensely benefit from satellite data but discussing them in a short article is impossible. Using satellite data effectively, Bangladesh can unlock space programmes' transformative potential for a more prosperous and sustainable future.

Here is a case. Landsat satellites cover the earth every 16 days and provide data for free downloading within a few minutes. However, such data are not precise as their pixel size is 30m (i.e., a 30x30m block on the ground becomes one number in the satellite data). These data cannot help in detailed studies that require higher precision. However, commercially available satellites offer accuracy in centimetres, even millimetres. These are expensive and not easily available. SPARRSO can act as a medium to procure such data and disseminate it to government and private users, charging a fee to recover the cost (making it commercially viable).

Bangladesh's space programme can indeed do a lot on the ground. But that needs sustained investment in education, research, joint programmes with universities and research organisations, technology transfer from advanced countries, and a long-term vision. Launching satellites is only one part of a space programme; the more significant part remains how the data is processed to glean valuable insights. Dr Sayeed Ahmed is a consulting engineer and the CEO of Bayside Analytix, a technology-focused strategy and management consulting organisation.

We are not on track for 2030 climate targets

Back in 2015, three essential global agreements were adopted with targets set in 2030. We are at the halfway point of this time frame; if we review the current situation, the progress is not good.

The Paris Agreement on Climate Change was adopted at the 21st UN Climate Change Conference (COP21) in December 2015. Two main commitments were agreed upon: 1) keep global temperature below two degrees Celsius, and if possible, below 1.5 degrees Celsius; and 2) provide developing countries with \$100 billion a year, starting from 2020, to tackle climate change impacts through mitigation and adaptation.

Unfortunately, with only seven years to go, neither of these commitments are on track to be fulfilled. Global temperature has already exceeded 1.2 degrees Celsius, and this is now clearly causing losses and damages. At the same time, the promise of \$100 billion annual funding has failed to materialise even in 2023. There will be a formal stocktake of the situation at the forthcoming COP28, to be held in Dubai in November this year, but it is already quite evident that progress has been very slow and needs to be accelerated significantly to reach the 2030 deadline.

Meanwhile, countries adopted the Sendai Agreement on Disaster Risk Reduction (DRR) in Sendai, Japan, to develop national disaster risk reduction strategies by 2030. This goal has made some progress in a number of countries, but unfortunately most nations are still lagging behind and will need to accelerate their activities considerably to achieve the target.

The third and perhaps most comprehensive and important agreement of 2015 was the Sustainable Development Goals (SDGs), adopted at the United Nations. This agreement is the successor to the Millennium Development Goals (MDGs), which were agreed upon back in 2000 and meant to be achieved by 2015. There has been a recent review of the SDGs' status, and there will be a review meeting in New York later in September. But we already know that we are way behind in achieving

all the 17 goals. At the current rate of progress, it is predicted that most of the goals will not even be achieved by 2050, let alone 2030!

Hence, it is imperative that in 2023, we go back to the drawing board and rethink how to improve our performance. The first thing we need to acknowledge is that treating all these aspects separately, at both global and national levels, is counterproductive as they are all linked together. The second thing we need to recognise is that even though all the targets are essential, we have to prioritise the most important ones and focus on achieving a few goals at least, rather than failing to achieve any of them. In my view, the priority should be the nexus of development, climate change and disaster reduction, as addressing these is crucial for most developing countries.

Disaster risk reduction is primarily to do with hydro-meteorological events such as floods and cyclones, which will get worse with climate change. So, DRR and adaptation to climate change go together. At the same time, the risks of disasters related to climate change have the potential to set back development achievements.

In the case of Bangladesh, this means that different ministries and other stakeholders that have been working in isolation need to find ways to work together more effectively. For example, DRR is under the Ministry of Disaster Management and Relief; climate change adaptation is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change; and development is under the purview of the Ministry of Finance and the Planning Commission. The civil society and the private sector also work in an isolated manner.

The good news, in the case of Bangladesh, is that we do not need to start from scratch, as we already have an SDG coordination body under the Prime Minister's Office. It has excellently mapped jurisdictions for different ministries against each of the SDG. At the same time, civil society organisations have also been brought under the umbrella of each SDG, coordinated by the Centre for Policy Dialogue (CPD). The next opportunity for us will be to build on this foundation and take it to the next level through the ninth Five-Year Plan, which is currently being prepared. Bangladesh is now in an excellent position to create a truly multidisciplinary and cross-cutting plan, using which we can effectively address development, climate change and disaster risk reduction. Dr Saleemul Huq is director of the International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD) and professor at Independent University, Bangladesh (IUB).

Environmental protection laws need stricter enforcement

The Global Liveability Index 2023, published by Economist Intelligence Unit, listed Dhaka as the seventh least liveable city in the world. According to the Climate Risk Index (CRI) 2021, by German NGO Germanwatch, Bangladesh ranks seventh among countries most affected by extreme weather events in 2000-2019. And, according to the World Bank, air pollution caused 78,145-88,229 deaths in Bangladesh in 2019. The vast majority of these deaths were caused by exposure to PM2.5, which are tiny particles that can penetrate deep into the lungs and cause respiratory problems.

It is safe to say that Bangladesh is one of the most polluted countries in the world, with an average annual concentration of fine particulate matter (PM2.5) of 83.3 micrograms per cubic metre

($\mu\text{g}/\text{m}^3$). The safe level of PM2.5 concentration is $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, according to the World Health Organization. Bangladesh has a rapidly growing number of vehicles, which contribute to air pollution in major cities like Dhaka and Chattogram. To add to this, large-scale industrial projects have been undertaken in environmentally vulnerable locations. Under the Paris Agreement, as part of its Intended Nationally Determined Contributions, Bangladesh has agreed to decrease greenhouse gas (GHG) emissions by five percent unconditionally and by a further 10 percent subject to financing from the international community.

Bangladesh has a number of environmental laws in place, but enforcement is often weak. The most important aspect of these laws is utilising various provisions of the Bangladesh Environment Conservation Act (BECA) 1995. It provides a comprehensive framework for environmental protection and establishes the Department of Environment (DoE) as the lead agency for environmental protection, giving it the power to regulate pollution, enforce environmental standards, and grant environmental clearances. Meanwhile, the Environment Court Act, 2000 establishes specialised environment courts to deal with environmental offences and violations, meant to ensure speedy and effective resolution of environmental disputes.

The Forest Act, 1927 regulates the conservation, management, and utilisation of forests in Bangladesh, addressing issues such as deforestation, illegal logging, and forest encroachment. Bangladesh's Wildlife (Conservation and Security) Act, 2012 aims to protect and conserve wildlife species in Bangladesh, including endangered species, by prohibiting hunting, trading, and trafficking of wildlife. For the protection, conservation, and management of water resources in the country, Bangladesh Water Act, 2013 focuses on covering issues such as water pollution, river basin management, and water allocation.

Despite these laws and regulations, environmental degradation continues to be a major problem. This is due in part to weak enforcement of environmental laws. There are a number of challenges to implementing environmental laws in Bangladesh such as a lack of political will, corruption, weak enforcement, public apathy, and lack of data. Transparency International Bangladesh (TIB), in its recent research, highlighted several deficiencies in environmental legislation, and the DoE's failure to effectively execute existing laws, regulations, and supplementary laws. In 2019, the World Bank estimated that air pollution cost Bangladesh up to 4.4 percent of its GDP. A recent report by the WB concluded that 20 percent of deaths in the country occur due to air pollution.

To sustain the existence of human life, the environment must be saved. In order to overcome these challenges, the government needs to take more steps such as demonstrating a political will to protect the environment, strengthening enforcement of existing environmental laws, raising public awareness, and collecting data on pollution and climate vulnerability in different regions of the country.

Dengue: Guatemalan, Bangladeshi responses

Guatemalan health minister Francisco Coma on August 31 last declared a national health emergency in the face of a dengue outbreak that has claimed 22 lives and infected over 12,000 persons in his country this year. The emergency will be in place for three months. In Bangladesh, a total of 671 persons have died and more than 138,000 got infected by the dengue virus until September 06 this year. On September 02, the country recorded the highest 21 deaths, almost equivalent to the total number of deaths in Guatemala.

The health authorities here prefer to remain indifferent and find it proper to shift the responsibilities onto others. This is, in fact, a repeat performance of the health sector honchos. They had behaved almost identically during the COVID-19 pandemic period, remaining nonchalant and unconcerned about what had been happening around them.

At the initial stage of the dengue outbreak, the health minister shrugged aside the suggestion to declare a health emergency. He, possibly, had found the situation quite manageable. The health issues involving dengue have gone deeper thereafter. Nearly 700 people have died and 138,000 infected by the virus. These are official data. Given the overall situation across the country, the numbers are likely to go up three to fourfold. The dengue situation in Dhaka city is far severer with most families having one or more members afflicted with dengue.

The health authorities are happy only if they can ensure accommodation ---hospital ward floors and corridors included --- for patients in case of emergency. Shortage of doctors, nurses and medicines, including IV fluids, is not an issue for them. They know patients would manage on their own as a matter of practice in public health facilities.

The Infectious Disease (Prevention, Control and Eradication) Act adopted in November 2018, however, wants the Directorate General of Health Services (DGHS) some more jobs to do. The directorate, among others, will have to (1) segregate the infected areas from infection-free areas and take steps to keep the latter area protected from infection; (2) ask individuals possessing information about infectious disease to send the same to the DGHS; (3) apply insecticides inside houses, other establishments and on mosquito nets, bed sheets, curtains etc., to control vector-borne diseases; (4) fix the safe limits of insecticides, manage breeding grounds of insects and destroy sources of infection.

The Act in question is a comprehensive one and has made the DG of health services responsible for carrying out all the provisions. Though it was enacted 15 months ahead of COVID-19, the health authorities demonstrated a notable gap in its capabilities during the pandemic time. That they are still in the same state is proven by their reaction to developments involving the dengue outbreak.

Now comes the performance issue of the Dhaka city corporations! It is better to say less about them. The top notches of two major local government entities talk more than what they accomplish. The Dhaka North City Corporation (DNCC) instead of eradicating Aedes mosquito larva has triggered controversy over BTI procurement. The Dhaka South City Corporation (DSCC) made an unconsidered claim about a fall in dengue infection because of its actions on the ground. Undeniably, the residents of two city corporation areas are not happy with the response of two city corporations to dengue outbreak. Such unhappiness is nothing unusual, even though corporations are now doing well in some areas than before.

City corporations and DGHS need to be more proactive in combating dengue which has taken an epidemic form. They should follow in the footsteps of similar entities in neighbouring West Bengal, Singapore, Malaysia and some other countries. The involvement of communities is important in the control of dengue. Yet there are additional measures that are necessary to eliminate the Aedes vector. The agencies concerned should take a well-coordinated move in that direction.

But the government needs to declare a national health emergency to deal with dengue and offer all possible help to people afflicted with it.

Halting the decline in inflow of remittance

Though the number of migrant workers flying abroad is surging, the remittance they are sending home is not. The mismatch is worrying for the government and intriguing for organisations studying the changes in the pattern of inward remittance flow vis-à-vis the number of migrant workers working abroad. However, fluctuations in remittance receipts have always been there. But the observation that inward remittance receipts are on a steady decline is the most worrying aspect. According to the Bangladesh Bank (BB), year-on-year, the remittance inflow in July fell by 5.86 per cent to USD1.97 billion from USD2.09 billion last year. And month by month, the trend was worse, for July's remittance was 10.27 per cent less than June's at USD2.19 billion. And the figure for August is USD1.599 or close to USD1.60 billion. Evidently, this has set the alarm bells ringing. Will September's performance of homeward remittance be still worse? But what can be done to arrest the continuous decline of hard-earned precious foreign currencies from overseas migrant workers that flow into Bangladesh economy every month?

At different discussion events held on the subject from time to time, economists, representative from government bodies like the Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL), Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET), Bangladesh Bank (BB), spokespersons of manpower recruiting agencies and research bodies in the field dwelt at length on the issue. In fact, a kind of consensus has been reached on what actually lies behind the diminishing flow of the migrant workers' remittances. One is the overseas workers' increasing tendency to use informal channels, especially the so-called hundi, to send their money. And the other is the gap between government-offered rate of US dollar in taka and what is offered at the kerb market. The government incentive of providing 2.5 per cent on each dollar remitted home through banking channels did work for some time. But with the hundi-operators getting smarter, the migrant workers are now looking to them for service in still greater numbers. Being mostly unskilled workers with little knowledge of the formalities of using banking channels, which are often unfriendly towards the migrant workers, the obvious choice for those workers is the personal service offered by the hundi operators' agents. In a recent report, it came out that the hundi operators have developed a widespread network from the migrant labourers' workplaces in the host countries right to the villages in Bangladesh where their (migrant workers') relatives live. Hundi operators' agents collect the dollars from the individual migrant workers in the host countries and hand over an equivalent amount of taka (of course at the kerb market rate, which at the present rate is around taka 8 more per USD than the official rate of Tk.109) to the relatives of the migrant workers. So, it is getting harder for the official channels to compete with the home service offered by the hundi people. One way to address the issue is to reduce the gap between official exchange rate of USD and that in the informal market to zero. And the other is to bust the hundi networks at home and abroad. The latter option will require cooperation of host government of the expatriate workers in clamping down on the overseas hundi networks. At the same time, at home, the local hundi dens should also be stormed and destroyed.

Last but not least, the bank officials and the diplomatic staffs of our foreign missions should be able to win the hearts of the migrant workers by being more friendly, helpful and cooperative towards them.

Empowering CMSMEs in Global Value Chains

In today's interconnected world, the concept of Global Value Chains (GVCs) has become a defining feature of the global economy. GVCs represent the intricate web of relationships among economies, industries, and businesses involved in global production networks. These chains transcend national borders, seamlessly linking manufacturers, suppliers, and service providers, creating a highly efficient and dynamic global marketplace.

Bangladesh, a country steeped in a rich cultural heritage, stands on the precipice of a significant economic transformation. While strides have been made in various sectors, Cottage, Micro, Small, and Medium Enterprises (CMSMEs) face substantial hurdles when it comes to active participation in Global Value Chains (GVCs). This article delves into these challenges and offers a comprehensive policy framework to bolster CMSMEs, driving their integration into GVCs and, in turn, unlocking Bangladesh's immense economic potential. To understand the urgency of CMSME participation in GVCs, we must first grasp the global context. GVCs represent the intricate interplay among economies, industries, and businesses engaged in global production networks. Bangladesh has been a notable presence in these value chains, with its nominal and real GVC-related trade shares averaging 45.2 per cent and 45 per cent, respectively, since 2007. However, Bangladesh's role has predominantly been downstream in these chains, underscoring the need to ascend the value-added ladder.

A pressing issue confronting Bangladesh is its low productivity levels. In 2016, the country's productivity was a mere 33 per cent of the average productivity of the 20 Asia Pacific Economies (APO20). Alarmingly, Bangladesh ranked third lowest in this productivity comparison, surpassing only Cambodia and Nepal. This productivity deficit is acutely felt within CMSMEs, a substantial segment of the nation's economic landscape. To surmount this challenge, CMSMEs must leverage their involvement in GVCs to access technologies and best practices that enhance productivity.

Empowering CMSMEs and fostering their active participation in GVCs necessitates a multifaceted policy approach. Here are the key policy recommendations to address the productivity gap and stimulate economic growth: To attract game-changing GVC investments, Bangladesh must prioritize openness, investor protection, policy stability, and a business-friendly climate. Investment promotion agencies (IPAs) can play a pivotal role in this effort. Exemplary models in countries like Costa Rica, Malaysia, and Morocco have demonstrated the efficacy of targeted IPA strategies, such as offering fiscal incentives and tailored services, in attracting FDI. Such investments have the potential to significantly enhance the productivity and capabilities of local firms, including CMSMEs, ultimately driving broader economic development. Ensuring equitable access to bank loans is imperative for CMSMEs. Policies should be designed to encourage financial institutions to extend loans to these enterprises. Access to capital is a lifeline for CMSMEs seeking to upgrade technology, expand operations, and integrate into GVCs.

Investment in human capital development is equally vital. Leveraging existing SME clusters to develop industry-specific skills and management capacity, as demonstrated by Malaysia's Penang

Skills Development Centre (PSDC), can significantly upgrade the skillset of the workforce. This approach not only addresses the issue of skilled manpower but also aligns workforce capabilities with technological advancements, enhancing the competitiveness of CMSMEs.

Lowering tariffs and harmonizing non-tariff measures (NTMs) can significantly enhance CMSMEs' competitiveness. Reducing trade barriers simplifies cross-border transactions and reduces the cost of inputs and materials, thereby enhancing the profitability of CMSMEs' involvement in GVCs. Additionally, investment in trade infrastructure, particularly transportation and logistics, can streamline the movement of goods and products within GVCs, making the participation of CMSMEs more efficient and cost-effective.

The liberalization of information and communication technology (ICT) services can empower CMSMEs with access to digital tools and platforms, fostering innovation and global connectivity. Developing advanced logistics services can streamline the movement of goods within GVCs, reducing lead times and costs for CMSMEs. Moreover, ensuring political and policy stability creates an environment conducive to business growth and investment.

Implementation of quality certification programs can substantially enhance product quality, boosting the competitiveness of CMSMEs in global markets. Also, strong enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) safeguards the innovations and intellectual assets of CMSMEs, providing them with a competitive edge.

Last but not the least, implementing these policy recommendations will require a coordinated effort involving government bodies, regulatory agencies, financial institutions, and CMSMEs themselves. A strategic roadmap that identifies clear objectives, timelines, and key performance indicators will be instrumental in driving the successful execution of these policies.

As the sun sets on this write-up of our economic narrative, Bangladesh stands at the crossroads of opportunity and transformation. By embracing these policy recommendations and drawing inspiration from successful programs worldwide, Bangladesh embarks on a journey that promises to unlock its economic potential. It is a journey that holds the promise of driving economic growth, fostering innovation, and creating job opportunities—a saga that propels the nation toward a brighter and more prosperous economic future. The story of Bangladesh, like the CMSMEs it seeks to empower, continues to unfold, with each chapter bringing new hope and promise. *Arju Afrin Kathy, The writer is a Research Associate, Centre on Budget and Policy, University of Dhaka*

Building education to support a skills based economy in Bangladesh

What are the main challenges for education in Bangladesh?

In his *Seven Habits of Highly Effective People*, Covey tells us to begin with an end in mind (Covey, 1989). For education, we have three mutually attainable ends as our starting points: to prepare students for meaningful lives; to help them be successful, life-long learners, and to give students employable skills. In doing so, education has a duty to ensure students are safe, happy and successful.

While Bangladesh has made significant progress in recent years, three key challenges remain. Challenge 1 concerns curriculum relevance and quality. There are high repetition and drop-out rates, with an estimated 4.3 million children out of education, with others in education achieving competitive educational outcomes (source: UN, 2020). Recent moves to adopt a competency-based framework (2021) are to be applauded and will meet the country's need for skilled labour.

Challenge 2 concerns teacher quality. Children suffer a learning loss of around 40% due to poor quality education across eleven years of schooling (Source: World Development Report, 2018). Challenge 3 concerns resourcing. With education spending constrained at around 2% of GDP – much lower than in comparative countries – our infrastructure is dated and overcrowded (Source: World Bank, 2022). Under-resourcing affects attendance. UNICEF estimates that a third of adolescent schoolgirls skip school several days each month on account of hygiene issues (source: UNICEF, 2023) and a lack of appropriate support at school.

We must now build on recent progress with a strategic vision for education, a balance between ambitious aims and attainable solutions. We start with a mission to ensure all educational contexts are safe: a national safeguarding strategy built on standards that mirror the best international practices. We build a skills-based curriculum. Covey reminds us to put first things first. To this end, we invest in early childhood education as a platform for improving literacy and numeracy, particularly in outlying areas of the country.

We ensure all children are tracked on their educational journey and that no child goes unregistered, uneducated, or uncared for. We build a national inclusion strategy, embracing the millions of children in care. All private schools should have a statutory duty to embrace these children by offering fully-funded places to an agreed percentage of orphans.

Let this come from the private sector and let's reform 2017 legislation with a stroke of the pen. Haileybury Bhaluka will take the lead here. We raise the quality of teaching through a network of learning hubs. Our outstanding schools have a duty to share best practices, initiate international partnerships through impact based teaching methods, and subsidise professional improvement in local areas. Haileybury Bhaluka is sponsoring ten schools over the next three years through its international partnership with Evidence Based

How do we compare with the best education systems in the world?

The Organisation for Economic Cooperation and Development tracks the performance of education systems through student outcomes, specifically its Programme for International Student Assessments (PISA). These tests measure the ability in reading, mathematics, and science of 15-year-old students. China, Singapore, Hong Kong, Canada, Estonia and Finland have been topping the charts in recent years. According to the OECD, such high-performing systems share common characteristics. First, they focus on the future, not the present; they focus on critical thinking, creativity and collaboration skills. Second, they believe that all students can learn; it's the task of schools to set high standards for all students but to personalise learning. Third, they get and keep great teachers. With a profession that is hard to enter, there is career progression and sustained professional improvement.

In order to win, we need visionary political leadership and cross-party support for ambitious aims and attainable solutions. Bangladesh has made significant progress in school retention and

completion rates in recent years. Putting the spotlight on tertiary education, we must raise the statutory school leaving age from 14 years and deal with the economic implications of doing so. Easier said than done, with an average of eight percent of income spent on food, requiring children to leave school early and start work prematurely. We must build an expectation that young people will enter university education. This will require an increase in capacity via incentives for inward investment in tertiary education and a transformation towards skills-based education.

In parallel, the importance of international measures of wellbeing. In this year's World Bank ranking, Bangladesh stands at 118/137 (source: World Bank, 2023). The coldest countries have the warmest hearts, with Finland, Denmark and Iceland topping the charts. Finland has topped the chart for six consecutive years and ranks as one of the OECD's highest-performing education systems. High performance and wellbeing are thus mutually attainable aims with mutually beneficial outcomes. *Simon O'Grady is the founding headmaster of Haileybury Bhaluka.*

5G can help bridge the digital divide in Bangladesh by providing broader coverage and bringing digital services and opportunities to all communities

Bangladesh is primed for a 5G-led digital revolution. The country's government has been dedicated to building strong foundations for a knowledge-based, digitised economy to realise the Smart Bangladesh Vision 2041. Through this initiative, Bangladesh has made substantial progress—put to the test during Covid-19 to ensure continuity in critical areas such as smart cities, digital banking (cashless transactions, integrated banking platforms for single users with multiple back accounts, etc.), converged telecommunication infrastructure, healthcare, education, and greener, more efficient utility systems, in addition to facilitating international friendly trade and commerce.

As the country continues to emerge from the pandemic and recover from the global financial situation, Bangladesh's government is refocusing its efforts to realise its vision for Smart Bangladesh in 2041. This is especially important for bridging digital divides nationwide and digitally transforming not just major economic sectors but also the delivery of public services for key government ministries. With the country now redoubling its digital transformation efforts, it is on track to generate new economic opportunities (and enhance existing ones) to bring the nation to a new level of competitiveness. Here, 5G, delivered by communication service providers (CSPs) in Bangladesh, will be instrumental in providing ultra-reliable, high-capacity, and high-speed data connectivity to support this revolution.

Accelerating digitalisation and innovation

Technology-driven changes and revolutions are inevitable. Across the world, digitalisation has been the transforming force pushing the revolutionary envelope for industries, boosting productivity, adaptability and sustainability in our modern world. It has the unmatched capacity to enable businesses, communities and governments of all kinds to leverage advanced technologies and streamlined processes for increased efficiency and growth.

Bangladesh is no stranger to digitalisation's benefits. The country is known for the export of its IT talent, which surged during the pandemic. However, domestically, the country is also achieving gains in areas such as banking, education, healthcare, agriculture, utilities, and transport, among others. Reinforcing these sectors' evolution has been the country's focus on strengthening the

country's broadband and telecommunications infrastructures, as closing the digital divide is imperative for Bangladesh to drive further innovation to achieve its long-term vision.

5G and the digital divide

What is remarkable about Smart Bangladesh's growth journey is the country's sheer resilience. In addition to needing to chart a development plan post-independence in 1971, the country has also needed to grapple with natural disasters and today, the adverse effects of climate change. However, this resilience still requires a boost. For the government to meet its lofty aims for 2041, more needs to be done to close the digital divides that prevail across the country.

One of the biggest challenges is closing the digital gap between urban and rural communities, which is required to foster more inclusive, broad-based transformation. Still, even as the government works to connect the country, it must also consider the affordability of broadband and telecom connectivity, along with improving the speeds required to power current Industry 4.0 technologies and newer innovations in the future.

Here is where 5G will make the difference. For one, it can help bridge the digital divide by providing broader coverage and bringing digital services and opportunities to all communities.

This is because 5G, especially when delivered via fibre, can overcome the limitations of traditional fixed-line infrastructure and provide high-speed, reliable broadband access to underserved regions. This plays a pivotal role in bridging the digital divide by delivering a converged network. Simultaneously, reducing the need for multiple parallel communication infrastructures will significantly reduce asset management costs for the government and CSPs, and these savings can then be passed on to end consumers.

Countries such as Canada and Brazil have exemplified how 5G has helped to bridge the urban-rural digital divide. While Bangladesh has its own unique set of challenges and potential, this still highlights the innate value of 5G in improving technology service access on a nationwide scale.

Setting the stage for Bangladesh's brighter future

While Bangladesh has made significant progress towards realising its digital ambitions, there is still much that it must do to ensure that no one is left behind in its transformation journey. The government is already prioritising broad-based connectivity across the country via the Rural Connectivity Improvement Project (RCIP), but more must be done towards digital inclusion. What is fundamental to achieving Bangladesh Vision 2041 is a good alignment among the regulatory bodies and government ambitions, with very clear and articulative government policies and action plans inclusive of all private and government agencies.

Here, 5G can catalyse longer-term transformation using a multivendor convergence network that provides a single platform of economically viable and sustainable connectivity infrastructure for public and private entities. This is especially true as the country has already deployed a 4G Plus network, which has a transition path to a 5G network to bring connectivity and opportunities to all segments of Bangladesh's industry. The stage is now set for Bangladesh, particularly its CSPs, NTTNs, and ISPs, to work with the country's government, businesses, and communities to foster inclusive growth towards holistic socio-economic prosperity. *Arif Islam is the Country head of Nokia in Bangladesh*

The global economy's real enemy is geopolitics, not protectionism

"The era of free trade seems to be over. How will the world economy fare under protectionism?" This is one of the most common questions I hear nowadays. But the distinction between free trade and protectionism (like the one between markets and the state, or mercantilism and liberalism) is not especially helpful for understanding the global economy. Not only does it misrepresent recent history; but it also misconstrues today's policy transitions and the conditions needed for a healthy global economy.

"Free trade" conjures an image of governments stepping back to allow markets to determine economic outcomes on their own. But any market economy requires rules and regulations – product standards; controls on anticompetitive business conduct; consumer, labour, and environmental safeguards; lender-of-last-resort and financial-stability functions – which are typically promulgated and enforced by governments.

Moreover, when national jurisdictions are linked up through international trade and finance, additional questions arise: Which countries' rules and regulations should take precedence when businesses compete in global markets? Should the rules be designed anew through international treaties and regional or global organisations?

Viewed in this light, it becomes clear that hyper-globalisation – which lasted roughly from the early 1990s until the onset of the Covid-19 pandemic – was not a period of free trade in the traditional sense. The trade agreements signed over the past 30 years were not so much about removing cross-border restrictions on trade and investment as they were about regulatory standards, health and safety rules, investment, banking and finance, intellectual property (IP), labour, the environment, and many other issues that previously lay in the domain of domestic policy.

Nor were these rules neutral. They tended to prioritise the interests of politically connected big businesses, such as international banks, pharmaceutical companies, and multinational corporations, over all else. These businesses not only got better access to markets globally; they also were the primary beneficiaries of special international arbitration procedures to reverse government regulations that reduced their profits.

Similarly, tighter IP rules – which allow pharmaceutical and tech companies to abuse their monopoly positions – were smuggled in under the guise of freer trade. Governments were pushed to free up capital flows, while labour remained trapped behind borders. Climate change and public health were neglected, partly because the hyper-globalisation agenda crowded them out, but also because the creation of public goods in either domain would have undercut business interests.

In recent years, we have witnessed a backlash against these policies, as well as a broad reconsideration of economic priorities more generally. What some decry as protectionism and mercantilism is really a rebalancing toward addressing important national issues such as labour displacement, left-behind regions, the climate transition, and public health. This process is necessary both to heal the social and environmental damage done under hyper-globalisation and to establish a healthier form of globalisation for the future.

US President Joe Biden's industrial policies, green subsidies, and made-in-America provisions are the clearest examples of this reorientation. True, these policies are a source of irritation in Europe, Asia, and the developing world, where they are seen as antithetical to established free-trade rules. But they are also models for those – often in the same countries – seeking alternatives to hyper-globalisation and neoliberalism.

We don't have to go too far back in history to find an analogue to the system that could emerge from these new policies. During the post-1945 Bretton Woods regime, which prevailed in spirit through the early 1980s, governments retained significant autonomy over industrial, regulatory, and financial policies, with many prioritising the health of their domestic economies over global integration. Trade agreements were narrow and weak, placing few constraints on advanced economies, but even fewer on developing countries. Domestic control over short-term capital flows was the norm, rather than the exception.

Despite this more closed global economy (by today's standards), the Bretton Woods era proved conducive to significant economic and social progress. Advanced economies experienced decades of rapid economic growth and relative socioeconomic equality until the second half of the 1970s.

Among low-income countries, those that adopted effective development strategies – such as the East Asian Tigers – grew by leaps and bounds, even though their exports faced much higher barriers than do developing countries today. When China joined the world economy with great success after the 1980s, it did so on its own terms, maintaining subsidies, state ownership, currency management, capital controls, and other policies more reminiscent of Bretton Woods than of hyper-globalisation.

The legacy of the Bretton Woods regime should give pause to those who believe that permitting countries greater leeway to pursue their own policies is necessarily detrimental to the global economy. Ensuring one's own domestic economic health is the most important thing a country can do for others.

Of course, historical precedent does not guarantee that the new policy agendas will give rise to a benign global economic order. The Bretton Woods regime operated in the context of the Cold War, when the West's economic relations with the Soviet Union were minimal and the Soviet bloc had only a small foothold in the global economy. As a result, geopolitical competition did not derail the expansion of trade and long-term investment.

The situation today is entirely different. America's main rival now is China, which occupies a very large position in the world economy. A true decoupling between the West and China would have major repercussions for the entire world, including the advanced economies, owing to their heavy dependence on China for industrial supplies. One therefore can find plenty of good reasons to worry about the future health of the world economy.

But if the global economy does become inhospitable, it will be because of American and Chinese mismanagement of their geopolitical competition, not because of any supposed betrayal of "free trade." Policymakers and commentators must remain focused on the risk that really matters. Dani Rodrik, Professor of International Political Economy at Harvard Kennedy School.

Bangladesh in G20 summit: Unlocking new doors?

Bangladesh is scheduled to join this year's G20 summit, being held on 9-10 September. With India at the helm of the G20, Bangladesh's participation in the summit brings forth a host of opportunities. Bangladesh has garnered praise for its advocacy on behalf of the global South, its focus on climate change issues, and its commitment to women's development.

These issues hold a prominent place on the G20 summit agenda, making Bangladesh's inclusion noteworthy and allowing the country to enhance its credentials in these areas. The summit also offers Bangladesh the opportunity to engage with non-traditional partners, achieve diplomatic breakthroughs, and alleviate diplomatic tensions.

Explaining Bangladesh's inclusion in the G20 Summit

The invitation to the G20 is a customary process, with the host country responsible for selecting guest countries. This outreach aims to expand cooperation with other nations and bolster the G20's legitimacy. In this context, Bangladesh has been included as an invitee for the upcoming G20 summit in September 2023.

Bangladesh's membership in the G20 summit carries symbolic significance and can be explained on multiple grounds. Firstly, from an economic perspective, Bangladesh holds the position of India's largest trading partner and export market in South Asia. Given Bangladesh's burgeoning economic growth, it offers substantial potential for India.

Secondly, in terms of geostrategic considerations, Bangladesh's proximity to India's landlocked northeastern states reduces connectivity constraints. Additionally, Bangladesh remains committed to security issues important to India, with its "zero-tolerance" policy towards terrorism assisting in addressing secessionist movements in India's northeast.

Thirdly, in the context of connectivity, Bangladesh's strategic location at the juncture of South and Southeast Asia makes it a crucial component of India's Act East policy.

Considering Dhaka's multifaceted importance to India, Bangladesh has been invited as a symbolic gesture, signifying its rising significance to India and the broader region. As India seeks to shape a global agenda through the G20, securing Bangladesh's support is essential for enhancing India's influence in its neighbourhood. Moreover, this invitation bestows symbolic recognition on Bangladesh, further enhancing bilateral dynamics.

Hence, with India leading the G20, Bangladesh's most expedient bilateral opportunity lies in deepening its partnership with one of the "premier forums" for international economic cooperation. Engagement with the G20 can unlock short-term, medium-term, and long-term benefits for Bangladesh.

Watershed moments

The Global South is currently grappling with numerous crises stemming from prolonged exploitation by Western colonial powers, the Cold War's tense standoff, and the persistent dominance of global geopolitics. The Ukraine-Russia conflict has further exacerbated tensions between opposing global camps and limited the space for the Global South.

The status quo in global geopolitics has been rocked by severe crises, including the Covid-19 pandemic and the ongoing conflict in Ukraine. These crises have disrupted global geopolitics and presented challenges such as energy and food security, technology transfer, climate change, and energy transition. The Global South has borne the brunt of power rivalries among major nations.

As a prominent leader of the Global South, India has the potential to advocate for the multitude of challenges facing these countries. On critical issues like energy transition and climate change, India can take a strong stance in support of the Global South's interests.

Bangladesh, too, has consistently promoted the interests of the Global South on various occasions. As a champion of developing nations, Bangladesh can use this platform to advocate for third-world countries.

In the context of the Ukraine-Russia conflict and associated geopolitical issues, Bangladesh has maintained a neutral stance in the polarising global political landscape. Bangladesh has been squeezed by great power politics, and the war, along with subsequent food and energy security concerns, has taken a toll on the country. Therefore, this platform allows Bangladesh to express its dissatisfaction with the dividing world order and provides a space for fostering an alternative world order.

Tapping into multilateral opportunities

Bangladesh can achieve significant gains within the G20 by articulating its vision for the future global order and its perspectives on the myriad issues on this year's G20 summit agenda. The G20 summit emphasises cooperation on a range of issues, including green development, climate finance and LiFE, accelerated, inclusive, and resilient growth, accelerating progress on the SDGs, technological transformation and digital public infrastructure, and women-led development.

In the context of green development and climate finance, Bangladesh is considered a key stakeholder due to its vulnerability as a country. In the past, Bangladesh has represented the interests of climate-vulnerable nations in multilateral forums such as the COP and vigorously advocated for their rights.

Therefore, the inclusion of Bangladesh's perspective will further enhance its credibility on climate-related issues. Given that the summit focuses on inclusive and resilient growth, Bangladesh serves as a paradigm for fostering an inclusive economy that benefits various segments of society, including marginalised groups. Furthermore, Bangladesh's economy demonstrated resilience by registering positive growth even during the Covid-19 pandemic, reinforcing its relevance to these issues.

In terms of women-led development, Bangladesh's achievements in promoting women's development and integrating women into the development process will significantly enrich the discussion and deliberation process. Bangladesh's stake in the issues featured on the agenda will allow the country to contribute its viewpoints, making the forum more representative and comprehensive.

Moreover, with the wide range of participants at the G20 summit, Bangladesh can establish connections with non-traditional partners. Given recent strains in bilateral relations between Bangladesh and the United States, engaging in sideline diplomacy with the US and India could significantly improve bilateral affairs. Therefore, the G20 provides Bangladesh with a platform for forging bilateral partnerships, engaging in advocacy efforts, and reinforcing its credentials as a leader in the Global South. *Kazi Asszad Hossan is a researcher affiliated with the Central Foundation for International and Strategic Studies (CFISS).*

Towards a secure future for all Bangladeshis

With Bangladesh on the cusp of graduating from a least developed country while simultaneously facing unprecedented challenges in the current volatile global climate, much has been made of our need to have safety nets for our population in the future. To that end, the recently initiated universal pension scheme by the government was rightfully highlighted as a positive step.

And it is now encouraging to see the scheme pick up momentum; one month after its launch, the universal pension scheme has garnered the enrollment of nearly 13,000 people depositing nearly Tk8 crore.

The National Pension Authority (NPA) has stressed the need to enhance public awareness in both rural and urban areas - and this must not be taken lightly. More Bangladeshis have to be made aware of the various benefits such a scheme offers them.

First and foremost, the universal pension plan will provide a safety net for our aging population. In a society where the concept of retirement often means dependence on family or limited social support, this pension plan offers a dignified way for the elderly to enjoy their golden years with financial security.

This initiative will also encourage a culture of saving and financial planning, which is crucial for economic development. By knowing that they have a secure pension waiting for them in their retirement years, individuals are more likely to invest in their future, both financially and in terms of healthcare and well-being.

It's important to note that the successful implementation of such a program requires careful planning and prudent management of resources. Ensuring transparency, accountability, and efficient distribution of funds is the very minimum required for the plan's success.

With responsible implementation and continuous evaluation, not to mention public awareness, this initiative has the potential to transform our nation for the better, bringing us one step closer to a brighter and more secure future.

As democracies weaken, who gets a say in South Asia's climate future?

As the world confronts the impacts of climate change, the role of the state is more prominent than ever. The state sets national climate policies and carbon reduction targets, and represents its citizenry at global climate summits. It plays a critical role in sectors, from infrastructure to agriculture, which both drive and suffer the impacts of climate change. Its decisions affect the extent to which entire populations suffer from rising temperatures.

But in many countries, these life-altering decisions are made by a small group of politicians and bureaucrats, as opposed to through consensus building in parliament and the press. This is especially true for South Asia, where countries are increasingly moving towards an opaque decision-making model.

This means that the people most impacted by the effects of climate change have no say over how they are dealt with. As tides get higher due to sea level rise, no one asks local residents if building yet another sea wall is a good idea; if they did, the community would point to other sea walls that have been topped and broken. In the Himalayas, policymakers see building more dams as a solution to uncertainty over water availability, but do not ask residents downstream how that will affect the springs they depend on.

Bangladesh's black box of decision-making

In Bangladesh, one of the most climate-impacted countries in the world, this trend is readily apparent. The country is currently witnessing a series of demonstrations, as the main opposition party demands that forthcoming elections be held under a caretaker government, as they do not trust the ruling party to follow democratic norms.

The ruling party responds that elections worldwide are held under the incumbent government. This impasse, which is threatening the credibility of the country's electoral process, stems from a system in which ministers and bureaucrats announce decisions that everyone is expected to follow without question. Even seemingly positive decisions are made in this manner. In 2020, Bangladesh's then-minister of power, energy and mineral resources raised hopes when he said that the country was "reviewing how we can move from coal-based power plants." But leaders of think tanks and NGOs often consulted by policymakers in Bangladesh expressed ignorance about the decision before it was announced.

"It's alright if the minister makes a good announcement without consulting anyone outside the government," said the head of a Bangladesh-based think tank, who spoke on condition of anonymity. "But if we don't know the details of the transition plan, we can't hold the government to account. That's the problem."

Opacity in government decision-making often worsens when elections are in the offing, as they now are in Bangladesh. The media in the country is focused almost entirely on electoral prospects, protests and violence. Almost no one is asking politicians about climate goals.

The realities of climate change, water scarcity and pollution remain. But discussion of government plans to tackle these issues are scarce, as are campaign promises from either the ruling and opposition parties on climate. The little discussion that does occur is perfunctory. In drawing up the Bangladesh Delta Plan 2100, which is intended to make the delta more resilient to the impacts of climate change, the government did seek the input of NGOs and think tanks.

But many complained they did not get to see the draft plan before it was finalized. The plan envisages fundamental changes in large parts of the country, but was formulated and is now being implemented without much public discussion.

Despite green pronouncements, little consultation in Pakistan

Pakistan is the only country in South Asia with a federal ministry dedicated to dealing with the challenges of climate change. After the devastating floods of 2022, the government made a point to tell the world that the disaster was an impact of climate change, and what had happened in Pakistan was not going to stay confined to Pakistan. The many climate change-induced disasters throughout the world in the first eight months of 2023 have borne out the truth of this assertion. But in Pakistan itself, dealing with climate change is at a standstill due to a prolonged political slugfest that shows no sign of abating.

While public attention is focused on the political crisis, projects are sanctioned behind closed doors and implemented despite protests. The new expressway that threatens Karachi's largest green space is one example. And when solar power generation plants are built in the Thar desert near coal-fired plants, there is near-zero consultation with local communities -- and very little response when civil society members press for information.

Despite green pronouncements from past and present governments, coal-fired power plants continue to play a large role in the China Pakistan Economic Corridor, an area where public consultation has always been zero. Journalists seeking details of CPEC projects have repeatedly been confronted with a wall of silence.

In India, climate injustice takes the blame

India as a country has high carbon emissions, but per capita emissions are low. When India's ministers speak about emissions in public, they emphasize climate injustice, and point to how rich nations have spent most of the world's 'carbon budget' since the start of the Industrial Age -- using this to argue that India should not be forced to decarbonize rapidly. This is an argument both valid and popular. It has support from politicians, bureaucrats, and most think tanks in the country. But it has two adverse effects. One, it leads to a perception that reining in greenhouse gas emissions is a job only for the developed world. Two, it enables policymakers to hide their own shortcomings.

In the last few weeks, two Himalayan states -- Himachal Pradesh and Uttarakhand -- have suffered immense losses to life and property from flooding caused by repeated cloudbursts, a phenomenon scientists have linked to climate change. The same has been seen along the Western Ghats in Maharashtra.

At the same time, India experienced the lowest August rainfall since records began. This will impact agriculture in the coming months, and food prices may skyrocket. India's politicians repeatedly blame these problems on climate change caused by rich countries. But this line of argument lets them evade uncomfortable questions, such as why dams were built on steep mountain slopes despite opposition from residents and independent experts; why specific guidelines on how to build roads in mountain areas were ignored; or why building rules are flouted everywhere with impunity.

This all comes back to a lack of participatory democracy in policymaking. India does have rules that mandate public discussion before large infrastructure projects can be approved, but there are plenty of examples to indicate that these rules are routinely flouted. For far too long, politicians in India have conveniently interpreted democracy as a system in which citizens vote once every

five years, while the people voted into power run the country by themselves till the next election. The corollary they propound is that if people do not like what the government is doing, they can vote the government out of power next time. But climate change impacts are coming so fast and hard that they do not permit the luxury of waiting till the next election. They need to be tackled here and now, with the full participation of every section of society. *Joydeep Gupta is Editor-at-Large at The Third Pole. A version of this article first appeared on The Third Pole and is being published here under the Creative Commons BY NC ND license.*

Insurance protection for Smart Bangladesh

Bangladesh's insurance sector has unlimited possibilities for development and growth. The basic role of insurance is managing the risks and also protecting the economy for the country's growth and prosperity. At present, 81 insurance companies operate their activities in Bangladesh. This includes 35 Life Insurance and 46 Non-life Insurance. The contribution of insurance companies to the GDP of Bangladesh is less than one percent (currently is about 0.50 per cent). An increase in the penetration rate can create widespread benefits and protection for the economy and it is estimated that 1 per cent increase in Bangladesh's insurance penetration rate can reduce uninsured losses and markedly contribute to its GDP growth. According to world bank statistics, out of 1000 people only 4 people in Bangladesh have Life Insurance policies which is one of the lowest country penetrations in the world. Even for the Non-life Insurance has a negligible contribution. Currently the government has put emphasis on this very high potential of insurance business. We, working in the sector, are also very optimistic that the government has taken various initiatives with priority and understood the necessity of the insurance industry and brought it under the Ministry of Finance which was earlier under the Ministry of Commerce. The Parliament passed "The Insurance ACT, 2010" and "The Insurance Development & Regulatory Authority (IDRA)" was formed under this act during the Year 2011. The Authority is working for systematic development and regulations for the insurance industry with a view to implement "The National Insurance Policy 2014". In this priority, the Government has announced "The National Insurance Day" to be celebrated on First March in every Year.

Bangladesh sees its future planning with a vision and policy to build a digitally enabled, smarter, and more sustainable country. It aims to leverage the power of technology to improve the quality of life for all citizens, create new economic opportunities, and drive sustainable development. Building Smart Bangladesh by 2041, will be achieved by establishing Smart Citizen, Smart Economy, Smart Society, and Smart Government by 2041. "Smart Bangladesh" focuses on the use of technology and innovative approaches to improve the lives of people and the overall development of the country. The use of advanced technologies, such as the Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), and data analytics are the key transformation to improve various aspects of society, such as healthcare, education, transportation, and governance. Insurance protection for this uptrend growing economy cannot be ignored.

In a recent paper published "Smart Bangladesh Vision 2041: All you need to Explore" describes the initiatives of Smart Bangladesh. It explains that there are a number of initiatives and projects underway in Bangladesh that are aimed at promoting the use of technology and innovation to drive development. These include initiatives in the areas of e-governance, healthcare, education, and transportation, among others. By leveraging the power of technology and innovation, it is hoped that Bangladesh can become a leader in the region and a model for other countries looking to

promote sustainable development and progress through the use of technology. The initiatives are as follows:

- Expanding access to affordable and reliable broadband internet;
- Promoting digital literacy and skills development;
- Encouraging the use of ICT in various sectors;
- Building smart cities and smart villages;
- Developing a digital infrastructure;
- Promoting innovation and entrepreneurship.

The government plays a critical role in promoting Smart Bangladesh. It is responsible for creating a conducive environment for the development of the digital ecosystem and providing citizens with access to digital services and technologies. The government is also responsible for promoting the growth of the IT industry and investing in human capital development. The future of Smart Bangladesh is promising. With a comprehensive digital ecosystem in place, the country is poised to become a leader in the digital space and reap the benefits of technology to drive economic growth and improve the quality of life for citizens. The government's commitment to the vision of Smart Bangladesh, combined with the efforts of private sector companies and citizens, will help the country achieve its goal of becoming a technologically advanced and digitally savvy nation in the global family. And these efforts will be unaccomplished without the protection of Insurance that is seen as basic in the developed countries.

In modern period people use insurance products such as motor insurance, travel insurance, property insurance, medical insurance and various protection under life insurance plans. All life and non-life insurance plans always save people, property, life and health. All insurance types protect people from risk and loss. Insurance sector plays great role in increasing GDP. All premiums collecting by insurance companies effect economic development positively. Besides Insurance effects to balance of payments, financial stability positively and it also increases employment in economy. These factors also accelerate economic growth. For these reasons insurance role in world economy is undeniable, and it considered reliable field of service sector.

Insurance that plays a fundamental protection role in economic development can enable and drive economic activity by protecting lives and property against insurable risks and these are currently found mostly unprotected. In this pace of growth, Insurance companies in Bangladesh have to act as a buffer against adverse events and risks as the invisible glue for protecting the loss of Individuals and Country's valuable asset. Supporting the promise of Smart Bangladesh, Insurance Companies can take the advantages of Technology and changing Business Process for setting the milestones for the Smart Services. It can take proactive initiatives for inclusion of Technology with customer centric smart approach for a wide range protection for country's economy with the following:

- Development of IT infrastructure / Adaptation of new IT system;
- Prepare one-stop Digital Platform / Apps / Customized Web-page Solution;
- Digital Sales / Enrollment of Insurances Plans;
- Digital Risk Assessment / Underwriting;
- Digital Serving and Claim Submission;
- Digital Settlement and Payment through Digital Channels/BFTN (Online Fund Transfer);
- Digital Marketing strategy and Training development for the Agents / Financial Associates;

Bangladesh is always seen as a country of uncertainty or disaster, causing from economic crisis to climate changes or natural calamities, losses of property or lives, creating vulnerability for people and economy where we totally depend on Government support system. Although, Insurance is the only means to recover from the economic losses that is largely missing in Bangladesh's economic system and this is due to weak Insurance Protection system. Combining the Smart approaches from Government and Insurance Companies, Bangladesh can ensure the insurance protection of its Citizen, Economy, Society and Government. Insurance companies now foresee the ample opportunities for its growth with the support of digitalization and can ensure the protection of the People and the Economy. We understand that the country has made significant strides in recent years, and its government is now focusing on creating a "Smart" Bangladesh that can compete on the international stage. In its smart approaches, Bangladesh is investing in new technologies and infrastructure, improving education and training, and promoting entrepreneurship. With its large population and limited resources, it is now important for the country to ensure safety-net with insurance protection in order to progress economically. Investing in insurance protection for its people and infrastructure, Bangladesh can fulfill its dream to become a leading nation in the world.

S M Ziaul Hoque, FLMI, The writer is the CEO of Chartered Life Insurance Company Ltd.

আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করুন | চাকরি প্রস্তুতির ফ্রি ফাইলস সংগ্রহ করুন



RESEPHS CAREER CARE

© দিবনির্দেশনা ©

অবশ্যই দেখতে হবে... [ফোকাস রাইটিং / আর্গুমেন্ট রাইটিং]

- Earthquake management: How equipped is Bangladesh to combat catastrophe?
- Artificial Intelligence / (ChatGPT) / AI in Banking Sector

বাংলা/ইংরেজিতে লিখতে... ধারণা রাখা উচিত... [ফোকাস রাইটিং]

- Pollution
- Smart Bangladesh
- Metro Rail Service in Dhaka city/মেট্রোরেলের যুগে বাংলাদেশ
- ভাষা আন্দোলন ও একুশের চেতনা
- Paperless Bangladesh /Cashless Society
- আর্থিক খাতের অগ্রযাত্রায় ব্যাংক খাত
- MFS Role and Services in BD
- Cyber Security in banking sector
- অর্থনৈতিক সংকটে নতুন মুদ্রানীতি/ Monetary Policy
- Renewable energy and its role to Combat energy crisis.
- Blue Economy and Bangladesh
- FDI in Bangladesh:How to attract foreign investment
- Climate disaster and Bangladesh
- Russia Ukraine War and World Crisis;Future,way of mitigate War
- World Economic Crisis and Bangladesh challenges

শব্দ গুলো জেনে নেয়া জরুরী [অনুবাদ/প্যাসেজ]

- Artificial Intelligence বিষয়ক শব্দ।
- ভাষা আন্দোলন ও একুশের চেতনা বিষয়ক শব্দ।
- মেট্রোরেলের যুগে বাংলাদেশ বিষয়ক শব্দ।
- অর্থনীতি, ব্যাংক, উন্নয়ন ও বাণিজ্য বিষয়ক শব্দ।

শর্ট জিকে

- Abbreviation/Banking Term বিগত ৩ মাসের সাম্প্রতিক প্রশ্নঃ প্রফেসর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, আলোচিত ব্যক্তি বিখ্যাত বই, অর্থনৈতিক সমীক্ষা,বিবিএস রিপোর্ট, ব্যাংক খাতের বিভিন্ন মান,শেয়ারবাজার, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভৌগলিক বিষয়সমূহ [বিখ্যাত স্থান], খেলাধুলা ২০২২ (টেনিস,ক্রিকেট,ফুটবল, বিপিএল), পুরস্কার (দেশী বা আন্তর্জাতিক), বিভিন্ন দেশের মুদ্রা,সেঞ্চাল ব্যাংক, রাজধানী, অর্থনৈতিক সংগঠন, সম্মেলন।

ম্যাথ

- bibm এর বিগত ম্যাথ। অধ্যয়ঃ profit and loss, Unitary Method, percentage, Train and Boat, Algebra, Equation, Geometry and trigonometry, Mensuration

Artificial Intelligence: Bangladesh Perspective

Enterprises are seeing a lot of potential in automation of their processes but it will have a negative impact on employment.

What is Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence (AI) is an agent that is able to perform tasks that would require human intelligence. Examples of these tasks are visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages. AI has revolutionised the information technology. It is a sub-field of computer science that includes the creation of intelligent machines and software that work and react like human beings. Artificial Intelligence is transforming the nature of almost everything which is connected to human life, e.g. employment, economy, communication, warfare, privacy, security, ethics, healthcare etc. However, we are not sure about its impacts and we are yet to see its future evolution – if it is leading humanity towards making this planet a better place to live or a place which is full of disaster.

Current State of AI

If we look at the current state of AI, the pace of evolution of artificial intelligence is speeding up. Artificial Intelligence is not new, it was first coined by American scientist John McCarthy in 1955, who is also considered co-founder of the field Artificial Intelligence [1]. So research in the field of AI has been there for decades, but the conditions were not appropriate for AI to flourish. Nowadays, we have cloud computing to store torrents of data remotely. Moreover, neural network technology, which is crucial in learning, is not that expensive these days. Given the facts, conditions for AI are right now. Even the largest companies in tech-industry, e.g. Google, Facebook, Microsoft and IBM, have dived into AI research where they see a huge potential.

Application of AI in Industry

As AI research is progressing with a fast pace, a lot of companies are looking forward to utilising its power to improve their services (Fig.1) [1]. The largest US retail company, Walmart, is trying to build robotic shopping carts, while Amazon is developing robots for its fulfilment centres that will serve the delivery between stackers and pickers. The automobile industry is investing a vast amount of money to embed AI into cars. In fact, Tesla Motors has already introduced AI into their cars which enable auto-pilot mode and other lane changing features.

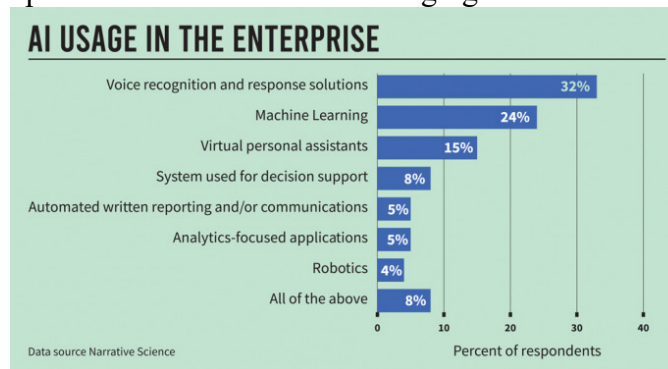


Fig.1: Applications of Artificial Intelligence

Toyota is investing billions of dollars to combine Artificial Intelligence with Big Data to facilitate mobility assistance driving for people who are less confident to drive. It is a big opportunity for the industries who are leaders in AI to build self-driving cars. Hence, the tech giants Google and Apple are investing a huge amount of money to dive into this market.

Google has recently launched an open-source version of its Artificial Intelligence engine named TensorFlow. Google uses this engine in various product and services. Now researchers outside of Google are using this engine to test their algorithms, since there is a huge potential in this technology to be used at various commercial levels (Fig.2).

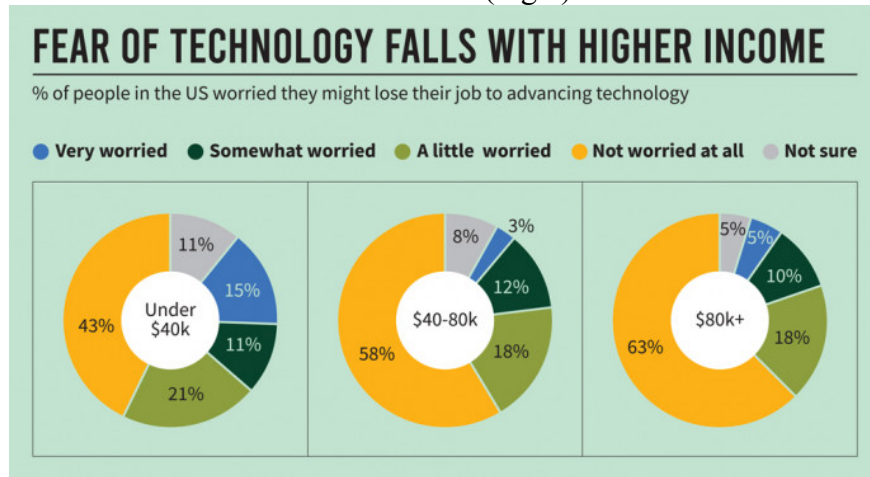


Fig.2: Usage of AI technology in Enterprise [2]

Thus, enterprises are seeing a lot of potential in automation of their processes but it will have a negative impact on employment. Fig.3 below statically explains the impact of technology on employment:

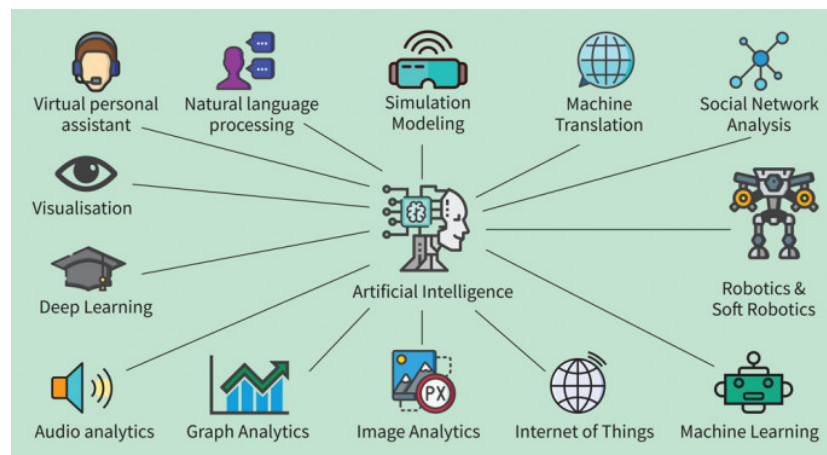


Fig.3: Percentage of people who are afraid of technical advancements [3]

Future of AI

The next steps in AI mostly include generalising the intelligence and creating as many use cases as possible, which eventually can be converged into Human-Level Machine Intelligence (HLMI). OpenAI wants to further advance AI in a way that benefits society as a whole and is freed from

the need of generating revenues. As OpenAI has already made its reinforcement learning framework public, it will create possibilities for other companies to create different use cases and contribute to the AI research as an open source project.

Other companies have also started to make use of AI technology into different domains. One such example is Turing Robot, a Chinese company which is behind the HTC's Hidi, a voice assistant. Turing Robot offers voice recognition and natural language processing for a wide variety of applications including Bosch's car system and Haier's home appliances. Now Turing Robot is focused on developing Turing OS for service bots.

Another use case is being developed by Amazon, which is working on developing Alexa in the direction of recognising emotions. Amazon is making significant advancements in Alexa – which is a virtual helper which sits inside the voice-controlled appliances offered by Amazon. While people get irritated from the repeatedly wrong response from voice assistances like Google Now, Siri, Hidi etc., Amazon focuses on emotion recognition from the voice tone and enable voice assistance to offer an apology for a wrong response.

Similarly, a Silicon Valley based company named Vicarious is developing an entirely a new way of information processing akin to the information flow in human brain which they believe to help machines to become a lot smarter.

Toyota is developing a system which will predict where you are going before you tell it. Toyota has recently announced its new subsidiary named Toyota Connect which will facilitate to collect torrents of data every day and the battle to mine the data already been started. Thus, in the future, your AI will know more about you than you do. A start-up called Brain of Things is developing a smart home which they named 'robot home'. These robot houses keep an eye on each activity of the inhabitants - whether they are watching a movie, sleeping or doing something else. There are lots of advancements made in different domains all using AI technology while developing it further in parallel to achieving their desired results [4].

Artificial Intelligence: Bangladesh Perspective

Bangladesh is a country of 160 million people and this is one of the most densely populated countries in the world. It is an agriculture driven country where new wave of recently developed technologies has touched its various areas and getting new propulsion. In different industrial areas, automation and control technologies are being applied. Only very recently the term AI along with IoT, Big Data, Blockchain etc. has become very popular in Bangladesh. The technological evolution of AI started long time ago, but its impacts are being revealed now in our country. Some specific sectors, such as services, transportation, education, agriculture, health, and environment, have been identified for effective implementation of AI in Bangladesh. As a whole, we see tremendous use of AI technologies, for instance, using ride-sharing, natural language processing (NLP) for Bangla, ChatBot, booking flight and hotel, real time mapping, etc in our day to day life, making our daily-life comfortable. Bangladesh possesses 34% of young people who are technology driven; the successful integration of AI with the existing strategy holds a huge prospect for future development of the country.

Legal Policy Framework for using AI In order to maintain some certain issues like ethics, data privacy, security, and regulations, and in case of using AI technology, the following steps might be followed:

- We need to define how we are going to use AI as well as when and where it will be used. However, if we reach that point in the future, it is really important to have a centralised global governing body which lays down the framework for prioritising the positive outcome over its own interest;
- Initiatives like 'One hundred years study of Artificial Intelligence' by Stanford University is necessary to carry out long-term analysis of AI development which will help us to figure out long term harm which AI might bring to society; [5]
- Build a system of checks and balances with several AIs, so that they can check on each other and, as a whole, can act as dependency network for decision making; [6]
- We certainly need an ethics charter for the further development of robotic research and we need to set up operational ethics committees for robotic research advancements;
- Public bodies have to speed up for decision making about the growth of technological advancements and the challenges of the impact of AI on employment and economy.

Conclusion

- In the context of Artificial Intelligence, it is very difficult now to predict the future of humanity. We can accept AI as a new technology, but it should bring positive impacts for the welfare of the society and humanity. An outstanding technology can exhibit positive impacts on society along with its severely negative impacts too. While applying this new technology, we have to be ready to face consequences of the negative effects too. Regarding this, we certainly need a legal policy framework to mitigate the challenges associated with AI and compensate the affected parties in case of a fatal error so that the serious threat to humanity could be minimized.

The writer is the chairman of the Department of Robotics and Mechatronics Engineering at the University of Dhaka

Artificial Intelligence: Bangladesh Perspective

Although the use of Artificial Intelligence (AI) has become widespread in many developed countries it is yet to take off in a big way in Bangladesh. Most experts believe that it is necessary to take advantage of the immense potential of using artificial intelligence in different sectors but we should also be aware of the negativity of artificial intelligence. Overcoming the fear of artificial intelligence and ensuring its utilisation requires creating opportunities for the positive use of artificial intelligence for all. This requires the active participation of stakeholders at all levels.

The demand for connectivity will further increase in the coming years to prevent any pandemics. High-speed fiber optic-based connectivity needs to be increased instead of conventional technology. To ensure social distance, the application of Artificial Intelligence (AI) and Big Data will increase in the areas of telemedicine services, distance learning, online training, epidemiology, the listing of social security recipients, etc.

Bangladesh also needs to increase the capacity of telecommunication networks to meet the growing demand for e-commerce, outsourcing, freelancing, video streaming and social media. In the current global situation, the 5-G network is the demand of time. Already there are plans to launch 5-G technology in Bangladesh. For 5G, telecom officials need to be made efficient and capable. Bangladesh must be at the forefront of implementing SDGs in a changed life system through the proper application of information technology through the concerted efforts of all.

To compete in the global arena of artificial intelligence, it is necessary to emphasize the preparation of infrastructure that supports the technological environment of Bangladesh. There are a few things to look for in developing artificial intelligence in Bangladesh but for that we must have the necessary hardware and systems. Till 2000 we have developed machine learning which is run with CPU (Central Processing Unit). But now we have to pay more attention to the graphics processing unit or GPU. Ensuring improved GPU will bring more capability in machine learning.

Facebook's artificial intelligence skills are good for face detection, Google in spam image detection. But thousands of images, that is, thousands of data, are needed to enable artificial intelligence for this detection. Since Google and Facebook users are all over the world, their data numbers are high. That is why their artificial intelligence is more capable. The youth of Bangladesh are curious about artificial intelligence, the concerned people think that there is an opportunity to use artificial intelligence positively for the progress of the country through these curious youth.

The percentage of agricultural workers in Bangladesh is nearly half the total population. But agricultural work still depends on nature and the traditional method of using fertilizer and pesticides. There is also a great potential for using artificial intelligence in diagnosing crop diseases, soil conditions and weather behavior. The number of doctors for 160 million people in the country is only about 90,000. Here we must increase the use of technology. Moreover, artificial intelligence can be a reliable way to reduce system losses in the industrial sector.

Acknowledging the global concern that the use of artificial intelligence in almost all areas and excessive reliance on machine robots could lead to human unemployment, focus should be on the positive use of artificial intelligence.

Many developing countries use artificial intelligence as a way to reduce physical labour of humans and replace it through knowledge-based labour. Artificial intelligence is already working on various scales in well-known business organisations around the world. If Bangladesh backs away from artificial intelligence for fear of unemployment, it may fall behind the rest of the world. This advancement in technology is likely to reduce the number of manual laborers, as well as expand the field of knowledge-based labor.

Technology like artificial intelligence is all around us without our knowledge, in a word, it can be said that 'technology is being taught to make decisions like human beings.' People need it. For example, in the healthcare system robots will be used to provide proper service to patients and thus reduce human error. Artificial intelligence is being used in simulating 'Drug Discovery' without using the drug on the patient.

Today, the technology behind the vaccine and other medicines of 'Covid-19' is not unknown to anyone. Otherwise, it would have taken much more time to come up with those. Governments in developed countries are using artificial intelligence regarding urban planning, mass transit systems, river diversion, early flood detection, proper distribution and use of government resources and traffic management. Artificial intelligence is being used in scores of such areas.

In addition to the use of this artificial intelligence in wargaming, an idea for the use of this technology in the military has come to the United States, as the 'Third Offset Strategy. In 2016, the Pentagon spent 2 billion on the use of artificial intelligence. The thing is, we may not be able to guess how this is happening - but everything around us is changing under the influence of this artificial intelligence.

Whether we like it or not - artificial intelligence is ingrained in everything. As we have seen - from healthcare to government work, to the transportation industry - to education - artificial intelligence is making everything easy for those who want to do it. A great deal of power is indeed coming into the hands of the people - very few people understand that.

Machine learning is needed at the beginning of artificial intelligence. The part of artificial intelligence that is machine learning is the process of giving intelligence to the machine. There is a huge movement going on in the world with AI for social good by using data in human work. It is good to know about machine learning because its use is going on in every sector. Artificial intelligence is a present and future skill set. From time to time, we get some intelligent behavior from the animals around us. The fact is that since the animal is following something on the human scale, we call it an intelligent animal. The thing is that he is behaving like a human being, but if he does something like that, it can be said to be intelligent on its scale. The intelligence that exists in a thing is revealed in the outcome of its work or its use. However, the origin of this intelligence is in the head of us or animals. We do not yet know much about how this intelligence is working in our heads or because we cannot see directly the processes that make them work. We know that things happen with electronic pulses inside the neurons of the head, but its 'internal' things are still unknown to us.

There is a lot of talks now about artificial intelligence and attempts to replace human intelligence and thinking power with machines. All of us are familiar with robots such as animal or man-made devices that are computer-controlled automatic systems. People can work exactly the way they work. These devices cannot create and express advanced thoughts or feelings like humans. It cannot go beyond artificial intelligence and robotic computers. In the same way, like human beings, they cannot conclude by using conjecture and sixth sense.

Hiren Pandit

Earthquake management: How equipped is Bangladesh to combat catastrophe?

About 56.26% of buildings in Dhaka are at high risk and 36.87% at moderate risk of damage from an earthquake of magnitude 4 or higher, says a recent study. Experts fear that a major earthquake could cripple Bangladesh's disaster response capability and make rebuilding efforts an even more monumental task.

They urged to demolish buildings that do not comply with the building code, as collapsed structures would serve as severe impediments to road movement, and to centralize disaster management systems. Given Bangladesh's coastal location, there is also a risk of tsunamis from earthquakes with magnitude 7 or greater on the Richter scale.

However, Ministry of Disaster Management and Relief Secretary Md Kamrul Hasan told Dhaka Tribune the country currently has adequate rescue equipment and skilled manpower to carry out post-earthquake rescue operations. “We have also given priority to maintaining the national building code,” he added. When contacted, Director General of Disaster Management Department Mizanur Rahman said the government has given instructions to demolish high-risk buildings that do not comply with the national building code, but the directive is yet to be implemented due to a lack of manpower, time, and ground-level issues.

He further said they have already purchased earthquake evacuation equipment and stored in under Fire Service and Civil Defense, while two rescue helicopters are now used by the Bangladesh Air force. Neither official could give exact figures on how much manpower and equipment was available. Under the Directorate of Disaster Management, the third phase of a project for procurement of equipment for search, rescue operations and emergency communication in earthquakes and other disasters is underway.

The total cost of the project stands at Tk2,276 crore. The three-year project will end in October this year. Equipment purchased under the project will be distributed among 10 institutions, including Fire Service and Civil Defense, the Arms Forces, Navy, Coast Guard, CPP, Red Crescent, police, RAB, and Border Guard Bangladesh.

The equipment includes flame retardant vests, raincoats, hard hats, gum boots, life jackets, as well as primary treatment and personal safety gear. Project Director Joint Secretary Kazi Safiqul Alam said: “We are not as well equipped as other developing countries to beat post-earthquake situations.” In 2016, the government signed an agreement with China to build a National Operations Centre for disaster response in Tejgaon. The centre is to be built with financial and technical assistance from China, but the survey for the project is yet to be completed.

Risky buildings

According to a recent study by the Housing and Building Research Institute (HBRI), about 56.26% of buildings in the capital are at high risk and 36.87% at moderate risk of damage from an earthquake of magnitude 4 or higher.

Up to 80% of the buildings may collapse if earthquakes the same size as the recent ones in Turkey and Syria hit Bangladesh, the report claimed. The country has experienced over 500 earthquakes of minor-to-moderate magnitudes between 1971 and 2021, according to geological surveys.

The Ministry of Housing and Public Works has formed a 12-member committee with the aim of formulating a draft rule regarding the legalization of buildings constructed without the authority's approval or by violating the terms and conditions following the recommendation of Dhaka Metropolitan Area Plan 2022-2035. The committee will determine the application process, fees, and fines for legalization of illegal buildings.

The illegal or unauthorized buildings in Dhaka will be inspected on site and report will be submitted for review as per Building Policy 2008 and the BNBC, said Convener of the committee Md Oliullah, additional secretary (Admin-1) of the Housing and Public Works Ministry. He said the committee had no intention of legalizing any buildings which would pose a serious risk during an earthquake.

Fire service steps

After the earthquakes in Turkey and Syria, the Fire Service and Civil Defence called an emergency divisional meeting and prepared a proposal containing about 14 points according to the national plan for disaster management (2021-2025) and sent it to the ministry, which is awaiting the approval of the Cabinet.

Recommendations include to implement existing laws, purchase modern equipment, and to identify and demolish risky buildings. According to Fire Service and Civil Defence, at least 30% safety can be ensured by taking effective measures to demolish buildings. The equipment they have can handle initial rescue operations, but not evacuations across the country.

If an earthquake of magnitude 7 occurs now, with the current capacity, about 500,000 buildings, or 60% of the total buildings in Dhaka city, would collapse, observed the Fire Service Division. "Maximum buildings will collapse," said Lt Col Mohammad Tajul Islam Chowdhury, director (operation & maintenance) of the Fire Service. "Currently about 60% of buildings have been constructed by deviating from the plan in Dhaka city."

He fears that buildings in Old Dhaka may be declared abandoned after collapses as it would be near impossible to conduct evacuation operations. He stressed the need to identify and demolish the risky buildings as soon as possible, despite any difficulty due to manpower shortages at the Ministry of Housing and Public Works.

Fire Service and Civil Defence have taken steps to circulate awareness videos and leaflets using streams and social media. He warned of electricity, water and gas connections being snapped during earthquakes. "Road communication will be very difficult. We will need to rely on air and water," the official added.

There are 13,000 volunteers under Fire Service and Civil Defence and a reserve force under the Arms Forces Division that work as frontier rescue teams to combat any disaster.

The government has initially set a target of training 66,000 volunteers, with 46,000 volunteers having already been trained to deal with post-earthquake situations.

There are also 76,140 responders under the Cyclone Preparedness Program, 25,000 BNCC volunteers, as well as volunteers of the Red Crescent. The Fire Service is aiming to train a further 30,000 responders.

Mamun Abdullah

ChatGPT: Bane or boon to Bangladeshi businesses?

ChatGPT, a new artificial intelligence (AI) chatbot, has recently taken the internet by storm globally. Experts believe that it may take over the jobs of some IT-related businesses and freelancers in Bangladesh unless they learn to leverage the technology strategically.

This AI chatbot will replace many types of jobs, especially in ICT and the creative world with its trained responses, alongside creating new horizons of work for business entities, global experts have said.

According to the latest MLIV Pulse survey, advanced AI systems are expected to eventually replace some jobs in the financial, media, legal and technology sectors in future.

Experts said, in Bangladesh where internet penetration is low and IT-related businesses and freelancers are low or mediocre performers, ChatGPT may take over some jobs as it automates many tasks currently being performed by human beings.

They have urged lower or medium-range workers to upgrade their skills or shift to another career to survive.

Experts also said that in light of this new technology, businesses need to think about how they are operating, what products and services they offer, and how AIs like ChatGPT could enhance workflows and deliver better customer experiences in a changed business scenario.

If the country cannot take advantage of the latest technology at its early stage, both professionals like freelancers and businesses will fall into trouble in the fast-changing world.

What is ChatGPT?

ChatGPT, or Chat Generative Pre-training Transformer, is a large language model that can generate human-like text, trained on a massive dataset of written works from the internet up to 2021.

Developed by San Francisco-based AI research company OpenAI, the AI bot was released in November 2022. Since then, the platform's number of users has been rapidly increasing. It gathered one million users within only five days, faster than any other internet tool so far.

Based on any prompts, ChatGPT can give feedback in a few seconds with unique answers in an organised way, be it poems, songs, articles or computer code for making new applications.

The creator of Gmail and Google AdSense, Paul Bucheit, has predicted that ChatGPT will destroy Google Search first, and its ancillary services within the next two years.

ChatGPT and businesses

According to Forbes magazine, chat-based AI tools can create enormous opportunities for companies that leverage the technology strategically.

Chat-based AI can augment how humans work by automating repetitive tasks based on a prompt, while providing more engaging interactions with users like compiling research, drafting marketing content, brainstorming ideas, writing computer code, automating sales processes, providing customised instructions, translating texts, increasing customer engagement, etc.

Businesses can use ChatGPT technology to generate responses for their customer service chatbots, so they can automate many tasks typically done by humans and radically improve response time. According to an Opus Research report, 35 per cent of consumers want to see more companies using chatbots — and 48 per cent of consumers do not care whether a human being or an automated chatbot helps them with a customer service query.

Curse or blessing?

Khalid Farhan, a Dublin-based Bangladeshi entrepreneur, digital marketer and agency operator, said, “ChatGPT has changed the internet’s overall landscape. New companies have started to grow based on the super upgraded AI technology.”

Bangladesh has 6.5 lakh freelancers and more than 2,000 firms that provide IT and IT-enabled services worldwide.

But according to Farhan, people with average work quality will be replaced. Especially in a third-world country like Bangladesh, where many freelancers mainly do low-tier jobs needing little brain power, will suffer the most.

“Low-grade works like data entry, lead generation and graphic designing will be replaced by ChatGPT. It is being said that at least half of the average type of jobs will be replaced by AI. This year will be of AI and business building based on AI. Ten to 15 AI-based companies are being built every day,” he predicted.

“The companies or professionals in Bangladesh that will adapt early will remain in the race, otherwise, they will be compelled to surrender to their competitors who will,” he added. Software development company Brain Station 23 CEO Raisul Kabir said, “ChatGPT is an important and timely technology. What we need now is to know the usage of the technology and engage people relating to it.

“However, we will manage to overcome future challenges. It will not replace mediocre people; rather we will get high performance from average people. Several types of work will potentially decline, while it will add multiple dimensions of works by enabling people.”

As an example, he clarified that at Brain Station, they have senior programmers who need junior programmers. ChatGPT will be able to help those senior programmers, replacing some junior programmers for drafting codes and other work. This will not ultimately reduce business efficiency but it will boost business performance.

“Already, one of the global companies we work with has asked us to add ChatGPT to their applications. We have integrated it as per their requirements. ChatGPT has limited knowledge, so human touch is still needed for a perfect output,” he added.

Adaptation recommended

Fahim Mashroor, the CEO and co-founder of Bdjobs.com, said, “A subtle technology like ChatGPT involves AI, machine learning, deep learning, etc, and we already lag in terms of many things like internet penetration, AI expertise.

“It will take time to grab the earlier adaptation benefits. If we do not start right now, our productivity may go down.”

“By adapting to it, we will be able to improve customer service quality, and both demands will be wider and opportunity will be extended, thus the company will be bigger, which will again employ relevant people,” he said.

“We will not need any arrangements to train up like we did not need training for Google searches. Rather, after the ChatGPT fully arrives, some low-grade performers like data entry personnel or draft writers will have to prepare for improving their skills,” Fahim added.

The government agencies can make arrangements for boosting skill-based training to cope with it, he added. “The faster our adaptation is, the more benefited we will be.”

Dhaka University’s Institute of Information Technology (IIT) Professor BM Mainul Hossain said, “The search engine already gives the information which the ChatGPT gives us now.

“It is not the only exciting AI-based technology. There are several other technologies too. But what happened now is it has connected mass people. Some low-grade jobs will still be available. For example, foreign companies will still hire people from Bangladesh to help them with ChatGPT,” he said.

He continued, “Of course, any new technology cuts jobs, but it brings huge opportunities too. We have to prepare for harnessing those scopes. The hype of ChatGPT will not last long, it will stabilise after a while. Businesses have to decide how they will choose a better experience.”

Shamim Ahmed

www.exambd.net

ChatGPT: Boon for the lazy learner

INSIDE the beating heart of many students and a large number of learners lies an inner cheat. To get passing grades, every effort will be made to do the least to achieve the most. Efforts to subvert the central class examination are the stuff of legend: discreetly written notes on hands, palms and other body parts; secreted pieces of paper; messages concealed in various vessels that may be smuggled into the hall.

In the fight against such cunning devilry, vigilant invigilators have pursued such efforts with eagle eyes, attempting to ensure the integrity of the exam answers. Of late, the broader role of invigilation has become more pertinent than ever, notably in the face of artificial intelligence

technologies that seek to undermine the very idea of the challenging, individually researched answer.

ChatGPT, a language processing tool powered by comprehensive, deep AI technology, offers nightmares for instructors and pedagogues in spades. Myopic university managers will be slower to reach any coherent conclusions about this large language model, as they always are. But given the diminishing quality of degrees and their supposed usefulness, not to mention running costs and the temptations offered by educational alternatives, this will come as a particularly unwelcome headache.

For the student and anyone with an inner desire to labour less for larger returns, it is nothing less than a dream, a magisterial shortcut. Essays, papers, memoranda, and drafted speeches can all be crafted by this supercomputing wonder. It has already shaken educational establishments and even made Elon Musk predict that humanity was ‘not far from dangerously strong AI.’

Launched on November 30, 2022 and the creative offspring of AI research company OpenAI, ChatGPT is a work in progress, open to the curious, the lazy and the opportunistic. Within the first five days of launching, it had 1 million users on the books.

It did not take long for the chatbot to do its work. In January, the Manchester Evening News reported that a student by the name of Pieter Snepvangers had asked the bot to put together a 2,000-word essay on social policy. Within 20 minutes, the work was done. While not stellar, Snepvangers was informed by a lecturer that the essay could pass with a grade of 53. In the words of the instructor, ‘This could be a student who has attended classes and has engaged with the topic of the unit. The content of the essay, this could be somebody that’s been in my classes. It wasn’t the most terrible in terms of content.’

On receiving the assessment from the lecturer, Snepvangers could only marvel at what the site had achieved: ‘20 minutes to produce an essay which is supposed to demonstrate 12 weeks of learning. Not bad.’

The trumpets of doomsday have been sounded. Beverly Pell, an advisor on technology for children and a former teacher based in Irvine, California, saw few rays of hope with the arrival of the ChatGPT bot, notably on the issue of performing genuine research. ‘There’s a lot of cheap knowledge out there,’ she told Forbes. ‘I think this could be a danger in education, and it’s not good for kids.’

Charging the barricades of such AI-driven knowledge forms tends to ignore the fundamental reality that the cheat or student assistance industry in education has been around for years. The armies of ghost writers scattered across the globe willing to receive money for writing the papers of others have not disappeared. The website stocked with readily minted essays has been ubiquitous.

More recently, in the wake of the Covid pandemic, online sites such as Chegg offer around the clock assistance in terms of homework, exam preparation and writing support. The Photomath app,

to take another striking example, has seen over 300 million downloads since coming into use in 2014. It enables students to take a picture of their mathematics problems and seek answers.

Meta's chief AI scientist Yann LeCun is also less than impressed by claims that ChatGPT is somehow bomb blowing in its effects. 'In terms of underlying techniques, ChatGPT is not particularly innovative.' It was merely 'well put together' and 'nicely done.' Half a dozen startups, in addition to Google and Meta, were using 'very similar technology' to OpenAI.

It is worth noting that universities, colleges and learning institutions constitute one aspect of the information cosmos that is ChatGPT. The chatbot continues to receive queries of varying degrees of banality. Questions range from astrology to suggest gift ideas to friends and family.

Then come those unfortunate legislators who struggle with the language of writing bills for legal passage. 'When asked to write a bill for a member for Congress that would make changes to federal student aid programs,' writes Michael Brickman of the American Enterprise Institute, 'ChatGPT produced one in seconds. When asked for Republican and Democrat amendments focused on consumer protection, it delivered a credible version that each party might conceivably offer.'

What are the options in terms of combating such usurping gremlins? For one, its gratis status is bound to change once the research phase is concluded. And, at least for the moment, the website has a service that occasionally overloads and impairs responses to questions users may pose. To cope with this, OpenAI created ChatGPT Plus, a plan that enables users to access material even during those rocky fluctuations.

Another relevant response is to keep a keen eye on the curriculum itself. In the words of Jason Wingard, a self-professed 'global thought leader', 'The key to retaining the value of a degree from our institution is ensuring your graduates have the skills to change with any market. This means that we must tweak and adapt our curriculum at least every single year.' Wingard's skills in global thought leadership do not seem particularly attuned to how university curricula, and incompetent reformers who insist on changing them, function.

There are also more rudimentary, logistical matters one can adopt. A return to pen and paper could be a start. Or perhaps the typewriter. These will be disliked and howled at by those narcotised by the screen, online solutions and finger tapping. But the modern educator will have to face facts. For all the remarkable power available through AI and machine related learning, we are also seeing a machine-automated form of unlearning, free of curiosity. Some branches off the tree of knowledge are threatening to fall off.

DissidentVoice.org, February 15. Binoy Kampmark was a Commonwealth Scholar at Selwyn College, Cambridge. He lectures at RMIT University, Melbourne.

ভাষা আন্দোলন ও একুশের চেতনা

কোনো কোনো মহৎ দিন কখনও কখনও নিয়ে আসে যুগান্তরের সম্ভাবনা। বাঙালির জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি তেমনই একটি দিন। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার স্মৃতি-চিহ্নিত এই দিনটি সংগ্রামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় উজ্জ্বল এবং রক্তাক্ত আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। এ দিনটি কেবল ইতিহাসের একটি বিবর্ণ তারিখ নয়, তা এমন একটি দিন যা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারায় নিরন্তর গতিময়, প্রাণবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাঙালির জাতিসত্তায় যে চেতনার জন্ম হয়েছিল, তা ছিল এক অবিনাশী চেতনা।

একুশের চেতনার জন্ম হয়েছিল এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। জাতিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার একপর্যায়ে ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার জনগণের অস্তিত্ব ও ভাগ্যকে জুড়ে দেয়া হয়েছিল কৃত্রিম ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে। তদানীন্তন পাকিস্তানে শতকরা ৫৬ জনের মুখের ভাষা বাংলা হলেও শতকরা ৭ জনের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৪৮ সালে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা করা হয়। প্রতিবাদে গর্জে ওঠে পূর্ব বাংলা। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধূমায়িত হতে থাকে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১-র মধ্যে ক্রমে জোরালো হয়ে ওঠে বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায়ের দাবি। তা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল ইস্যু হয়ে ওঠে।

১৯৫২ সালের শুরুতে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। ওই বছর একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ‘রাষ্ট্রভাষা দিবস’ ও সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয়। পাকিস্তান সরকার আন্দোলন দমন করার জন্য ১৪৪ ধারা জারির মাধ্যমে জনসমাগম, জনসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করে দেয়। ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙলে পুলিশ গুলি চালায়। শহীদ হন সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ নাম না-জানা অনেকে। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সারা পূর্ব বাংলা। পরদিন সারারাত জেগে শহীদদের স্মরণে গড়া হয় শহীদ মিনার। পুলিশ তা ভেঙে ফেললে আবারও গড়ে ওঠে শহীদ মিনার। এ শহীদ মিনার একুশের শোক, সংগ্রাম ও শপথের প্রতীক। তা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও জাতিচেতনামূলক আন্দোলনের চালিকাকেন্দ্র হয়ে আছে আমাদের জাতীয় জীবনে।

১৯৫২ সালের সেই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তায় জন্ম নিয়েছিল একুশের চেতনা। এই চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনে আত্মত্যাগের বীজমন্ত্র। পরবর্তীকালে প্রতিটি গণআন্দোলনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সেদিন পূর্ব বাংলার অধিকার-বঞ্চিত মানুষের প্রথম সংগঠিত সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে প্রতিটি গণআন্দোলনের প্রেরণাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ওই আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে সময়ে বাঙালির আত্মসচেতনতা ও আত্মপরিচয়ের যে উদ্বোধন ঘটেছিল তা-ই নানা আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে রূপ নিয়েছিল স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে। এরপর একুশের পথ ধরেই আমরা বারবার পেরিয়ে এসেছি সংকটের নানা আবর্ত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভাববীজ আমরা পেয়েছি মহান ভাষা আন্দোলন থেকে।

একুশের চেতনার তাৎপর্য বহুমুখী। প্রথমত, বাঙালির জাতীয় চেতনাকে একুশ দিয়েছে স্ফটিকস্বচ্ছতা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির ওপর যে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনায় সংগঠিত হতে একুশ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের সচেতন, সক্রিয় ও প্রাণিত করেছে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনায়। একুশের চেতনা ক্রমেই পরিণতি লাভ করেছিল স্বাধীনতার চেতনায়।

দ্বিতীয়ত, বাঙালির জাতিসত্তার স্বরূপ আবিষ্কারে একুশের অবদান অসামান্য। ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সংকীর্ণ ধর্মাচ্ছন্নতাকে ছাপিয়ে উঠেছিল জাতিগত চেতনা। সেই চেতনা আমাদের এই মর্মে সচেতন করেছে যে, আমরা বাঙালি। আমরা জেনেছি, বাংলা ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীকার, বাংলাদেশ আমাদের দেশ। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা ছেষটি, উনসত্তর ও একাত্তরে আমাদের আত্মপরিচয়, আমাদের ঠিকানা ও দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য লড়াই করেছি। একুশের পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতা।

তৃতীয়ত, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চেতনার বিকাশে একুশে ফেব্রুয়ারি যেন হাজার তারের বীণা। তাতে কত না সুর, কত না ঝংকার। একুশের এই বীণায় ঝংকত হয়েছে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। একুশের ফসল আবদুল গাফফার চৌধুরীর অনন্য গান : ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?’। এ গান আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে উজ্জীবনী মন্ত্রের প্রেরণা। একুশের সাংস্কৃতিক চেতনার ধারায় আমরা ক্রমে অর্জন করেছি দেশাত্মবোধক গানের সমৃদ্ধ সম্পদ।

১৯৫৩ সাল থেকে শহীদ দিবস উদযাপন করতে গিয়ে তখনকার প্রগতিশীল কর্মীরা কালো পতাকা উত্তোলন, নগ্নপদে প্রভাতফেরি, শহীদের কবরে ও শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, প্রভাতফেরিতে সমবেত কণ্ঠে একুশের গান পরিবেশন, শহীদ মিনারে আলপনা আঁকা ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এসব কর্মসূচি বাঙালির জাতীয় চেতনার নবজাগরণের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এখন এসব আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গ।

একুশের চেতনা আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। ফলিয়েছে অজস্র ফসল। একুশের প্রথম কবিতা মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’। ১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে রাজবন্দি মুনীর চৌধুরীর লেখা কবর নাটকটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল রাজবন্দীদের উদ্যোগে। এই নাটক বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎসারে প্রেরণাদায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এভাবেই একুশের চেতনায় অফুরান সৃষ্টিতে ভরে গেছে আমাদের সাহিত্যের ডালি। একুশের আরেক অনবদ্য ফসল হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের সংকলন-‘একুশে ফেব্রুয়ারি’। তারপর প্রতি বছর একুশ উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে অজস্র সংকলন।

চতুর্থত, একুশের চেতনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে বাংলা ভাষাকে নস্যাত্য করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে তারা বাংলা ভাষার বিকৃতি ঘটানোর নানা অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। যেমন, বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে একটা নতুন ভাষা তৈরি করা, বাংলা বর্ণমালা তুলে দিয়ে রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তন ইত্যাদি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে জোর করে পাকিস্তানিকরণের চেষ্টাও কম ছিল না। তারা রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। নজরুলের রচনাকে আংশিক ও খণ্ডিতভাবে গ্রহণের হীন পদক্ষেপও তারা নিয়েছিল। এসব হীন তৎপরতার বিরুদ্ধে তখন আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছে একুশ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য রক্ষার ওই আন্দোলনে একুশ ছিল এক অনির্বাণ প্রেরণা।

পঞ্চমত, একুশের সাংস্কৃতিক চেতনার অসামান্য ফসল ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা, গবেষণা ও বিকাশে আমাদের জাতীয় জীবনে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অসামান্য। একুশ উপলক্ষে বাংলা একাডেমি প্রতি বছর যে বইমেলায় আয়োজন করে তা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। আর একুশের বইমেলা উপলক্ষে প্রতি বছর প্রকাশিত হচ্ছে নিত্যনতুন বই।

এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও একুশের চেতনা কতটুকু বিস্তার লাভ করেছে সে বিষয়ে আশাভঙ্গের দিকটাও কম নয়। এর একটা বড় কারণ একুশের চেতনা বাস্তবায়নে আমাদের পিছুটান। ফলে আমাদের সমাজজীবনে একুশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল চেতনার আশাপ্রদ বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়নি। বরং মৌলবাদ, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের ক্রমবিস্তার সমাজকে অন্ধ গোঁড়ামির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একুশের চেতনার একটি বিশেষ দিক ছিল জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার বিস্তার। এর অর্থ শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সী নারী-পুরুষ বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করবে; প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষায় বাংলা ব্যবহৃত হবে। উচ্চ আদালতেও বাংলা ভাষার প্রচলন হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কিন্তু সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের এই আকাঙ্ক্ষা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে বাঙালির হাতেই বাংলা ভাষা উপেক্ষার শিকার হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ও অফিস-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, গণমাধ্যম ও বিজ্ঞাপনে ইংরেজি ভাষার দখলদারি ক্রমপ্রসারিত হচ্ছে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্রমবিস্তার, সাধারণ শিক্ষায় ইংরেজি পাঠ চালু করার ফলে বাংলার গুরুত্ব ক্রমেই কমছে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রভাবে আমাদের মানসিকতায় বিদেশিয়ানার প্রভাব বাড়ছে। তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামকরণে বিদেশি ভাষার আশ্রয় নেয়ায়, বিয়ে বা জন্মদিনের আমন্ত্রণপত্রে বিদেশি ভাষার ব্যবহারে, দৈনন্দিন বোলচালে বিদেশি বুলির মিশ্রণে, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তিফলকে বিদেশি ভাষাকে প্রাধান্য দেয়ায়।

বস্তুত, আমরা অনেকেই ভুলে যেতে বসেছি যে, সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে মাতৃভাষার উন্নতির রয়েছে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। আর সম্ভবত সেই কারণেই এ জায়গাটিতে আমাদের পিছুটান ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। আমরা অনেকেই ভুলে যাচ্ছি, বাঙালির পরিচয়ের মূলভিত্তি তার ভাষিক পরিচয়। ভুলে যেতে বসেছি, আর্থ-সামাজিক জীবনে বাংলা ভাষা যথাযথ গুরুত্ব না পেলে তার শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাবে।

এসব পিছুটান সত্ত্বেও আমাদের ভুললে চলবে না যে, একুশের চেতনাই আমাদের নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের প্রেরণা। মনে রাখতে হবে, ভাষা আন্দোলনের অমর স্মৃতিবিজড়িত মহান একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর আমাদের ইতিহাসের একটি রক্ত-রঙিন দিন নয়, এ দিন এখন পেয়েছে বিশ্বস্বীকৃতি। পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা। আমাদের জন্য এ এক অসামান্য গৌরব ও অনির্বাণ প্রেরণা।

বস্তুত, একুশ আমাদের অহংকার; একুশ আমাদের প্রেরণার অজস্র উৎস। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে অমর একুশ একাধারে ইতিহাস ও ঐতিহ্য, গৌরবগাথা ও প্রাণভোমরা। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ একুশের চেতনারই ফসল। তাই একুশের অবিনাশী চেতনা আজও আমাদের উজ্জীবিত করে। এই চেতনা অম্লান রেখে জাতির সব ধরনের কল্যাণ ও অগ্রগতির পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার বিস্তার ঘটাতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে একুশের চেতনার পতাকা সম্মুখ রাখার জন্য।

ড. মাহবুবুল হক : ভাষাবিজ্ঞানী; সাবেক উপাচার্য, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কোটবাড়ি, কুমিল্লা

The Goal is now **Smart Bangladesh** by 2041

The declaration of the 22nd National Conference of the Bangladesh Awami League emphasized the commitment to building a Smart Bangladesh. In her speech at the 22nd National Conference, the Party President and Prime Minister Sheikh Hasina mentioned four pillars to building Smart Bangladesh. These are Smart Citizens, Smart Economy, Smart Government and Smart Society. The government wants to build Bangladesh as a Smart Bangladesh, where every manpower will be smart. Everyone will learn to do everything online, the economy will be the e-economy, where the entire money management will be done on digital devices. She mentioned, "Our education, health, employability" will all be through e-governance. Digital devices will be used in everything including e-education, and e-health. We will be able to do that by 2041 and work is going on with that in mind.

The more our young community learns to use these digital devices, the faster they can move the country forward. Initiatives have been taken to train young people in various aspects of the fourth industrial revolution. Specialized labs will be established in every university in the country. The establishment of 57 such labs is in progress. The establishment of the Sheikh Kamal IT Training and Incubation Center in 64 districts and 10 digital villages is in progress. 92 Hi-Tech Parks, Software Technology Parks are under construction. 6,686 Digital Centers and more than 13,000 Sheikh Russel Digital Labs have been set up across the country.

Leaders and activists from the grassroots also expressed their confidence in Sheikh Hasina to build a Smart Bangladesh. They said that Sheikh Hasina has transformed the country into a digital Bangladesh. Sheikh Hasina's government will also be able to create a Smart Bangladesh. In 2008, Sheikh Hasina told us to give digital Bangladesh. Today, Bangladesh has truly become a digital Bangladesh. The Smart Bangladesh that the leader is talking about is possible only under the leadership of Sheikh Hasina.

Under the leadership of the father of the nation, Bangabandhu, on September 5, 1973, Bangladesh became a member of the important International Telecommunication Union (ITU) among the 15 organizations of the United Nations. The Earth-Resource Technology Satellite Program for a socio-economic survey and meteorological data exchange was implemented under his direction. On June 14, 1975, Bangabandhu inaugurated the Satellite Earth Station at Betbunia. Giving importance to science, technology and technical education the recommendations of Dr. Muhammad Kudrat-e-Khuda led the education commission report and included the aim of using technology in education in the first five-year plan of Bangladesh was his very well-thought-out and visionary initiative.

Just looking at the various initiatives and activities undertaken in the expansion and development of information and communication technology, it can be seen that the foundation of a modern science-minded technology-based Bangladesh was created by the hands of Bangabandhu, which shows the way for Bangladesh to participate in the digital revolution.

In the context of the digital revolution, it is also relevant today to highlight the foundation of science, technology and modern technology-based Bangladesh in independent Bangladesh. The digital revolution began in 1969 with the invention of the Internet. The connection of devices with the Internet began to affect people's daily life, culture, business, and production. Due to scientific, technical and technological progress, the development of the world is at a great pace. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman deeply understood its importance. Because he wanted to build Sonar Bangla. He was determined to realize his dream. Bangabandhu got time to run the state for only three and a half years. At this time, the wise and prudent statesman Bangabandhu did not implement the planned initiatives and activities, including agriculture, education, health, information and communication technology, in the construction of his dream Sonar Bangla.

The journey of the 'Digital Bangladesh' philosophical commitment began on December 12, 2008, when Bangladesh Awami League election manifesto leader Sheikh Hasina announced 'Vision 2021' with Bangabandhu's firm commitment to 'Build a Golden Bangla'. It is said in that election promise that Bangladesh will become 'Digital Bangladesh' in 2021, 51 years after independence. Bangladesh today has achieved a revolution in the spread of modern information technology. Digital Bangladesh is no longer a dream but a reality.

Under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, under the supervision and guidance of ICT Advisor Sajeeb Wazed Joy, Digital Bangladesh has been implemented by defining four specific main pillars of connectivity for all, skilled human resource development, e-government and ICT industry promotion. With honesty, courage and foresight, in just 14 years, he brought the country to 40 percent electricity under 100 percent electricity by making the whole world stand up. Where there were lakhs of internet users, ICT consultant Sajeeb Wazed's innovative plan reached crores of imagination and direct supervision to broadband connectivity at union levels. Currently, the number of internet users in the country is more than 13 crore and the number of mobile connections is over 18 crore.

More than 16,000 entrepreneurs are currently working in around 8,800 digital centers across the country to deliver services to people's doorsteps, where 50 percent are women entrepreneurs. As a result, on the one hand, the inequality between men and women, on the other hand, the inequality between the rich and the poor and the inequality between rural and urban areas are being eliminated. The government will invest Tk 500 crore in the next five years to develop the startup culture in the country and pave the way for startups to exploit innovative opportunities. Ten Startup Ecosystem has been developed by providing talented young entrepreneurs with interest and collateral-free equity investment and various facilities including training, incubation, mentoring and coaching. 2500 startups including Bikash, Pathao, Chaldal, Sure Cash, Sahaj, and Paperfly are actively working. Who created about 1.5 million more jobs. Our youth was not familiar with this culture even 10 years ago. In just seven years, 700 million dollars have been invested in this sector.

Bangladesh has a good position in the online labor force of the world. Before 2009, none of the government services in Bangladesh were digital. But currently, all the basic information and services of all government departments are available on the website. Along with this, all government information verification and storage and various services and applications are being conducted online. In the meantime, we have launched an inter-operable digital transaction platform 'Binimay'. Nowadays, banking services have reached the fingertips of every customer. Many jobs are being created through digitization. Money from freelancing is fueling our national growth. A modern digital banking system has been developed in the country through the use of information technology. All these are the benefits of digital Bangladesh.

Equal participation of men and women, ensuring access to technology for all irrespective of rich and poor, and reducing distance in access to urban and rural services were all the main objectives and goals of our Digital Bangladesh. Inclusive development in Digital Bangladesh has made it possible to reach remote villages with the internet, through the implementation of initiatives like Union Digital Centre, employment of women entrepreneurs has also been ensured. Thanks to inclusive development and technology, now anyone can work freelancing even in the village. All this has been made possible by the progressive technological, inclusive development of People's Leader Sheikh Hasina's Digital Bangladesh. That is why the theme of this year's Digital Bangladesh Day has been set as 'Progressive Technology, Inclusive Development'.

After successfully implementing the pledge to build Digital Bangladesh, we are now moving forward with new programs. That is Smart Bangladesh. A cost-effective, sustainable, intelligent, knowledge-based, innovative Smart Bangladesh will be built on the four main foundations of Smart Citizen, Smart Economy, Smart Government and Smart Society by 2041.

The fourth revolution is underway. Where artificial intelligence is used to manage human intelligence and willpower, factory production, agriculture and all daily activities and the world. Bangladesh is not far behind. Preparations are underway to create a smart Bangladesh by 2041. But along with smart devices and technology, citizens also need to be smart in thinking, behavior and culture. Constantly we commit many mistakes, irregularities, injustices and injustices without our knowledge, which can be corrected with a little desire. I can contribute to making Smart Bangladesh. For example, many people throw garbage everywhere on the road.

On December 12, 2008, Prime Minister Sheikh Hasina announced the creation of Digital Bangladesh as the main foundation of 'Vision 2021'. Referring to the steps taken by the government to formulate one after other plans for the development of the country and implement them, he said, "The Delta Plan of 2010 and the vision plan of 2021 to 2041 have also been formulated. That is, we have formulated a structure and plan of how Bangladesh will develop from 21 to 41. Generation after generation of this delta is saved from climate shock, the country is developed and they can live smartly independently and beautifully in developed countries. I am also making that arrangement. Now everything depends on our young generation and youth society. "The power of youth, the development of Bangladesh. This was our 2018 election manifesto.

Building Digital Bangladesh is an inspiring undertaking in the political history of Bangladesh. Prime Minister Sheikh Hasina announced Vision 2021 with the aim of building an information-technology-rich Bangladesh in the modern form of Sonar Bangla, the dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. By implementing this concept, Bangladesh has achieved a revolution in the spread of modern information technology. The speed at which technology has developed in the world is truly incredible. But under the guidance of Bangabandhu's daughter Prime Minister Sheikh Hasina and under the supervision of ICT Advisor Sajeeb Wazed Joy, Bangladesh is not behind the global digital progress. We are moving along an information technology highway at an unstoppable speed. We have a success story in this sector, which is truly a matter of pride and joy. Bangladesh has made its debut in the world as a digital country.

Hiren Pandit: *Writer: columnist and a researcher*

Towards a Smart Bangladesh by 2041

Taking over as Prime Minister for the second time on January 8, 2009, Sheikh Hasina worked tirelessly to implement the Sixth Five-Year Plan, the MDGs and the First Perspective Plan. She was re-elected in the February 5, 2014 elections and got a chance to take the country forward by forming the government. The Prime Minister took 10 special initiatives. Prioritizes poverty, hunger-free society, housing, education, medicine, employment, social safety net and digitization in the country. Today, the benefits of 'Digital Bangladesh' have spread from urban to villages.

Prime Minister Sheikh Hasina mentioned four pillars of building Smart Bangladesh. These are Smart Citizens, Smart Economy, Smart Government and Smart Society. The government wants to build Bangladesh as a Smart Bangladesh, where every manpower will be smart. Everyone will learn to do everything online, the economy will be the e-economy, where the entire money management will be done on digital devices. She mentioned, "Our education, health, employability" will all be through e-governance. Digital devices will be used in everything including e-education, and e-health. We will be able to do that by 2041 and work is going on with that in mind.

The people of Bangladesh have confidence in Sheikh Hasina to build a Smart Bangladesh. Sheikh Hasina has transformed the country into a digital Bangladesh. Sheikh Hasina's government will also be able to

create a Smart Bangladesh. In 2008, Sheikh Hasina told us to give digital Bangladesh. Today, Bangladesh has truly become a digital Bangladesh.

Per-capita income is now 2824 and human resources and economic fragility the criteria for the cited indicators determine the eligibility of developing countries to be listed. Bangladesh has achieved the desired qualifications in these three indices. Women are now contributing at all levels including social, political, and economic. Women in rural areas are not lagging in the touch of technology. They are also moving forward in parallel. Which has brightened the image of Bangladesh in the world. Bangladesh is moving forward on the path of building a golden Bengal. The young generation is the leader of the future state. To turn the young generation into human resources, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) education is being introduced for career-oriented education. The state must give due value to the knowledge, skills, experience, desires and opinions of the youth.

Sheikh Hasina has given four milestones, the first is the vision of Digital Bangladesh in 2021 which is being achieved to a great extent, the second is to achieve the SDGs in 2030, the third is to build a developed Bangladesh in 2041 and the fourth is the Delta Plan for 2100.

By 2041, Bangladesh will be a developed country, with a per-capita income of more than, 12,500. Bangladesh will be a golden Bengal, where poverty will be a thing of the past. The next two decades will see changes in the way agriculture, industry and commerce, education and health, transportation and communications, business practices and performance patterns are achieved. The benefits of this continuous change have been emphasized in the Vision of balanced distribution at all levels of society.

Towards a High-Income Economy, the dream cherished by the Father of the Nation to build a prosperous Bangladesh free from poverty and hunger, free from corruption and exploitation has been taken as an inspiring start. To achieve this goal, it has set a target of 9.02 percent growth in the gross domestic product (GDP) over the next two decades. Following this path of growth, Bangladesh 2031 will be an upper-middle-income country.

The potential population of Bangladesh in 2041 will be 213 million. Those with a per capita income of at least 12,500. Extremely poor people with a daily income of less than 2.18 will be reduced to 0.6 percent. The poorest people, who have a daily income of 3.20, will have 2.59 percent. Making the seemingly impossible possible. To this end, strategic work has been committed for export-oriented industrialization, increase in agricultural productivity, expansion of the city, efficient energy and infrastructure, creation of skilled manpower, etc.

The four pillars of good governance, democratization, decentralization and capacity building will be the main agenda to achieve Vision 2041. Digital technology-based revenue administration will be built to increase it to 50 percent by 2041. In 2041, the amount of investment will be 48.6 percent of GDP, which is currently 32.6 percent. Export revenue should be increased from the desired 50 billion dollars in 2021 to 300 billion dollars in 2041.

Connection of Metro rail in an urban communication system, upgrading the current average speed of highway corridor from 25-30 km / h to 60-100 km / h, upgrading of all railway lines to broad gauge system and installation of modern traffic signals, ship's 'anchor day' and Steps will be taken for the next two decades to improve navigability through development, dredging, river management and dam construction, installation of additional runways and taxiways at airports and periodic collection of tolls from highway users.

Urbanization and development are very deeply and positively related. Due to high economic density, urban areas are the driving force of growth. Like developed countries, in 2041, 80 percent of the total population of Bangladesh will live in cities. Preparations for this are described entitled Measures of Urban

Variability in a High-Income Economy. The government has taken a plan to expand all the facilities of the city to the rural areas under the policy 'My Village My Town'. Instead of Dhaka-centric urbanization, emphasis has been laid on the balanced development of many urban centers.

Ensuring sustainable environmental development and building a climate-sustainable nation and unleashing the possibilities of a Green Economy in a dynamic vibrant delta, sets out on climate adaptation efforts. Tidal fluctuations, salinity, floods, river erosion and tidal surges are regular features of Bangladesh, which hinder development. Under the Delta Plan 2100, the current plan focuses on the extraction of Blue economic resources (fisheries, seaweed, mineral resources).

We are currently witnessing an incredible systematic fundamental change (paradigm shift). This change is taking place along the path of the digital transformation of the conventional system. With the advent of sophisticated technology, digital transformation is taking place at a rapid pace. In the fourth industrial revolution, you can see that it is being printed from your 3D printer and brought to the fore. While there will be challenges to this fundamental change in the system, it will not necessarily pose a threat to those countries that will use state-of-the-art technology and improve efficiency in digital transformation.

The ambitious 'Smart Bangladesh 2041' concept has been formulated with an emphasis on its extensive use. Critics might say the plan is too ambitious. Whether in personal life or the management of the state; if there is no ambition to achieve any goal, it will be floating in the river like a boat without a sailor. The implementation of such an ambitious modern programme will be 'impossible' or 'difficult' after the announcement of Digital Bangladesh 14 years ago; many such words were heard. Criticism of Digital Bangladesh was also strong from the ruling party's political opponents. But overcoming all criticism, Digital Bangladesh is now a reality.

In implementing Digital Bangladesh, we have got a new sector called Digital Economy. We have witnessed the launch of the Bangabandhu satellite in space. The implementation of the 'Smart Bangladesh 2041' vision may see another sector called the space economy. Home-made satellites are being sent into space. With such ambition, Smart Bangladesh 2041 is not just a vision; the previously announced 'Vision 2041' also emphasizes building a space economy.

The plan to build a space economy has to be applauded for two reasons. First, given the current global realities, Bangladesh will have to launch more different types of satellites into space for space research and expansion of the economy and information technology. Second, investing in satellites is profitable.

Three important aspects of the Smart Bangladesh vision- are a knowledge-based economy, an innovative nation and building an inclusive digital society. There are proposals for its deliberate implementation. The construction of the national knowledge shuffle required for the technology of the Fourth Industrial Revolution; Building infrastructure for conducting knowledge-based activities; Establishment of international startup mentors and business coaches at the local level and the establishment of an Alternative School for Startup Educators of Tomorrow and Center for Learning Innovation and Creation of Knowledge.

In building an innovative nation, emphasis has been placed on capacity building, quality innovation and control. It is proposed to set up Self Employment and Entrepreneurship Development (SED) and Content Engineering and Linkage Lab (Cell) as new initiatives to create entrepreneurs. In building an inclusive digital society, emphasis has been placed on ensuring the inclusion and empowerment of people from all walks of life. The ICT department has already taken various initiatives to implement the Smart Bangladesh vision.

- Hiren Pandit is a researcher and columnist

স্বপ্নের মেট্রোরেল যুগে বাংলাদেশ

www.exambd.net



ঢাকার যানজটের দুর্নাম দুনিয়াজোড়া। সবচেয়ে সময়ানুবর্তী মানুষটিও এই নগরে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলতে পারেন না। যানজটে আটকে সবাই কমবেশি 'লেট লতিফ'! ৯টায় মতিঝিলে অফিস ধরতে মিরপুরের বাসিন্দাদের ঘর থেকে বেরোতে হয় দুই ঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে। পথে যানজটের সঙ্গে দেখা হলে অফিসে পড়ে 'লেট মার্ক'। পথের গাড়িজট নিচ্ছে প্রাণও। অ্যাম্বুলেন্স যানজটে আটকে রোগীর মৃত্যুও দেখেছে রাজধানী ঢাকা।

দুর্বিষহ যানজট নিরসনের স্বপ্ন পূরণে আধুনিক গণপরিবহন মেট্রোরেল চালুর মাধ্যমে একধাপ এগোচ্ছে বাংলাদেশ। আজ বুধবার মেট্রোরেলের এমআরটি-৬ লাইনের দিয়াবাড়ী থেকে আগারগাঁও অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১১ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথ পাড়ি দিতে এখন প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। মেট্রোরেলে লাগবে ১৭ মিনিট।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের হিসাবে, শুধু ঢাকার যানজটের কারণেই বছরে আর্থিক ক্ষতি হয় ১ লাখ ১ হাজার ৩৬ কোটি টাকা। যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ দশমিক ৯ শতাংশ। মাসে ৫০ লাখ এবং বছরে ৬ কোটি কর্মঘণ্টা খেয়ে ফেলছে যানজট। ১৯৯৮ সালে ঢাকায় গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (এআরআই) গত বছরের ৩ এপ্রিলের গবেষণা অনুযায়ী, তা কমে এখন ঘণ্টা ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার।

শুধু কি যানজট? রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের হিসাবে ঢাকা নগরে বছরে শতাধিক মানুষের জীবন খামে গাড়িচাপায়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিপজেটের গবেষণা বলছে, যানজটের কারণে এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে ঢাকায় বাস করা সবচেয়ে বেশি মানসিক চাপের ব্যাপার।

যানজটের কারণে হৃদযন্ত্র, ফুসফুসের রোগ হচ্ছে। শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মেজাজ খিটখিটে হওয়ার রোগ তৈরি করছে। এআরআইয়ের হিসাবে, যানজটের কারণে তৈরি স্বাস্থ্য সমস্যায় দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ গড়ে ৮ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। ট্রাফিক সিগন্যালে দুর্ঘটনায় আর্থিক ক্ষতি ১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।

তিলোত্তমা ঢাকায় ভাঙাচোরা লক্কড়বক্কড় বাসের কাছে অসহায় সাধারণ যাত্রী। বেশি ভাড়ার কারণে ট্যাক্সি ও অটোরিকশা তাঁদের নাগালের বাইরে। তাই ভোগান্তিই নিয়তি। যানজট নিরসনে চেষ্টা হয়েছে অনেক। তবে সব 'টোটকা' ব্যর্থ। একের পর এক নির্মিত ফ্লাইওভারে কাজ হয়নি। বছর দুইয়েক আগে বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত ১১টি ইউটার্ন তৈরি করা হয় ৩৯ কোটি টাকায়। সেগুলো বন্ধ। পুরো টাকাই গেছে জলে।

অসহনীয় এই অবস্থা থেকেই মুক্তি দিতে ২০০৪ সালে প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় ঢাকায় তিনটি মেট্রোরেল লাইন এবং তিনটি বিআরটি নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে যানজট আরও বাড়ে। ২০১৫ সালে প্রণীত সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় ছয়টি মেট্রোরেল লাইন এবং দুটি বিআরটি নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। প্রকল্প অনুমোদনের প্রায় চার বছর পর ২০১৬ সালের ২৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমআরটি-৬ এর নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন।

গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সামছুল হক বলেছেন, ঢাকাকে বাঁচানোর শেষ উপায় মেট্রোরেল। যানজট নিরসনে ঢাকায় এ পর্যন্ত যত প্রকল্প হয়েছে, এর মধ্যে মেট্রো একমাত্র বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা। তবে উচ্চ নির্মাণ খরচের কারণে মেট্রোতে একবারে অনেক বেশি টাকা বিনিয়োগ করতে হয়।

৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকায় নির্মাণাধীন এমআরটি-৬ লাইনের উপপ্রকল্প পরিচালক আবদুল বাকি মিয়া সমকালকে বলেন, ঢাকার যানজটে প্রতিবছর যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়, তা দিয়ে তিনটি মেট্রোরেল লাইন তৈরি করা যায়। এ হিসাবে মেট্রোরেল শুধু সময়সাপ্রসূরী নয়, আর্থিক সাশ্রয়ও করবে।

মেট্রোর নির্মাণকাজের কারণে দুর্ভোগ হয় মিরপুর এলাকায়। যানজটের কারণে মিরপুর ছেড়েছেন এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। সেই দুঃসময় পেছনে ফেলে চালু হচ্ছে মেট্রোরেল। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে যাত্রী নিয়ে চলবে ট্রেন। সড়কের মাঝ বরাবর মাটি থেকে ১৩ মিটার উঁচুতে নির্মিত ভায়াডাক্টে (উড়ালপথ) চলবে অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেট্রো। যানজটের আটকা পড়বে না। সাধারণ ট্রেনের মতো ক্রসিংয়ে পড়বে না। শত কিলোমিটার গতিতে ঘড়ির কাঁটা মেনে চলবে। যানজটের অভিষাপ থেকে মিলবে মুক্তি। তবে এখনই যানজট থেকে মুক্ত হচ্ছে না ঢাকা। জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকায় দিনে ৪ কোটি ট্রিপ হয়। এমআরটি-৬ লাইন ৪ লাখ ৮৩ হাজার ট্রিপ দিতে পারবে। অর্থাৎ, মোট ট্রিপের মাত্র ১ শতাংশের কিছু বেশি হবে ২০২৩ সালে এমআরটি-৬ লাইন পুরোপুরি চালু হওয়ার পর। তবে ২০৩০ সালে ছয়টি মেট্রোরেল চালুর পর মোট ট্রিপের ১৭ শতাংশ হবে মেট্রোতে। ততদিনের অপেক্ষায় এমআরটি-৬ এর একাংশ চালুর মাধ্যমে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।

মেট্রোরেলের যুগে দেশ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও পা দিচ্ছে মেট্রোরেল যুগে। দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও এই অংশে উড়াল ট্রেন চালুর মধ্যদিয়ে আজ বুধবার বাংলাদেশ প্রবেশ করছে বহুল কান্ডিকৃত মেট্রোরেল যুগে। সেই সঙ্গে রাজধানী ঢাকার গণপরিবহনেও প্রথমবারের মতো যুক্ত হচ্ছে মেট্রোরেল। ঢাকার গণপরিবহন নিয়ে বহু বছর ধরে অস্বস্তিতে আছেন নগরবাসী। একে তো লক্কড়-বক্কড় বাস তার ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকা। চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শিক্ষার্থী- যারা প্রতিদিন কোথাও না কোথাও যাতায়াত করেন তাদের ভোগান্তিটা চরম বিরক্তির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। মেট্রোরেল চালু হলে ঢাকার রাস্তায় নিত্য যাতায়াতকারীদের একটি অংশ অন্তত স্বস্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সেই সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়াতে মেট্রোরেল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০ বছর আগে দিল্লিতে মেট্রোরেল চালু হয়। এরপর সেখানে শ্রম বাজারে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক বেড়ে যায়। একই ঘটনা ঢাকার ক্ষেত্রেও ঘটবে বলে মনে করেছে প্রকল্পে অর্থায়নকারী সংস্থা জাইকা। সংস্থাটি বলছে, এ অঞ্চলে নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা অন্য অঞ্চলের থেকে বেশি।

দক্ষিণ এশিয়ার সমাজকে বিবেচনায় নিলে নারীর ক্ষমতায়নে এটি বড় ভূমিকা রাখবে এই রেল। কারণ, দিল্লি মেট্রোর ওপর অনেকগুলো জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে নারীরা মনে করেন দিল্লি মেট্রো হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। দিল্লি মেট্রো

তৈরির ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছিল জাইকা। একই ঘটনা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটবে বলে আশা করা যায়। মেট্রোরেল চালুকে কেন্দ্রে করে উত্তরা ও টঙ্গী এলাকার অনেকেই স্বপ্ন বুনছেন এই স্বপ্নের বাহনটিতে করে ঢাকায় এসে অফিস করার। অপেক্ষার প্রহর ঘনিয়ে সেই স্বপ্ন এখন ছুঁয়ে দেখার মুহূর্ত। পদ্মা সেতুর পর এবার বাস্তবে ধরা দিচ্ছে দেশের আরও একটি বৃহৎ প্রকল্প। আজ বুধবার ঘটা করে বিদ্যুৎচালিত দেশের প্রথম মেট্রোরেল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন জাতির পিতার কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তবে উদ্বোধনের পরই পুরোদমে চলবে না মেট্রোরেল। উদ্বোধনের পর প্রথম সপ্তাহে শুধু সকালে নির্দিষ্ট সময়ে চলবে। ধীরে ধীরে ট্রেন চলার সময় বাড়বে। পূর্ণমাত্রায় চালু হলে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উড়ালপথের ট্রেন ১০ মিনিট ১০ সেকেন্ডে পৌঁছবে গন্তব্যে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে স্বল্প সংখ্যায় ট্রেন চলাচল শুরু হবে। চালু থাকবে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। মূলত এই চলাচলও পরীক্ষামূলক। এতদিন যাত্রী ছাড়া চলেছে, এখন কয়েক মাস স্বল্প যাত্রী নিয়ে পরীক্ষামূলক চলাচল করবে। ইতোমধ্যে মেট্রোরেল চড়তে যাত্রীদের মধ্যে টিকিট কেনার সাড়া পড়ে গেছে। উদ্বোধনের পরদিন থেকে স্টেশন কাউন্টারেই মিলবে মেট্রোরেলের টিকিট। যাত্রীরা স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই ভিত্তিতেই টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। আপাতত স্টেশন থেকে সংগ্রহ করা যাবে ১০ বছর মেয়াদি স্থায়ী কার্ড। পরে স্টেশনের বাইরে থেকেও এটি সংগ্রহ করা যাবে। মোবাইলের মতো রিচার্জ করে যাতায়াত করতে পারবেন যাত্রীরা। তবে জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে করতে হবে নিবন্ধন।

মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ বলছে, ১০ বছর মেয়াদি স্থায়ী কার্ড কিনতে হবে ২০০ টাকা দিয়ে। এই কার্ডে যাতায়াতের জন্য টাকা ভরা (রিচার্জ) যাবে। তবে প্রথমবার কার্ডটি নেওয়ার সময় চারশ' টাকা লাগবে। যার দুইশ' টাকা জামানত হিসেবে রাখা হবে। আর দুইশ' টাকা রিচার্জ করা থাকবে, যা যাত্রী ব্যবহার করতে পারবে। আবার কার্ড জমা দিয়ে জামানতের টাকা ফেরত নিতে পারবেন যাত্রীরা। অন্যদিকে এক যাত্রীর কার্ড নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করে নিতে হবে। ট্রেন থেকে নামার সময় তা রেখে দেওয়া হবে। নামার সময় কার্ড জমা না রাখলে যাত্রীরা বের হতে পারবেন না। পর্যায়ক্রমে স্টেশনের বাইরেও মেট্রোরেলের কার্ড বিক্রির জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক বলেছেন, সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে স্থায়ী কার্ড নেওয়ার জন্য আগ্রহ বেশি লক্ষ্য করছেন। এই কার্ডে মুঠোফোনের আর্থিক সেবা (এমএফএস) ও ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমেও টাকা ভরার ব্যবস্থা আছে। এজন্য ২৯ ডিসেম্বর থেকে ডিএমটিসিএলের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া হবে। নিবন্ধন করতে নিজের নাম, পিতা-মাতার নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল লাগবে। যারা স্থায়ী কার্ড সংগ্রহ করবেন তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে গেলে হবে। তবে সিঙ্গেল যাত্রীর কার্ড নিতে কিছু প্রয়োজন হবে না।

সরকার মেট্রোরেলের সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করেছে ২০ টাকা। এরপর প্রতি দুই স্টেশন পর ১০ টাকা করে ভাড়া যোগ হবে। উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত ভাড়া হবে ৬০ টাকা। যদিও এই ভাড়া নিয়ে যাত্রী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে। তারা ভাড়া ৫০ শতাংশ কমানোর দাবি করেছে। অন্যদিকে আইপিডি নামক অপর একটি গবেষণা সংস্থা এই ভাড়া ৩০ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব করেছে।

দূর হবে ভোগান্তি || রাজধানীর ফার্মগেটে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন মোহাম্মদ নূরউদ্দিন। দুই বছর ধরে তিনি পূর্ব রাজাবাজারে থাকছেন। টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় তার নিজের বাড়ি আছে। সেখানে পরিবারের অন্য সদস্যরা থাকেন। প্রতিদিন বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে পড়ে থাকার ঝঙ্কি এড়াতে পরিবার ছেড়ে দূরে থাকেন নূরউদ্দিন। তিনি বলেন, 'একসময় টঙ্গী থেকে প্রতিদিন বাসে ফার্মগেট আসা-যাওয়া করতাম। ২১ কিলোমিটারের কিছুটা বেশি রাস্তা। প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা লেগে যেত। উপায় না পেয়ে পরিবার ছেড়ে অফিসের কাছাকাছি চলে এসেছি। এখন মেট্রোরেল চালু হলে আবার টঙ্গী থেকে অফিস করব।' নূরউদ্দিনের মতো অনেকেরই ভোগান্তি দূর হবে মেট্রোরেল চালু হলে। যদিও খরচ একটু বেশি হবে। কিন্তু সময় এবং ভোগান্তি দুটোই কমবে। ফলে যাত্রীদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যাত্রীরা নানা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মন্তব্য করে চলেছেন। উত্তরার শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাহমিনা আমিন। সপ্তাহে চারদিন ক্লাসে যেতে হয় তাকে। আগারগাঁওয়ের এ বাসিন্দা জানান, মেট্রোরেল চালুর খবরে তিনি দারুণ খুশি। সময় বাঁচাতে তিনি মেট্রোরেল আসা-যাওয়া করবেন। তবে ভাড়াটা আরও কমানো এবং শিক্ষার্থীদের জন্য হাফভাড়া চালুর দাবি জানান তিনি।

Paperless banking booms in Bangladesh over last two years

Bangladesh's digital and paperless banking has boomed as the number of ATMs, POSs, CDMs, and CRMs has swelled significantly across the country over the last couple of years, insiders said on Friday. Bankers said the Covid-19 pandemic and addition of young customers had facilitated the digital banking growth across the country, including the rural areas, as the people were avoiding visits to branches for their safety.

The paperless banking has expanded at a higher rate in the rural areas compared to the urban areas, the financial analysts said. The FE analysis has found that the number of ATM (automated-teller machine) booths swelled to 12,111 in February this year, posting a 10 per cent growth compared to a year ago. In February 2020, the total number of the ATMs of the commercial banks and financial institution was 11,002, showed the Bangladesh Bank (BB) data.

Two years ago, in February 2019, the number of ATM booths was 10,398. The analysis has also found that the number of ATM booths in rural areas till February 2021 was 3,582, which is 30 per cent of the total 12,111 booths across the country. The central bank data showed that the cash transfer at the points of sale (POSs) of the banks and financial institutions had also swelled significantly to 77,806 in February this year, maintaining a 21 per cent growth compared to the same period last year.

POS is a system which is operated by a machine in the shops to tap the banks/financial institutions' debit or credit card for transferring money to make payment for shopping. In February last year, the number of POSs across the country was 64,339, and two years back, in February 2019, it was recorded at 49,106. The POSs in the rural areas also rose, as till February this year their number reached 6,518.

A year ago, in February 2020, the POSs in the rural areas were 4,584, and two years ago, in February 2019, the figure was 1,232, the central bank statistics showed. The Bangladeshi commercial banks also set up 1,574 CDMs (cash deposit machines) across the country till February 2021, BB said. During the same period last year, the number of CDMs was 1,408 while it was 1,341 in February 2019.

Similarly, the banks and financial institutions had also installed 778 CRMs (cash recycling machines) till February this year. A year ago, in February 2020, the number of CRMs was 264 across the country, and two years back, in February 2019, it was recorded at 141 only, the central bank statistics showed. A senior BB official said since the customers had become familiar with the digital banking system during this long-lasting pandemic, the use of paperless banking tools had significantly increased over the last couple of years.

The central bank had also instructed the commercial banks and financial institutions to install the ATMs, CDMs, CRMs and POSs even in the rural areas along with the urban segments for improving the country's digital banking activities. Tapoch K Das, chief financial officer (CFO) of the Mercantile Bank Limited, told the FE that the coronavirus pandemic had changed the human behaviour over the last one and a half years prompting the customers to use the paperless banking facilities across the country.

Besides, the banks and financial institutions had also come forward with their e-banking services during this pandemic to avoid gathering in the branches, he added. Mainly those two reasons had increased the installation of the ATM, CDM, CRM and POS across the country, Mr Das said. The Mercantile Bank CFO said the customers in the meantime had become familiar with the paperless and digital banking devices which also prompted the installation of those tools by the commercial banks and financial institutions. Touhidul Alam Khan, additional managing director of the Standard Bank Limited, told the FE that the customers prefer to avoid the bank branches for the money transaction and other activities.

"They are favouring the paperless banking for their safety. Besides, a huge number of young people had been added with the banking system over the last few years resulting in upgradation of the paperless banking across the country," Mr Khan said. If you visit the rural areas, you can see ATM booths even in the villages, Mr Khan added.

ব্যাংক খাতের সংস্কারসহ ১০ চ্যালেঞ্জে অর্থনীতি

কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রধান ১০টি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে দেশের অর্থনীতি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-বৈষম্য বৃদ্ধি, ব্যাংকিং খাতে সংস্কার এবং আর্থিক খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এগুলো মোকাবেলায় ব্যাপক সংস্কারসহ আইএমএফ-এর শর্তের কার্যকরী বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তবে সংস্কারের পেইন বা ব্যথা যাতে শুধু নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ওপর না আসে, সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ কমানো সহজ বিষয় নয়, এটি কমানো রাজনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু কাগজে সই করলেই খেলাপি ঋণ কমে না।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর ষষ্ঠবার্ষিক অর্থনীতিবিদ সম্মেলনে এসব বিষয় উঠে এসেছে। শনিবার দুদিনের সম্মেলন শুরু হয়েছে। এদিন বিভিন্ন অধিবেশনে দেশি-বিদেশি ৪০টির মতো গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-‘বিল্ডিং রেজিলিয়েন্স টু শকস: প্রিউরিটিস, চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড প্রসপেক্টস’।

রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। সানেমের চেয়ারম্যান ড. বজলুল হক খন্দকারের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর, পাওয়ার অ্যান্ড পাটিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। এ পর্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান। অপর একটি অধিবেশনে ড. সেলিম রায়হানের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সিপিডির চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহান এবং অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ।

সম্মেলনে তুলে ধরা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্য চ্যালেঞ্জগুলো হলো-প্রবৃদ্ধি অর্জনের নতুন পথ বের করা, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, খেলাপি ঋণ কমানো, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার এবং জিডিপির তুলনায় কর হার বাড়ানো। আরও আছে সময়মতো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. শামসুল আলম বলেন, আইএমএফ আমাদের কোনো শর্ত দেয়নি। তারা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে। যেসব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যৌক্তিক।

তবে সংস্কার তো বিপ্লব নয় যে রাতারাতি হয়ে যাবে। সংস্কার হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। সংস্কার যন্ত্রণাদায়ক হলেও ইতোমধ্যেই বেশকিছু ক্ষেত্রে সেটি করায় আইএমএফ আমাদের ঋণ দিয়েছে। চলমান সংস্কারের কারণে দেশে দারিদ্র্য বাড়ার আশঙ্কা নেই। এর কারণ হলো, গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্ব নেই। কৃষি শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, আইএমএফ ঋণ দেওয়ায় অন্য উন্নয়ন সহযোগীরা ঋণ দিতে উৎসাহ পাচ্ছে। ইতোমধ্যেই এআইআইবি বাজেট সহায়তা দিয়েছে। আরও আড়াই বিলিয়ন ডলার দেবে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতি ভালো হচ্ছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ঋণ গ্রহণের হার, বিদ্যুৎ সুবিধা, নারীদের কর্মে নিযুক্তি, গড় আয়, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধ, মানব উন্নয়ন সূচক অনেক ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় ভালো অবস্থানে আছি আমরা। গত অর্ধবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্ধবছরে ৬ মাসে তুলনামূলকভাবে রেমিট্যান্স, রপ্তানি ও সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। কাজেই আমাদের রিজার্ভ আর পড়বে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনেক দেশেই ভিন্ন ডলার রেট আছে। তাই প্রবাসীদের জন্য আমাদের দেশে ডলার রেট কিছুটা বেশিই থাকবে। তিনি আরও বলেন, রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতেই আছে। ফলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়মিত হচ্ছে।

রেহমান সোবহান বলেন, সরকারি নীতিই অনেক সময় মানুষকে দরিদ্র করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এর একটি বড় উদাহরণ হচ্ছে ব্যাংকিং খাত। এ খাতে লাখ লাখ মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে আর গুটিকয়েক মানুষ ঋণ নিয়ে খেলাপি হয়ে যান। সেগুলো আর ফেরত আসে না। সরকারি নীতিতে আবার ২ শতাংশ দিয়ে রিশিডিউল করার সুযোগ দেওয়া হয়। এতে ঋণখেলাপির উৎসাহিত হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আদানি গুপের সঙ্গে বাংলাদেশের যে চুক্তি আছে, সেটি স্মার্ট চুক্তি হয়নি। এই চুক্তি সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, রপ্তানি শুধু পোশাক খাতনির্ভর। এখানে বহুমুখীকরণ করতে হবে। মানবসম্পদ কাজে

লাগানো যাচ্ছে না। আদম ব্যবসায়ীদের কারণে অভিবাসন খরচ বাড়ছে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা দেশে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। দেশে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য শুধু ভালো ভালো নীতিমালা করলেই হবে না। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ভালো সরকার। সরকার এখন দেশকে স্মার্ট করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তবে এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তিনি বলেন, ভাবা হচ্ছে কোভিড এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে দেশের প্রেক্ষাপটে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে এই সমস্যাগুলো দীর্ঘদিনের। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তা আমাদের অর্থনীতিতে বেশি প্রভাব ফেলছে।

ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বড় কথা নয় বরং দেখতে হবে, প্রবণতা কী। রিজার্ভের প্রবণতা নিচের দিকে নামতে থাকলে ঠেকানো কঠিন। দেশের রিজার্ভ একসময় ৩০০ কোটি মার্কিন ডলারও ছিল। তাই বলছি, পরিমাণ অনেক সময় বড় সমস্যা নয়, প্রবণতাটাই বড় কথা। আইএমএফ থেকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ নিতে অনেক শর্তের মধ্যে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ কমানোর কথাও আছে। আইএমএফ বলেছে, রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশের নিচে এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে তা ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু খেলাপি ঋণ অনেক দশক ধরে দেখেছি, শুধু কাগজে সই করলেই কি খেলাপি ঋণ কমে যাবে? এটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ব্যাপার। খেলাপি ঋণ কমানোর শর্ত দেওয়ার মাধ্যমে আইএমএফ-এর আমলাতন্ত্র খুশি, আমরাও খুশি। তিনি বলেন, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশের বেশি উল্লেখ করে বেসরকারি খাতে শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি ব্যয়ের বিকল্প নেই, বেসরকারি খাত থাকবে পরিপূরক হিসাবে। শিক্ষায় সরকারি ব্যয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা এখন সমান।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, আমদানির চাপ বাড়ায় রিজার্ভ কমছে। এখনো এলসি খোলায় সমস্যা হচ্ছে। ৬ মাস ধরে ডলার সংকট চলছে। আমদানি বিল পরিশোধ সময়মতো করা যাচ্ছে না। ফলে দেনা বাড়ছে। তবে আইএমএফ-এর ঋণ বড় কিছু না হলেও অন্যদের কাছ থেকে ঋণ পেতে সহায়ক হবে। হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, সামষ্টিক খাতে যে শক এসেছে তা বাস্তবতা। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুষ্টি কম পাচ্ছে মানুষ। জীবনমানের অনেক কিছুই আপস করতে হচ্ছে। কোভিডে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে, তা অনেক বড় ক্ষতি। দুই বছরের ক্ষতি প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। জাহিদ হোসেন বলেন, আইএমএফ-এর ঋণের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। অন্য সূত্র থেকেও ঋণ পেতে হবে। আর্থিক খাতে সংস্কারে সাহসী ভূমিকা নিতে হবে। আসলে সরকার চালাচ্ছে কে? এটিই এখন বড় প্রশ্ন। রাজনীতিবিদরা না আমলাতন্ত্র। সংসদের মধ্যেও অনেক সংসদ-সদস্যকে এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। আসলে রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। মোস্তাজির রহমান বলেন, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অন্যতম চ্যালেঞ্জ। রপ্তানি পণ্য পোশাক খাতের পাশাপাশি ওষুধ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্য খাতের দিকে যেতে হবে। দিনের অন্য অধিবেশনগুলোয় বক্তব্য দেন ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফা কে. মুজেরী, বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. মঞ্জুর হোসেন, সানেমের গবেষণা পরিচালক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রমুখ। আজ বিভিন্ন অধিবেশনে আরও প্রায় ৪০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে।

MFS industry ready for further jump to make cashless society

The existing top five MFS providers also have the potential to inject another about \$4 billion fresh investment alongside the industry's current investment worth about \$8 billion Bangladesh's mobile financial service (MFS) industry is getting prepared to provide a complete digital financial solution aiming to create a cashless society, said sector insiders and experts.

They also mentioned that the industry has the potential to receive another 4-5 large operators like bKash each with a \$3 billion to \$4 billion investment by the next decade to develop a digital financial ecosystem. The existing top five MFS providers also have the potential to inject another about \$4 billion fresh investment alongside the industry's current investment worth about \$8 billion, they added.

Khondokar Shakhawat Ali, a sociologist, and researcher who has been in the MFS sector since its inception said the current operators have the potential for further investments to introduce new services and products, adding that new investments are required for technology and skilled manpower.

New investments may come from foreign sources if the central bank and other regulators provide policy support to make a complaint industry, he observed. This will help to ensure financial inclusion and create more scopes for self-employment and entrepreneurs, he said.

Quality investment, robust technology, distribution network, and quality management to maintain regulatory compliance are very important in attracting new investments for further development of the sector, Khondokar Shakhawat Ali said, adding, "Regulators may set standards based on best practices within the industry and make it more competitive within the service providers."

Policy should encourage reducing the use of cash-out to minimise consumer cost and increase people's MFS literacy to make them aware of its misuse, he added.

Cybersecurity will be a major challenge in the coming days for regulators and operators, and more investments will be needed in this area by both parties, noted Shakhawat Ali. The government may introduce insurance to provide protection for consumers' money, he suggested.

In this regard, Major General (retd) Sheikh Md Monirul Islam, chief external and corporate affairs officer of bKash, told TBS that as a fintech company, bKash's main goal is to bring freedom and capability to people's financial activities by making financial transactions easy, safe and hassle-free through innovation and customer-centric services.

Besides ensuring financial inclusion in this way, bKash is playing a role in creating a strong digital ecosystem in the country, he said. In this regard, foreign investments that consistently came at the right time have been instrumental in ensuring customer comfort and safety and playing an important role in creating a sustainable business model, he added.

bKash App is playing a role in creating a digital lifestyle for all types of customers by bringing daily transactions to their fingertips, he mentioned, adding that the MFS company will continue to launch new customer-friendly services and make technological innovations in the days ahead.

Binimoy, an interoperable digital transaction platform (IDTP) launched by the government recently, will make all kinds of financial services transparent and easy in the coming days, through which salary payments, remittance sending, tax payments, utility bills payments, and e-commerce transactions will be done soon, said Monirul Islam.

"Hopefully, this will bring dynamism to the economy and facilitate socio-economic progress. The exchange is soon going to contribute significantly to the realisation of the "Digital Bangladesh" dream," added the bKash executive.

Bangladesh Post Office's digital financial service, Nagad, has gained a strong customer base within a short time of inception. Speaking about Nagad's future focus, its high officials told TBS that the company has received a handsome amount of foreign investments in different forms, and it is now waiting for the final approval of the authorities concerned to issue a zero-coupon bond worth around \$30 million.

"Besides, observing the growth trend and prospects of Nagad, a good number of international investors and tech giants are showing interest in investing in this mobile money venture. Right now, I can only say Nagad will come up with some surprises for the industry in terms of foreign investments by 2023," said Nagad Managing Director Tanvir A Mishuk. Nagad is now working on establishing a digital bank, which will help to bring the unbanked under financial inclusion and take users' life to a digital space, he added.

All financial services will be available on mobile phones over the next decade and Nagad wants to lead the market with its innovative and people-oriented services, including a good number of micro products, he further said. New entrant upay, a subsidiary of United Commercial Bank Limited (UCBL), also envisions bringing innovation to the market in terms of security, convenience, and affordability, its Chief Strategy Officer Ziaur Rahman told TBS.

"We have set a target for changing the behaviour of MFS customers and improving the total ecosystem. We are working on new initiatives such as nano loan, savings, and insurance products for our customers in cooperation with banks and financial institutions. Besides, we are also focusing on segment-specific products targeting our women customers," he said. People do not use the entire amount deposited in their MFS accounts. MFS institutions deposit the unused balance in various banks, and some invest in government treasury bills and bonds and earn huge interest.

The central bank has developed a "Trust Cum Settlement Account" policy to make sure no one can misuse customers' money.

The volume of customer deposits in MFS institutions was Tk9,293 crore in July this year. In April the highest Tk12,479 crore was deposited in the MFS accounts, while the second highest of Tk10,869 crore was in June.

Cyber security and the role of Bangladesh Bank

Cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. It's also known as information technology security or electronic information security. The term applies into a variety of contexts, from business to mobile computing, and can be divided into a few common categories. Application security focuses on keeping software and devices free of threats.

Network security is the practice of securing a computer network from intruders, whether targeted attackers or opportunistic malware. Information security protects the integrity and privacy of data, both in storage and in transit. Operational security includes the processes and decisions for handling and protecting data assets. The permissions users have when accessing a network and the procedures that determine how and where data may be stored or shared all fall under this umbrella.

The global cyber threat continues to evolve at a rapid pace, with a rising number of data breaches each year. A report by Risk Based Security revealed that a shocking 7.9 billion records have been exposed by data breaches in the first nine months of 2019 alone. This figure is more than double (112.0 per cent) of the number of records exposed in the same period in 2018. With the scale of the cyber threat set to continue to rise, the International Data Corporation predicts that worldwide spending on cyber-security solutions will reach a massive US\$133.7 billion by 2022.

Governments across the globe have responded to the rising cyber threat with guidance to help organisations implement effective cyber-security practices. In the U.S., the National Institute of Standards and Technology (NIST) has created a cyber-security framework. To combat the proliferation of malicious code and aid in early detection, the framework recommends continuous, real-time monitoring of all electronic resources.

The threats countered by cyber-security are three-fold: (1) Cybercrime includes single actors or groups targeting systems for financial gain or to cause disruption; (2) Cyber-attack often involves politically motivated information gathering; (3) Cyberterrorism is intended to undermine electronic systems to cause panic or fear.

Some common methods used to threaten cyber-security are: Malware like Virus, Trojans, Spyware, Ransomware, Adware, etc. Besides this Botnets, SQL injection, Phishing, Vishing, Smishing, DNS Phishing, Farming, Man-in-the-middle attack, Denial-of-service attack, etc are mentionable cyber attack. Dridex malware (December 2019), Romance scams (February 2020), Emotet malware (late 2019), etc are some latest cyber threats of the world. End-user protection or endpoint security is a crucial aspect of cyber security. After all, it is often an individual (the end-user) who accidentally uploads malware or another form of cyber threat to their desktop, laptop or mobile device.

The ways cyber-security measures protect end users and systems are discussed here. First, cyber-security relies on cryptographic protocols to encrypt emails, files, and other critical data. This not only protects information in transit, but also guards against loss or theft.

Here are some top cyber safety tips: update your software and operating system, use anti-virus software, use strong passwords (not easily guessable), do not open email attachments from unknown senders (these could be infected with malware), do not click on links in emails from unknown senders or unfamiliar websites (this is a common way that malware is spread), avoid using unsecure WiFi networks in public places (unsecure networks leave you vulnerable to man-in-the-middle attacks), etc. Bangladesh bank has taken different measures regarding cyber security.

Different training and awareness program are arranged on a regular basis through IT departments and Human resources department. Bank has already formed a separate Cyber Security Unit (CSU) and appointed a security specialist from outside who is posted as the head of that unit. CSU is responsible for ensuring IT security, information security and cyber security of Bangladesh Bank. Besides, Bangladesh Bank has published EOI for PCI DSS certification and evaluation is going on.

Moreover, ISO 27001 certification is under process. Both IT departments and PSD are working on this issue. As per the instruction of Ministry of ICT and Ministry of Finance Bangladesh Bank asked all banks and NBFIs to get PCI DSS and ISO 27001 certification with the mentioned deadlines.

Bangladesh Bank is going to implement Security Operation Center (SOC) soon. Security Information and Event Management (SIEM), Anti Advanced Persistent Threat (Anti-APT), Privileged Access Management (PAM) solutions are going to be implemented soon. Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) is performed through Information Systems Development and Support Department (ISDSD), ICT Infrastructure Maintenance and Management Department (ICTIMMD) and Cyber Security Unit (CSU) to protect valuable data and systems from malicious attacks.

The Top 10 Cybersecurity Threats to Digital Banking and How to Guard Against Them

Financial institutions are among the most targeted organizations for cyberattacks. With millions of customers and their sensitive data, cybersecurity is among the most critical issues facing the financial sector today. Whether a digital-only bank or one with brick and mortar branches, the challenges to each are similar, but as our world pushes further into the digital frontier, banks that want to meet demand without compromising safety must overcome several important cybersecurity challenges. With a variety of cyber threats to contend with, a discerning financial institution would do well to proactively guard against them.

Remote Work

Since the onset of COVID-19, remote work is no longer the exception but the default approach to getting work done. While many financial institutions moved to remote work arrangements out of necessity, employees continue to stay home out of preference.

Remote work in the banking sector does require diligence when it comes to cybersecurity. People working from home, coffee shops or elsewhere lack the protection of an office's physical cybersecurity defenses and this can complicate the ability for IT to keep internal software safe, and customer sensitive data out of malicious hands.

The cybersecurity challenge here is best handled by proactively educating employees on what to look for and how to stay safe while in the remote work environment. This will help prevent the possibility of data breaches and lead to a more productive workforce.

Software Supply Chain Cyber Attacks

A popular method of malware distribution is to target a software vendor and then use their distribution channels to deliver malicious code to customers. This attack propagates through the supply chain in the form of products or updates that appear to be legitimate. While these attacks may involve third party services, it's not uncommon for an attacker to embed their malicious code in illegitimate updates from the primary vendor. These attacks compromise the distribution systems and enable attackers to enter the supplier's networks and persist over the systems for a significant length of time.

Supply chain attacks are best prevented through being proactive in vulnerability scanning and educating customers on how cyber attackers may gain access to their personal information through updates.

Phishing

Phishing attacks remain one of the biggest threats in the banking sector and have been a favorite tool for cyber attackers in the modern digital world. Malicious agents use disguised emails or domains to trick individuals into downloading malware or giving away personal information, which is otherwise known as credential phishing.

Employees and customers are both at risk of phishing at a banking industry. Attackers may send emails disguised as official bank correspondence to customers, which can prove effective for stealing financial information. Likewise, employees must be on the lookout for phishing that seeks login credentials to access customer information.

Social Engineering

Phishing goes hand-in-hand with social engineering but they could have different objectives and social engineering can also involve whaling attacks. Customers and employees are often the most vulnerable link in the security chain, they can be tricked into giving over sensitive details and credentials.

Social engineering takes many forms, it might be through phishing or whaling attacks or it could be by sending bogus invoices that purport to be from a trusted source. It's important to keep your employees informed about social engineering tactics and how these threats continue to evolve.

Malware And Ransomware

Malware and ransomware attacks are among the most dangerous threats over the last couple of years. The threat isn't limited to financial services either, most industries are vulnerable to malware and ransomware attacks. These destructive malware attacks are becoming more common and more advanced.

Organizations use more modern cybersecurity tactics to defend against these advanced threats and to mitigate security vulnerabilities here. Behavioral analysis, AI and machine learning are becoming common cybersecurity tools for use as a first line of defense against these prevalent threats. Bank's cybersecurity needs to evolve to content with the greatest cybersecurity threats and avoid a reputation damaging data breach.

Cloud-based Cybersecurity Threat

As more software systems and data are stored and enabled in the cloud, attackers have leveraged cloud-based attacks to capture sensitive information have seized upon this and there's been an increase in cloud-based attacks. Banks need to ensure that the cloud infrastructure is configured securely to protect from harmful breaches.

Customer Behaviors

Customer behavior can put data at risk just as much as employee behavior can. In some cases the consequences for poor security practices from digital banking customers can compromise their information in seconds. Everything from reusing passwords to opening suspicious emails can quickly result in losing sensitive financial data.

There are a few ways digital banking organizations can prevent breaches due to customer errors. Using well-designed mobile apps with a streamlined user experience and built-in security functions can help mitigate some of the risk. A discerning user might utilize the fingerprint scanner on their phone or another multi factor authentication method to access their account instead.

Spoofing

Spoofing is similar to phishing but often more complex. There are a few types of spoofing attacks, all utilizing some form of impersonation. Domain spoofing consists of creating a fraudulent version of an actual domain meant to trick users into giving away login credentials and personal information. This tactic bets on the likelihood that people will not look closely if a website appears to be legitimate.

Another form of spoofing involves fabricating a financial institution's phone number to call or text customers. The bank's correct caller ID will show up on the customer's phone, making it difficult for customers to tell if it is a legitimate message or not.

Unencrypted data

Along with unprotected mobile applications, unencrypted data is a massive threat to financial institutions of all sizes. Should hackers seize your unencrypted data, they can use it right away, which will create serious problems for your organization. All data should be encrypted; even if would-be thieves stole it, they would face the hurdle of attempting to unencrypt it.

Fraud And Identity Theft

Fraud and identity theft has always been around. And while these attacks aren't new to financial institutions, they're evolving through more digital channels. Now fraud and identity theft can be conducted through other cyber attack channels, and digital tactics may make it more difficult to detect.

Digital banking organizations must implement cybersecurity strategies that actively search for suspicious account activity to fight these attacks on the virtual front. This is one of the surest ways to catch fraud attempts.

Banking Security With GuardRails

Cyberattacks are becoming more common and sophisticated each year. Whether the cyber attackers look to mask themselves as third party vendors or implement new spoofing techniques to steal data, it's important to keep ahead of the game and implement a platform that's built to help streamline your security processes.

More consumers are turning to the internet for their tasks. A reactive approach to protecting the bank's network is a sure fire way to leave the risk of cybersecurity attacks on the table. Banking institutions need to remain at the forefront of cybersecurity innovations in today's digital banking environment. GuardRails has the tools your development and security teams need to learn best practices and develop new features safely and with less friction from cybersecurity.

Transition to renewables a must to ensure energy security for Bangladesh

The recent fuel price hike has adversely affected the country's power generation capacity which resulted in the return of power outages after a decade. The present situation has reaffirmed the case for Bangladesh's energy transition towards clean energy sources. With a population of around two billion, South Asia is considered as one of the vibrant economic regions due to its geographic location, market potential, and its diverse cultural background. And Bangladesh is one of the fastest growing economies in the region and in the energy domain, and it has achieved significant success in recent years.

Last year, the country announced its milestone success of bringing 100% of its population under electricity coverage. Bangladesh's present generation capacity stands at 25 GW and the per capita energy consumption is 560 kWh.

Bangladesh's electricity generation mix is greatly dependent on heavily subsidised domestic sources of natural gas, whose share represent 44.5% of the total generation mix, followed by imported Heavy Fuel Oil (HFO) and Diesel (HSD). But the recent fuel price hike has adversely affected the country's power generation capacity which resulted in the return of power outages after a decade.

The present situation has reaffirmed the case of Bangladesh's energy transition towards clean energy sources. Bangladesh has made significant strides towards renewable energy power generation, primarily dominated by solar, since 2003.

Renewables currently represent 3.69% of the country's electricity generation mix with more than 950 MW generation. More than 2,000 MW of large-scale grid-integrated solar parks are in the pipeline which are expected to be operational by the end of 2024. Bangladesh also has significant potential in rooftop solar as well as onshore wind projects.

The government's recently published policies are clearly indicating a shift in energy resources towards a more sustainable and cleaner option. The global cost reduction of solar and wind power generation since 2015 has also augmented the case for the clean energy transition.

The Eighth Five Year Plan targets to add 2,300 MW electricity from renewable energy resources by 2025. The Power System Master Plan 2016, which is now being reviewed, has already stated 10% of total installed capacity will come from renewable energy resources by 2041. The updated Nationally Determined Contributions (NDC) submitted to the UNFCCC commits to generating more than 4,000 MW of electricity from renewable energy by 2030, subject to support from international climate finance.

The Mujib Climate Prosperity Plan (MCP), named after the Founding Father of Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, has declared a national investment strategy for the deployment of maximised domestic renewable energy potential up to 2030.

The plan speaks of the potential of adding 16,000 MW of renewables into the electricity generation mix for which an investment of \$10 billion will be required in the next 10 years. Implementation of this plan will ensure government savings of at least \$1.7 billion per year due to the purchase of electricity from renewable energy at a cheaper price compared to that of fossil fuels.

The maximum potential of renewable energy resources within Bangladesh is solar with an average Global Horizontal Irradiation of 4.6 kWh per metre square. An analysis of the MCP regarding the renewable energy resource potential published by Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) has estimated that by 2030, Bangladesh can generate 6,000 MW of electricity from solar alone comprising utility-scale grid-tied projects, rooftop solar, solar irrigation pumping systems and floating solar projects. Bangladesh can also generate an additional 600 MW of electricity from onshore wind projects in the southern districts.

Bangladesh has more than \$1 billion available from various development partners for scaling up solar energy resources within the country. IDCOL is already managing various credit lines from the World Bank, Asian Development Bank, KfW, and AIIB, prioritising grid-tied large projects and rooftop solar. Private commercial banks and other financial institutions have also been mobilising financing for renewable energy projects.

Bangladesh is on a course to graduate from the least developed country status in 2026 and become a developed country in 2041. The volatility of the fuel prices and large subsidies may diminish the competitiveness of Bangladesh's energy market. Within this context, low-cost renewable energy could offer significant benefits to ensure energy security in Bangladesh.

Blue Economy and the opening of new horizons in Bangladesh

The sea is called the lungs of the earth. The land beneath the sea is a world full of diversity and abundance of life. Professor Gunter Pauli, an Australian citizen, gave the first idea of the huge economic potential. In 2010, at the invitation of the United Nations, the idea of formulating an environmentally friendly sustainable economic framework was expressed in his speech.

Blue economies are the water resources of the oceans, the resources of the oceans and the economies that surround the oceans. Blue Economy means the color of the sea is blue. That is why the sea-centric economy is called Blue Economy. The main components of Blue economy are mineral resources, water resources, transportation services, energy resources, tourism industry etc. The planned use and sustainable development of these will bring huge potential to the maritime economy. Like other countries in the world, Bangladesh will be able to use its marine resources for economic development.

Bangladesh has already established absolute sovereignty and sovereignty over 1,17,173 square km of waters from the International Court of Justice (ICJ) on March 14, 2012 over the dispute over the Bay of Bengal with Bangladesh and Myanmar through historic sea conquest. The mineral resources of the Bay of Bengal in the south of our country are not found in any other sea or bay in the world and it is said that whoever controls the Bay of Bengal will control the whole of South Asia. That is why the superpowers are trying to occupy the Bay of Bengal.

Blue Economy is becoming more and more popular in the world at present. By 2050, the world's population will be about 950 million. We have to lean towards sea resources as we are forced to provide food to this huge population. The developed nations of the world are already harnessing marine resources and increasing their economic growth. Ninety percent of Indonesia's national economy is dependent on the sea, and the government has already taken steps to ensure that, if implemented successfully, the value of resources extracted from the sea would be 10 times the budget. Australia currently earns 44 billion from their marine resources. Now the question is what are the future prospects of blue economy in the dark bay of maritime resources of Bangladesh, how will Bangladesh be able to create employment through blue economy and what will be the future economy of Bangladesh ??

There is a gulch like area in the Bay of Bengal in Bangladesh, which is about 6 km long and is known as a fish sanctuary. There are 450 species of fish, 337 species of snails and oysters, 6 species of turtles, 36 species of shrimps, 10 species of dolphins and 5 species of lobsters in the Bay of Bengal. These include the economic demand for snails, snails, shellfish, crabs, octopuses, and sharks, and are widely considered as food in many countries. There are also marine weeds, creepers, shrubs. Medicinal weeds from the Bay of Bengal are processed to make medicines for various diseases and among these weeds, *Espirulina* is the most valuable which is consumed as food in China, Japan and various European countries. It is possible to make different types of sauces, bitumen, etc. from marine fish with food, fish oil, which will result in employment and earn huge amount of foreign exchange. There is also a lot of demand for tuna fish in the Bay of Bengal.

According to the Bangladesh Atomic Energy Commission, the total mineral reserves in the beach sand are 4.4 million tons. Of this, the actual stock is 16 lakh 44 thousand tons. Out of 16 types of minerals in the Bay of Bengal, there is a possibility of extraction of 1 million tons of mineral sand in 13 places. Molybdenum, manganese, crust, copper, lead, zinc, sulfide are found in the deep sea floor and raw material clays of cement industry have been found 30 to 60 km deep in the bottom of the sea. Monazite is a very valuable substance in mineral sands and is used in atomic bombs and nuclear reactors. At the bottom of the Bay of Bengal there are ores called manganese edible, phosphorus deposits, polymetallic sulfide. These ores refine rare metals, including cobalt and lead, and can be used in shipbuilding and chemical plants. There are also gems, pearls, gold, silver, corals and other precious gems.

Precious metals uranium and thorium have been found in the deep and shallow seas of the Bay of Bengal. It is expected that 1-5 metric tons of salt will be exported if advanced technology is used in the production of good commercial salt along the coast. Black gold is found in Maheshkhali, Teknaf, Nijhum Island, Kuakata in Cox's Bazar which is affecting our economy.

There is darkness in the gas field in the Bay of Bengal. There are 200 trillion cubic feet of gas reserves in 23 blocks of the Bay of Bengal from which crores of rupees can be earned.

There is potential tourism industry around the Bay of Bengal. Various industries will be formed around this industry and there will be huge employment. Millions of tourists will flock to enjoy the natural beauty of the Bay of Bengal.

There is a possibility of increasing international trade through the Bay of Bengal. Bangladesh is already building international standard ships and exporting them abroad and at present Bangladesh is in the 3rd position in ship exports. The ship breaking industry is also gaining popularity in the world.

Businesses can be expanded locally and internationally through the resources extracted from the sea. The demand for local products in Cox's Bazar and Kuakata markets is high among tourists. Demand for this specialty has grown significantly as a result of recent corporate scandals.

The Blue Economy is not only the expansion of the ocean economy, but also the opening up of eco-friendly new horizons by mitigating the risks of climate change. In addition, the role of the sea in poverty alleviation, increase in capital flows, investment-friendly environmentally friendly infrastructure development, reduction of unemployment, job creation, elimination of regional and gender disparities and sustainable development is immense. About 80 percent of human food and livelihoods and world trade is handled by sea.

It is possible to implement the Blue economy by making proper use of the resources of the Bay of Bengal in Bangladesh. The Bay of Bengal is considered as the "mine of gems" of Bangladesh. The Bay of Bengal, the heart of South Asia, is of great commercial importance as it is easy to communicate with different countries. The Government of Bangladesh has already set up an "Oceanographic Research Institute" in Cox's Bazar district to take the Blue economy forward. Again, maritime economy has been given priority in the master plan of Bangladesh Delta Plan-2100. The Blue Economy Cell was formed in 2014. Therefore, with the proper utilization of the resources at the bottom of the Bay of Bengal, the wheel of Bangladesh's economy will turn and the future has bright aspects.

A focus on climate challenges in Bangladesh

Bangladesh is ranked seventh among the most climate vulnerable countries in the world, but its contribution to global warming is negligible. It contributes less than half of 1 percent of all greenhouse gas emissions.

The average sea level rise along the coast of Bangladesh has been 3.8-to-5.8 millimeters a year over the last 30 years, according to a recent study. And that continues. In fact, without changes to global behavior, Bangladesh would see annual economic costs due to global warming equal to 2 percent of its Gross Domestic Product by 2050, widening to 9.4 percent by 2100. The people most impacted would be the poorest Bangladeshis.

To be precise, a one degree rise in average world temperature would increase sea levels by about a meter, which would flood a fifth of Bangladesh. If that happens, 30 million people in Bangladesh would be forced to flee their homes. Bangladesh is likely to have more than half of South Asia's "climate migrants" by 2050 if warming trends continue, according to the World Bank.

But the Bangladesh government is steadily improving its climate resilience. It has added to its constitution a requirement to protect the environment and natural resources. To that end, it will soon adopt a series of climate mitigation programs including the 20-year Mujib Climate Prosperity Plan and the Delta Plan 2100. The Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, which already is underway, is focused on adaptation and on mitigation. An updated plan will add natural-resource management and urban development.

In the meantime, Bangladesh has made astounding economic progress. Its Gross Domestic Product per capita has increased eightfold since 1990. It recently surpassed India in GDP per capita. And for most of the last decade, it eclipsed Pakistan's economy, too. Bangladesh's exports rose to a record of \$52.1 billion in fiscal year 2022. HSBC Bank has predicted that Bangladesh would be the world's 26th largest economy by 2030 due in large part to its average annual GDP growth of 6 percent during the last twenty years.

Strong economic growth has provided the government with the wherewithal to combat climate change. The Bangladesh Climate Change Trust Fund, established more than a decade ago, has spent \$480 million on 800 research, mitigation, and adaptation projects. Over the last seven years, the government's climate related spending has doubled from \$1.44 billion to \$2.96 billion in fiscal 2022.

Bangladesh is committed to developing a low-carbon economy. It has renewable energy projects underway that will produce 911.8 megawatts of electricity and combined-cycle gas-based power plants that will produce 3,208 megawatts of power. It has helped install 6 million solar home systems and more than 4.5 million environmentally friendly stoves. Prime Minister Sheikh Hasina canceled 10 coal-based power plants worth \$12 billion of foreign investment.

To guard against rising sea levels, Bangladeshi islanders are planting oysters and curating oyster-encrusted reefs. This reduces coastal erosion by calming ocean waves before they reach shore. To increase oxygen creation and prevent damage caused by severe weather, mangroves have been replanted in large numbers. The mangroves' roots, trunks, and leaves obstruct the flow of water, reducing water flow speeds by 29 percent to 92 percent.

To accelerate reforestation, the government introduced the Social Afforestation Program, which encourages people to plant and raise trees. As a result, Bangladesh has tripled its forest coverage, from 7 percent in 2005 to 22.5 percent in 2021. Bangladesh also has worked closely with scientists to increase the diversity and resilience of crops to hinder flooding. Floating gardens built out of paddy straw and aquatic plants create organic islands capable of producing squash, okra, and gourds while withstanding increased flood waters. Salt-tolerant seeds allow Bangladeshi farmers to plant potatoes, carrots, groundnuts, red beets, cabbages, and Indian spinach in salty soil.

In addition, Bangladesh has turned to nuclear power. It started construction of its first nuclear power reactor in November 2017. The unit is scheduled to be commissioned next year. Construction on a second reactor began in July 2018. Other countries have noticed Bangladesh's initiatives. Aditya Pillai of the New Delhi-based Centre for Policy Research said, "Bangladesh has incrementally improved its capacity to adapt to climate change over the last fifteen years. Along the way, it's developed a model that holds lessons for South Asian peers." Climate change has not spared Bangladesh, but the government has taken the lead in pushing back against its worst impacts.



বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষণা উপলক্ষে গভর্নর এর বক্তব্য

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য গৃহীত মুদ্রানীতির লক্ষ্য, ভঙ্গি ও কৌশল এবং অর্থ ও ঋণ কর্মসূচী সম্বলিত ‘মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট (এমপিএস)’ প্রকাশ উপলক্ষে আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রতিনিধিবৃন্দ এবং উপস্থিত সকল সহকর্মীবৃন্দ আপনাদেরকে জানাই উষ্ণ শুভেচ্ছা ও সুস্বাগতম।

০২. করোনা মহামারীর কারণে বিগত দুই বছর যাবৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি আপনাদের সামনে সরাসরি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে প্রতিবারই তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার পাশাপাশি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হওয়ায় মুদ্রানীতি ঘোষণার উদ্দেশ্যে এবছর আমি আপনাদের সামনে সরাসরি উপস্থিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত।

০৩. প্রথাগতভাবে মুদ্রানীতি প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নীতি নির্ধারণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান যেমন - বাংলাদেশ ব্যাংক বোর্ডের বর্তমান সদস্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর, সাবেক অর্থ সচিব, অর্থ উপদেষ্টা, অর্থনীতির অধ্যাপক ও গবেষক, সাংবাদিক এবং আর্থিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করা হয়ে থাকে। করোনা মহামারীর কারণে বিগত দুই বছর যাবৎ মুদ্রানীতির অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ ইমেইল মারফত সংগ্রহ করা হলেও এ বছর তা সরাসরি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। মুদ্রানীতি প্রকাশের এই দিনে আমি ঐ সকল মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

০৪. বর্তমানে ভয়াবহ বন্যায় কবলিত দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের প্রতি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করার সাথে সাথে অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ্মা সেতু নির্মানের সফলতায় গর্ব ও আনন্দ প্রকাশ করে আমি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল বিষয়বস্তু আলোচনা শুরু করছি। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, কোভিড-১৯ এর অনাকাঙ্খিত অভিঘাত ও ভূ-রাজনৈতিক সংকটের কারণে বর্তমান বিশ্ব এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তবে কোভিড-১৯ এর কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে করোনা সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ায় এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করায় বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালেও ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সেখানে এক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ফলে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ আউটলুক (এপ্রিল ২০২২) অনুযায়ী ২০২২ ও ২০২৩ সালে বিশ্ব উৎপাদন ৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা ইতোপূর্বে (জানুয়ারী ২০২২) ঘোষণাকৃত প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেকটা কম।

০৫. করোনার প্রভাব কাটিয়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শক্তিশালী হলেও সরবরাহ চেইনে সমস্যা থাকায় বিশ্ব চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিয়েছে। ফলে ২০২১ সালের শুরু থেকেই বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলসহ সকল ধরণের পণ্য মূল্যে উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তা চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আরো বেগবান হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ প্রক্ষেপণ (এপ্রিল ২০২২) অনুযায়ী ২০২২ সালে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে ৫.৭ ও ৮.৭ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা ইতোপূর্বে (জানুয়ারী ২০২২) যথাক্রমে ৩.৯ ও ৫.৯ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এমতাবস্থায়, মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরো অঞ্চল ও ভারতের মতো অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার বাড়ানোর মাধ্যমে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পথ অনুসরণ করছে।

০৬. করোনার প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিও বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে বিশ্ব উৎপাদন ৩.১ শতাংশ হ্রাস পেলেও বাংলাদেশের জিডিপি (অর্থবছর হিসেবে) ৩.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বিবিএস এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১ ও ২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আকর্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬.৯৪ ও ৭.২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলত সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কাংখিত মাত্রায় অর্জিত হয়েছে। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মার্চ ২০২০ হতে গৃহীত যেসব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সহায়ক উদার নীতি ২০২২ অর্থবছরেও অনুসরণ করা হয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - স্বল্প মাত্রার রিজার্ভ অনুপাত ও নীতি সুদহার এবং উচ্চ মাত্রার ঋণ-আমানত অনুপাত নীতি অনুসরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট রক্ষিত অতিরিক্ত সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রেয়ের উপর গুরুত্বারোপ অক্ষুন্ন রাখা, ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো সুবিধা চালু রাখা এবং করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহ যেমন- কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু রাখা। এছাড়া, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণ, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহও জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মার্চ ২০২০ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ২,০০৪,২৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ (ইডিএফ এর মাধ্যমে প্রদত্ত ২৯,৭৫০ কোটি টাকাসহ) গৃহীত হয়েছে যার মধ্যে ১,৬৮,৭৫০ কোটি টাকার ১০টি প্যাকেজ বাস্তবায়নের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি যুক্ত রয়েছে।

০৭. ২০২১-২২ অর্থবছরে মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কাংখিত স্তরে পৌঁছলেও মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিদ্যমান অতিরিক্ত তারল্য যাতে মূল্যস্ফীতি সৃষ্টিতে সহায়ক হতে না পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যু করে বাজার হতে অতিরিক্ত তারল্য উত্তোলন করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকার অতিরিক্ত অবমূল্যায়ন রোধকল্পে নিয়মিতভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করা হচ্ছে। ২৯ মে ২০২২ তারিখে নীতি সুদহার হিসেবে বিবেচিত রেপো সুদহার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৪.৭৫ হতে ৫.০০ শতাংশ করা হয়েছে। তথাপি মে ২০২২ মাসে বাংলাদেশে গড় সাধারণ মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৫.৯৯ শতাংশ যা জুন ২০২২ এর জন্য নির্ধারিত ৫.৩০ শতাংশ সিলিং এর তুলনায় অনেক বেশি। মূলত বিশ্ব বাজারে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সূত্রে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি এবং করোনা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৮. এক্ষেত্রে, ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য গৃহীত অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীর বিপরীতে প্রকৃত অর্জনের একটি তুলনামূলক চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক। মে ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জুন ২০২২ এর জন্য প্রাক্কলিত মুদ্রানীতির নমিনাল এংকর তথা ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (এম২) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৯.১ শতাংশ যা অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীতে ধরা হয়েছিল ১৫.০ শতাংশ। মূলত আমদানি ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং রেমিটেন্স অন্তঃপ্রবাহের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির সূত্রে ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরে এম২ এর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। তবে করোনার বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের প্রবৃদ্ধি ভালো হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং খাতের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছেছে। প্রাক্কলিত তথ্যানুযায়ী জুন ২০২২ শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৭.৯ ও ১৩.১ শতাংশ যেখানে তা অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীতে ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ৩৬.৪ ও ১৪.৮ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ প্রাপ্তি ভালো হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেকটা কম হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, করোনা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার সূত্রে অর্থের আয় গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এম২ এর প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে অসুবিধা হয়নি। অন্যদিকে এম২ প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় তা মূল্যস্ফীতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়েছে।

৯. সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুসরণ করার সূত্রে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দিকে ব্যাংকিং খাতে অস্বাভাবিক মাত্রায় অতিরিক্ত তারল্য বিদ্যমান থাকলেও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক mop-up নীতি (বিবি বিল ইস্যু করার মাধ্যমে) অনুসরণ করার পাশাপাশি টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রির কারণে অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে গড় ভারীত আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে মে ২০২২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৪.৭৩ শতাংশ যেখানে তা জুন ২০২১ শেষে ছিল ২.২৫ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ধারার কতিপয় ব্যাংকে নগদ অর্থের পরিমাণ কম থাকা সাপেক্ষে আন্তঃব্যাংক কলমানি হার বৃদ্ধি পেলেও ইসলামি শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত অনেক ব্যাংকের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ রয়েছে। এছাড়া, আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহার বৃদ্ধি পেলেও এখনও তা মোটামুটিভাবে সুদহার করিডর অর্থাৎ রেপো ও রিভার্স রেপো সুদহারের মধ্যে অবস্থান করছে এবং সুদহারের বিস্তারসহ মেয়াদি ঋণের সুদহার নিম্নমুখী রয়েছে।

১০. ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় এবং আমদানি ব্যয় উভয়ের প্রবৃদ্ধি অনেকটা বেশি হলেও রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম এবং অন্তঃমুখী রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়ায় চলতি হিসাবের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় ও রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৪.০৯, ৩৯.০১ ও (-) ১৬.০ শতাংশ যেখানে তা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৩.৬৪, ১৭.৩০ এবং ৩৯.৫০ শতাংশ। ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে তা ছিল মাত্র ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য সময়ে চলতি হিসাবের ঘাটতি বেশি হলেও আর্থিক হিসাব উদ্বৃত্ত হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ঘাটতি কমে ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক লেনদেনের ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি টাকার বিনিময় হারের উপর অবচিতি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২৭ জুন ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে তা জুন ২০২১ শেষে ছিল ৪৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একইভাবে, ২৭ জুন ২০২২ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৯২.৯৫ যেখানে জুন ২০২১ শেষে ছিল ৮৪.৮১।

১১. বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং সম্প্রতি সংঘটিত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যার অর্থনৈতিক প্রভাব পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য মুদ্রানীতির মূল চ্যালেঞ্জ হবে টাকার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মান অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখা। একইসাথে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সমর্থন অব্যাহত রাখাও আসন্ন মুদ্রানীতির জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সে বিবেচনায় মূল্যস্ফীতি ও টাকার বিনিময় হারের ঊর্ধ্বমুখী চাপকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার নিমিত্তে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে যা কিছুটা সংকোচনমুখী (cautious policy stance with a tightening bias)। সে আলোকে পুরো অর্থবছরের জন্য অর্থ ও ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বাজেট বক্তৃতার তথ্যানুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সরকারের কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো যথাক্রমে ৭.৫ ও ৫.৬ শতাংশ।

১২. দেশের আর্থিক খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পুঁজিবাজারের সার্বিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অতীতের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও সচেষ্ট থাকবে। উল্লেখ্য যে, পুঁজিবাজারে তারল্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিলের আকার ১৫৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ১০০৯ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এই তহবিল হতে ২৮০ কোটি টাকা ছাড় করার পাশাপাশি পুঁজিবাজারে প্রতিটি ব্যাংকের বিনিয়োগের জন্য ২০০ কোটি

টাকার বিশেষ তহবিল গঠনের সুবিধার আওতায় রপোর মাধ্যমে ২১৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে যা পুঁজিবাজারের তারল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

১৩. ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রণীত অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (এম২) প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২.১ শতাংশ, যা সরকারের কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সিলিং এর সমষ্টির তুলনায় কিছুটা কম। মূলত করোনা পরিস্থিতি উন্নত হওয়া সাপেক্ষে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার হওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থের আয় গতি বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করে এম২ এর প্রবৃদ্ধি কিছুটা কম ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, করোনার বিরূপ প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে অর্থের আয় গতি ২০২০ ও ২০২১ অর্থবছরে হ্রাস পেলেও ২০২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪. ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রক্ষেপিত এম২ প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির (১৫.০ শতাংশ) তুলনায় কম হলেও তা জুন ২০২২ এর জন্য প্রাক্কলিত ৯.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি কিছুটা ঋণাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ১২.১ শতাংশ এম২ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি খাতে ১০৬৩ বিলিয়ন টাকা বা ৩৯.৪ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ১৪.১ শতাংশ ঋণ বৃদ্ধি করা সহ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা অব্যাহত থাকার সূত্রে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে উর্ধ্বমুখী থাকার সম্ভাবনা থাকলেও উচ্চ ভিত্তির কারণে এগুলোর প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের তুলনায় কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিটেন্সের অন্তঃপ্রবাহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তথাপি আমদানি ব্যয়ের ভিত্তি ইতোমধ্যে অনেকটা বড় হওয়ার সূত্রে সার্বিক লেনদেনের স্থিতি ঋণাত্মক হওয়ায় ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৫. মুদ্রানীতির লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য যেসব নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা এখন আপনাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

(ক) চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের পাশাপাশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাতসমূহে ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে নীতিহার হিসেবে বিবেচিত রেপো সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে বিদ্যমান ৫.০০ শতাংশ হতে ৫.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করা;

(খ) আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নতুন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা; এবং

(গ) বিলাস জাতীয় দ্রব্য, বিদেশী ফল, অপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন - অ-শস্য খাদ্যপণ্য, টিনজাত ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এগুলোর এলসি মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।

১৬. পরিশেষে বরাবরের মতো এবারও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ইতিবাচকভাবে জনসম্মুখে তুলে ধরবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি।

জয় বাংলা! বাংলাদেশ চিরজীবী হোক!!

৩০ জুন ২০২২

ফজলে কবির
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

সাম্প্রতিক সম্পাদকীয়

RESEPHS CAREER CARE

কার্যকর মুদ্রানীতির জন্য কাঠামোগত যেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া জরুরি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেগবান করার ক্ষেত্রে মুদ্রানীতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ণ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এটি অধিক প্রয়োজ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারা মুদ্রানীতি, যা মনিটারিং পলিসি স্টেটমেন্ট (এমপিএস) নামে পরিচিত, তার মাধ্যমে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনে কাজ করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতির ক্রিয়াকলাপের জন্য একক ক্ষমতার অধিকারী।

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৬ সাল থেকে মুদ্রানীতির বিবরণ বা এমপিএস প্রতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রণয়ন করে আসছে। কিছু সময় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, ছয় মাসের পরিবর্তে এক বছরের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের এমপিএস ১২ মাসের জন্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ ব্যাপক। তাদের কার্যক্রমসহ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম হলো— উঁচু নৈতিক মানদণ্ডের অধিকারী দক্ষ এবং প্রতিশ্রুতিশীল পেশাজীবীদের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে দূরদর্শী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বিকশিত হওয়া, সঠিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তদারকি জোরদারের পাশাপাশি বাংলাদেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে দ্রুত ও বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে সহায়তা দেয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে যেসব কার্য সম্পাদন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ঋণ ও আমানত নীতি প্রণয়ন, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, পেমেন্ট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা, বৈদেশিক বিনিয়োগ বাজার নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা। এছাড়া রাজস্ব, মুদ্রানীতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মপন্থার মিথস্ক্রিয়া ও প্রভাব সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেয়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলো হলো— মুদ্রানীতি প্রণয়ন, সরকারি ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করা। বেশির ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরই বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীলও বটে। বিভিন্ন খাতে আর্থিক কর্ম সম্পাদনও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুরোপুরি যথার্থ কিন্তু এগুলো অর্জন করা বড় চ্যালেঞ্জের। কাজ করতে গিয়ে তাদেরও নানা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপমুক্ত থেকে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক সাম্প্রতিক সময়গুলোতে কার্যকর মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের চাপের কাছে অনেক সময় তাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় দুর্নীতির বিস্তার, নন-পারফর্মিং লোন বৃদ্ধি, সুশাসনের অভাব, দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংকের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যাওয়া নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ (ব্যাংকের নিজস্ব ক্ষেত্রে) এবং বহিরাগত (ব্যাংকের আওতার বাইরে) উভয় ক্ষেত্রেই নানা বাধা রয়েছে। এগুলো অপসারণ করা কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি।

ব্যাংক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকাস (বিএবি) এবং ব্যাংকের সিইও/এমডিদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ব্যাংক খাত নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ইত্যাদি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোও আর্থিক নীতি নির্ধারণে চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী হিসেবেও কাজ করে।

বাংলাদেশে ব্যাংক খাত নিয়ন্ত্রণে দ্বৈত পদ্ধতি রয়েছে। সোনালী, রূপালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংকের মতো বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড (বেসিক ব্যাংক লিমিটেড), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের (বিডিবিএল) মতো বিশেষায়িত ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংকের মতো কিছু সংবিধিবদ্ধ ব্যাংক রয়েছে।

সব বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশী ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব ব্যাংক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতা রয়েছে।

আর্থিক খাতের সংস্কার ও তাকে পুনরুজ্জীবিত করা (ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পুঁজিবাজার) এবং আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংকগুলোর ভূমিকার ক্ষেত্রে আর্থিক বহির্ভূত উদ্যোগ ও অধিক উদ্ভাবনমূলক আর্থিক পণ্য যেমন তহবিল, উপাদান, বিপণনযোগ্য সিকিউরিটিজকে কার্যকর করে তোলার সময় এসেছে। এর সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনারও উন্নয়ন ঘটতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আমি নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ এবং আর্থিক রূপরেখার ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার, যা বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো কার্যকর ও সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন, সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করব। তারপর কিছু কাঠামোগত ইস্যু তুলে ধরব, যা আলোচনায় আসা দরকার। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা এবং জটিল উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যেসব নিয়মকানুন প্রয়োজন, সেগুলোর ওপর আলোকপাত করব।

নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সংস্কার: বাংলাদেশে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো গত কয়েক বছরে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অধীনে কাজ করেছে। নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তারা সে ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছে বলে দাবি করা যাবে না। তাদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যা দূর করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রয়োজন।

মুদ্রানীতি সংস্কার: এক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হচ্ছে অর্থনীতির জন্য মুদ্রানীতিকে অধিক কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ‘রেপো’, ‘রিভার্স রেপো’, সরকারি সিকিউরিটিজ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রণীত একটি দলিল। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবার জনগণের সামনে মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক এটি প্রস্তুত করে। এরপর ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছরের জানুয়ারি ও জুলাই মাসে ষাণ্মাসিক মুদ্রানীতি ইস্যু করা হতো, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসনের একটি উদাহরণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হলো—

- ✓ ১. ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল থ্রি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করে এবং ২০১৯ সালের শুরু থেকে ঋণ, আমানত ও মূলধনসংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়।
- ✓ ২. ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জোর দেয়া হয় এবং সবুজ অর্থায়ন নীতি গ্রহণ করা হয়।
- ✓ ৩. বিভিন্ন বৈরা পরিবেশে টিকে থাকতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি পরীক্ষার নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছিল।
- ✓ ৪. নিবিড়ভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাংকগুলোতে স্বতন্ত্র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট চালু করা হয়।
- ✓ ৫. ব্যাংকগুলোকে স্বতন্ত্র পুঁজিবাজার সহায়ক নীতি প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। তারা এখন যত্নসহকারে পুঁজিবাজার উন্নয়নে কাজ করছে।
- ✓ ৬. করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) ক্ষেত্রে ব্যাংকের অংশগ্রহণ বাড়তে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।
- ✓ ৭. মানি চেঞ্জার, বীমা কোম্পানি এবং ডাক বিনিময় সংস্থাগুলোকে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং কমব্যাটিং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সের (সিটিএফ) আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে বলা হয়।

■ প্রয়োজনীয় সংস্কার

এ পর্যায়ে আমি কিছু বিষয় উল্লেখ করব, যা আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ অবস্থান ও নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ।

- ক. মুদ্রানীতি এক বছর নয় বরং ছয় মাসের জন্য হওয়া উচিত। বর্তমানে স্থানীয় ও বৈদেশিক পর্যায়ে আর্থিক নীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে মুদ্রানীতির সমন্বয় প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাসভিত্তিক পর্যালোচনাপূর্বক মুদ্রানীতির পরিবর্তন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেখানে এক বছরের জন্য নীতি ঘোষণা কাম্য নয়।
- খ. মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য লক্ষ্য প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বারোপ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি এবং মুদ্রা বিনিময় নীতি, শিল্প নীতি ও বিনিয়োগ নীতির সমন্বয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।
- গ. নীতিহার পুনরায় খতিয়ে দেখা উচিত এবং ব্যাংকগুলোতে থাকা অতিরিক্ত তারল্যের বিষয়ে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে বিনিয়োগ চাহিদার অনুপস্থিতি ও ব্যবসা প্রসারের সুযোগের অভাবের ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনা নীতির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া উচিত
- ঘ. বাংলাদেশী টাকার বিনিময় মূল্য ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা উচিত, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। আমি নমিনাল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেটকে পরিপূর্ণভাবে রিয়েল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেটের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টি সমর্থন করছি না। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে সম্পর্ক এবং মৌলিক বিষয়গুলো বোঝা নমিনাল এক্সচেঞ্জ রেটের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের বৈশ্বিক অবস্থান, অন্যান্য উচ্চ বিনিময় মূল্যের মুদ্রা এবং সম্প্রতি চীনের অগ্রসর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির মুদ্রা রেনমিনবির ইউএস ডলার থেকে বিযুক্ত হওয়া নতুন আবহ তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশ উপেক্ষা করতে পারে না।
- ঙ. সর্বশেষ অর্থনীতি এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে কভিড-১৯-এর প্রভাবের দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজর দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতা দূর করা উচিত, যা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়ার ফলে তৈরি হয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষক এবং প্রান্তিক জনগণের অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বৃদ্ধির জন্যও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

কাঠামোগত যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে

- ❖ **প্রথমটি** হচ্ছে মুদ্রানীতির ‘**প্রেষণ পদ্ধতি**’, যা গৃহস্থালি ও ব্যবসায় উদ্যোগের মতো ক্ষুদ্র পর্যায়ে গতি আনয়নে সামষ্টিক নীতির প্রভাবক হিসেবে গণ্য হয়। এক্ষেত্রে যেকোনো সামষ্টিক নীতি গৃহীত হওয়ার একটি মধ্যবর্তী পর্যায় রয়েছে। এটিকে ‘মেসো লেভেল’ বলে, যা বাজার, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাজারের মার্চেন্ট ব্যাংকার ও ব্রোকারেজ হাউজ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মতো উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে গঠিত। এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকরভাবে সক্রিয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো মুদ্রা অথবা রাজস্ব নীতি প্রত্যাশিত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না। অতএব আমাদের যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ‘কাঠামোগত সংস্কার’। এক্ষেত্রে গুরুতর দুর্বলতা রয়েছে, যা কাটিয়ে ওঠা জরুরি।
- ❖ **দ্বিতীয়ত**, আমাদের পণ্য এবং পরিষেবার বাজার আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি উন্মুক্ত। ফলে বিশ্বের যেকোনো সংকটের প্রভাব বাংলাদেশে পড়ে। সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীল অবস্থাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এমন পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত অবস্থান হচ্ছে প্রবৃদ্ধি। (বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২০) এ পটভূমির বিপরীতে আমাদের মুদ্রানীতি যথাযথ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা উচিত। কেননা বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো অস্থির পরিবেশ এবং ধারাবাহিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছে। একটি দেশের মুদ্রানীতিকে গতানুগতিক ‘মানানসই’ এবং ‘সংকোচনমূলক’ নীতি থেকে সরিয়ে এনে ভিন্নধর্মী, অপ্রচলিত এবং বাস্তবায়নযোগ্য করে প্রণয়ন করা উচিত।
- ❖ **তৃতীয়ত**, স্থানীয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত অস্থিরতা, খেলাপি ঋণের বৃদ্ধি, দুর্নীতি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে জবাবদিহিতার ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ ব্যাংককে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। সর্বশেষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ঋণগ্রহীতাদের সুরক্ষা, প্রশাসনিক নির্দেশনার আলোকে ঋণ প্রদান ও আমানত গ্রহণ এবং চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নীতি প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

ব্যাংক খাতের সমস্যা সমাধানে এখনই সতর্ক হওয়া জরুরি

ব্যাংক ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সব তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। দেশের অর্থনীতির আকার বাড়তে থাকলে আশির দশকের প্রথম দিক থেকেই বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া শুরু হয়। বর্তমানে দেশে ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি ব্যাংক, নয়টি বিদেশী ব্যাংক ও তিনটি বিশেষায়িত ব্যাংক এবং ৩৪টি দেশী-বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রায় ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিকে সামাল দিচ্ছে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর এবং প্রকাশিত বেশকিছু নিবন্ধ পাঠে জানা যায় যে বর্তমানে দেশের ব্যাংক খাত বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। অবশ্য ব্যাংক খাতের সমস্যা দীর্ঘদিনের। প্রথমত, সুশাসনের অভাব। ব্যাংক যারা পরিচালনা করছেন এবং যারা কর্মকর্তা হিসেবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন তাদের অধিকাংশের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। দ্বিতীয়ত, যেসব আইন-কানুন, নীতিমালা, বিধি-বিধানের মাধ্যমে ব্যাংক পরিচালিত হওয়ার কথা সেসব যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না। তৃতীয়ত, ব্যাংকের অনেক পরিচালকের মধ্যেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। এদের কেউ কেউ নামে-বেনামে শত শত কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে। চতুর্থত, ঋণ গ্রহণের নামে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা আর পরিশোধ করছে না। দিন দিন খেলাপি ঋণ বাড়ছে। পঞ্চমত, পরিচালনা পর্ষদে নিয়োজিত কিছু পরিচালক ব্যাংক ব্যবস্থাপনার কাজে বিশেষ করে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে। সর্বোপরি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকর তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একটি দেশের অর্থনীতি ব্যাংক খাতের ওপর ভর করে চলে, অথচ বর্তমানে দেশের ব্যাংক খাত নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আস্থার সংকট। আমানতকারীদের মুনাফা দেয়া হয় ৩ থেকে ৬ শতাংশ হারে। এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছে আমানতের টাকা খোয়া যাওয়ার ভয়। যদি কোনো ব্যাংক বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, সরকার হয়তো জনগণের টাকা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু আমানতকারী ও গ্রাহকদের হয়রানি সহজে মিটবে না। এ পর্যন্ত যারা ব্যাংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে তাদের কম সংখ্যককেই বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য ক’দিন আগেও গুজব ছিল, অনেকে ব্যাংকে সঞ্চিত টাকা উঠিয়ে ঘরে নগদ রেখে দিচ্ছে কিংবা বাধ্য হয়ে রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করছে।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গত অক্টোবরে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘দুর্বল করপোরেট শাসন ব্যবস্থা, আইনের দুর্বল প্রয়োগ এবং স্বচ্ছতার অভাব বাংলাদেশের ব্যাংক খাতকে ঝুঁকির মধ্যে রেখেছে। এখানে ব্যাংক খাত নিয়ন্ত্রণ করে এমন সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যাদের আসল আগ্রহ অন্যত্র। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী গুপের মালিকরা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে।’

ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া কাগজে-কলমে খুব সহজ নয়। চালু ব্যবসা বা শিল্প-কারখানা থাকলে বিভিন্ন বিধি পদ্ধতি পরিপালন করে জামানতের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। স্টার্টআপ শিল্পে ঋণ পেতে হলে প্রকৃত জামানতের সঙ্গে ঋণগ্রহীতার পরিচিতিও ভালোভাবে দেখা হয়। ঋণ গ্রহণের পর নির্ধারিত সময় থেকেই ঋণ পরিশোধ শুরু করতে হয়। দুই যুগ আগেও এ নিয়মের ব্যত্যয় করতে ব্যাংক কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কিংবা পরিচালনা পর্ষদকে দেখা যেত না। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আইনের শাসন ও নীতি-নৈতিকতার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। পরস্পর যোগসাজশে সম্পত্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ভুয়া কাগজপত্র তৈরি হতে থাকে। ঋণ দীর্ঘদিন খেলাপি হওয়ার পর দেখা যায় ঋণগ্রহীতার দেয়া জামানত ঋণ আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকদের ইচ্ছায় অনেক ঋণ দেয়ার পর সেগুলো অনাদায়ী হয়ে পড়ে।

বর্তমানে ব্যাংকগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যাই হচ্ছে খেলাপি ঋণ। অনেক প্রভাবশালী ঋণগ্রহীতা শত শত, হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে এবং তাদের ব্যবসা বা শিল্প-কারখানা সচল থাকলেও ঋণ পরিশোধ করছে না। কয়েক বছর পর পর আসল টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুদ মওকুফ করিয়ে নিচ্ছে। দুই বা চার কিস্তি পরিশোধ করে আবার খেলাপি হয়ে যাচ্ছে।

ছোট ছোট ঋণগ্রহীতার ওপর ব্যাংকের কড়া নজরদারি, পিডিআর অ্যাক্টে মামলা ইত্যাদি থাকলেও প্রভাবশালী ঋণখেলাপিদের ধরতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কঠোর হতে পারছে না। খেলাপি ঋণ কমানোর কথা বলে বিভিন্ন সময়ে ঋণখেলাপিদের নানা সুবিধা ও প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ঋণখেলাপিদের মাত্র ২ শতাংশ ঋণ পরিশোধ করে ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের সুবিধা দেয়া হয়।

এ প্রক্রিয়ায় ঋণ পুনঃতফসিল করে অনেক ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী আরো নতুন ঋণ গ্রহণ করে। নভেল করোনাভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে সরকার ব্যবসায়ীদের প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা এ প্রণোদনার অর্থ কম পেলেও বড় বড় ব্যবসায়ী ও তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীরা বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ টাকা ঠিকই উঠিয়ে নেন। এছাড়া করোনাকালে ঋণের কিস্তি প্রদানও স্থগিত রাখা হয়।

ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যাংকের টাকা সহজে পৌঁছানোর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানতের সুদের হার সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ এবং ঋণ প্রদানের সুদহার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্ধারণ করে দেয়। তফসিলি ব্যাংকগুলো যাতে বেশি হারে ঋণ দিতে পারে এবং তারল্য সংকট না হয় সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত স্ট্যাটুটরি রিজার্ভ রেশিও (এসআরআর) এবং ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওর (সিআরআর) পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়।

উল্লিখিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ঋণগ্রহীতারা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে আবার খেলাপি হচ্ছেন। ব্যাংক অর্থঋণ আদালতে মামলা করলে সেসব মামলা বছরের পর বছর ধরে চলে। কখনো কখনো বড় ঋণগ্রহীতাদের কেউ কেউ উচ্চ আদালতে গিয়ে ঋণখেলাপি হওয়া স্থগিত করে নিয়ে আসছেন।

বর্তমানে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কত তা নিয়ে নানা মত ও যুক্তিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায়, গত নভেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলোয় খেলাপি ঋণ ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপি ঋণ ১৭ হাজার কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে প্রদত্ত ২ শতাংশ ঋণ জমা দিয়ে খেলাপি থেকে উদ্ধার পাওয়ার সুবিধা ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাইয়ে আরো এক নজিরবিহীন সুবিধা প্রদান করে। খেলাপি ঋণ নিয়মিত করতে এখন আড়াই থেকে সাড়ে ৪ শতাংশ অর্থ জমা দিলেই চলবে, আগে যা ছিল ১০ থেকে ৩০ শতাংশ। এছাড়া পরিশোধের সময় বাড়িয়ে আট বছর করা হয়েছে যা আগে ছিল সর্বোচ্চ দুই বছর।

এত সুবিধা দিয়েও কি খেলাপি ঋণ কমানো যাচ্ছে? বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে, খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা হলেও আইএমএফের মতে এ খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৩ লাখ কোটি টাকার ওপরে। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদের মতে, খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কারণ বিগত কয়েক বছরে ‘বিধিগতভাবেই’ খেলাপি ঋণ লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীরা সরকারের বিভিন্ন সময় ঘোষিত প্রদত্ত সুযোগের অপব্যবহার করেছেন। ঋণ পরিশোধ না করে তারা পরবর্তী সুযোগের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। ব্যাংকগুলো সুযোগ বুঝে ‘রাইট অফ’ করে কিংবা ‘প্রতিশন’ রেখে ঋণ লুকিয়ে লভ্যাংশ ঘোষণা করছে। কাদের টাকা থেকে ‘রাইট অফ’ বা প্রতিশন করা হচ্ছে? এসব লাখ লাখ কোটি টাকা আমানতকারীদের। কোনো ব্যাংক বিপদে পড়লে বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা সরকার যে অর্থ দিয়ে সহায়তা করে তাও দেশের জনগণের করের টাকা। ব্যাংকের টাকা শুধু খেলাপি হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। নানা অনিয়ম ও কলেজ্জারির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট কিংবা আত্মসাৎ হয়েছে। কয়েকটি আলোচিত জালিয়াতির ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) ২০১১ সালে হলামার্স কেলেজ্জারির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক থেকে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা উঠিয়ে নেয়া হয়। এ পর্যন্ত কোনো টাকা আদায় হয়নি। (২) ২০১১-১২ সালে বেসিক ব্যাংক থেকে যোগসাজশ ও অনিয়মের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা উঠিয়ে নেয়া হয়, যার বেশির ভাগই এখনো অনাদায়ী। (৩) ২০১২-১৩ সালে ‘বিসমিল্লাহ গুপ’ জনতা, প্রাইম, যমুনা, প্রিমিয়ার ও শাহজালাল ব্যাংক থেকে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে গুপের কর্তাব্যক্তির বিদেশে পালিয়ে যায়। (৪) এনন টেক্স গুপ জনতা ব্যাংক থেকে ছয় বছরে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে খেলাপি হয়ে পড়ে। (৫) ক্রিসেন্ট গুপ জনতা ব্যাংক থেকে ২ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা এবং সরকারের নগদ সহায়তা তহবিল থেকে রফতানির নামে ১ হাজার ৭৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এ ঘটনায় গুপের চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অন্যরা বিদেশে পালিয়ে গেছে। (৬) অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদান ও কিছু উদ্যোগের আত্মসাতের ফলে ফারমার্স ব্যাংক গ্রাহকদের সঞ্চিত টাকা ফেরত দিতে পারেনি। সরকারি উদ্যোগে এ ব্যাংক বাঁচাতে চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ও একটি বিনিয়োগ সংস্থা মূলধন জোগান দেয়। ব্যাংকের নাম পরিবর্তন করে এখন পদ্মা ব্যাংক রাখা হয়েছে। ঋণের টাকাও আদায় হচ্ছে না, অনেক গ্রাহককেও তারা টাকা পরিশোধ করতে পারছে না বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাতকৃত টাকাও আদায় নাকি হয়নি। (৭) ন্যাশনাল ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭ হাজার ২৯৯ কোটি টাকা। এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের ৯৭ শতাংশই খেলাপি বা আত্মসাৎ হয়েছে বলেও পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি ইউনিয়ন ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে নামে-বেনামে হাজার হাজার কোটি টাকা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। এসব

টাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনবিহীন কোম্পানি, সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি, অস্তিত্বহীন কোম্পানি ইত্যাদির নামে নামমাত্র জামানতের বিপরীতে দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

উল্লিখিত অনিয়ম ও জালিয়াতির যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি বড় অংশ এবং সার্বিকভাবে খেলাপি ঋণের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশে পাচার হয়ে গেছে বলে অনেকে সন্দেহ করেন। ঋণ নিয়ে ব্যবসা মন্দা বা ক্ষতি হওয়ার কারণে খেলাপি হওয়ার চেয়ে 'ইচ্ছাকৃত' ঋণখেলাপি বেশি ভয়ংকর।

ঋণ আদায়ে ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কঠোর না হওয়ার কারণে ইচ্ছাকৃত খেলাপির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় দেশে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর নৈতিকতা ও দেশপ্রেম বলতে কিছুই নেই। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে প্রদত্ত মোট ঋণের ২২-২৫ শতাংশই খেলাপি হয়ে যাবে—এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বৈশ্বিক মন্দা, মূল্যস্ফীতি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, অবরোধ, পাল্টা অবরোধ ইত্যাদির ফলস্বরূপ বাংলাদেশের অর্থনীতিরও এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎস্বল্পতা বৈদেশিক মুদ্রার সংকট ও দুর্নীতির ব্যাপকতা। এর মধ্যে কোনো এক বা একাধিক ব্যাংক যদি আগের আল বারাকা, ফারমার্স কিংবা বিসিআইয়ের মতো সমস্যায় পড়ে তাহলে অপপ্রচার, গুজব ও আতঙ্ক অর্থনীতির সর্বনাশ ঘটাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জনগণের করের অর্থে সহায়তা দিয়ে লুট হয়ে যাওয়া ব্যাংক বাঁচিয়ে রাখা কোনো সমাধান নয়, বরং সমস্যার আসল কারণ খুঁজতে হবে এবং তার সমাধান করতে হবে।

কিছু সংখ্যক সামর্থ্যবান উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টায় ও প্রাথমিক অর্থায়নে বেসরকারি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়। এর মাধ্যমে তারা ব্যাংক মালিক হয়ে বসেন। পরবর্তী সময়ে তাদের অর্থায়নকৃত টাকার শতগুণ সাধারণ গ্রাহক ও আমানতকারীরা ব্যাংকে জমা করেন। অনেক উদ্যোক্তা পরিচালক তার বিনিয়োগকৃত টাকা পরবর্তী সময়ে নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে উঠিয়ে ফেলেন। সত্যিকার অর্থে আমানতকারী ও গ্রাহকরাই ব্যাংকের প্রকৃত মালিক। তাদের স্বার্থ দেখা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। দুঃখের বিষয়, ৯-১০ শতাংশ উচ্চমূল্যস্ফীতির সময়ে আমানতকারীরা সুদ বা মুনাফা পাচ্ছে মাত্র ২-৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণায় যদিও আমানতের সুদের সীমা তুলে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঋণের সুদের সীমা ৯ শতাংশই রেখে দেয়া হয়েছে (ভোগ্যপণ্যে প্রদত্ত ঋণের সীমা তুলে নেয়া হয়েছে)। ফলে আমানতকারীরা খুব বেশি লাভবান হবেন না। অবিলম্বে সুদের হারের সীমা প্রত্যাহার করা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নৈতিক দায়িত্ব। সুদের হার কমিয়ে ঋণপ্রাপ্তি সহজ করলেই যে দেশে বিনিয়োগ হবে এমন কোনো কথা নেই। এতে ঋণের অপব্যবহার ও অদক্ষতার সম্ভাবনা থাকে। বাজার ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে জোর করে সুদের হার দীর্ঘ সময় কমিয়ে রাখা ঠিক নয়। অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ প্রদানে সুদের হার ৯ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখলেও আমানতের সুদহারের ক্যাপ প্রত্যাহার করেছে। এতে ব্যাংক আমানতকারীদের কিছুটা সুবিধা দিতে পারলেও বর্তমান মূল্যস্ফীতির সমপরিমাণ সুদ দিতে পারবে না।

আইএমএফ ৪৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদানের শর্ত হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংস্কারের কথা বলেছে। ব্যাংকিং আইন জনকল্যাণমুখী (শুধু কার্যত মালিক ও ঋণগ্রহীতাদের অনুকূলে নয়) করা, কর ও অর্থ ব্যবস্থাপনার সংস্কার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুশাসন ও দায়বদ্ধতা ফিরিয়ে আনা—এসব ব্যাংকসংশ্লিষ্ট শুলকাঙ্কী ও জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি দৃশ্যমান। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে নিয়মিত অবহিত করার কথা। এ কারণে ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত যেকোনো অনিয়মের দায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সবার ওপরই বর্তায়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে ব্যাংকগুলোয় কাগজে-কলমে কোনো তারল্য সংকট নেই। কিন্তু মন্দ ঋণের কারণে তাদের প্রচুর অর্থ আটকে যাওয়ায় প্রকৃত ব্যবসায়ী বা ভালো গ্রাহকদেরও ঋণ দেয়া হচ্ছে না। এছাড়া আমানতকারী ও সঞ্চয়কারীরাও স্বল্প মুনাফায় নিরুৎসাহী হয়ে ব্যাংকবিমুখ হচ্ছে। এটি ভালো লক্ষণ নয়।

প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশের ওপরে ছিল, যা ২০১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশে পৌঁছে। করোনামহামারীর সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে গেলেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে, যার ফলে দেশের মাথাপিছু আয় ২০২২ সালে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার পৌঁছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালেই জাতিসংঘের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে উঠে গেছে। আইএমএফের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বেশি। তবে দেশে আয়বৈষম্য বেড়েছে। দেশের জিডিপির আকার প্রায় ৪৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ পরিস্থিতিতে এক শ্রেণীর দেশপ্রেম-বিবর্জিত ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি বিদেশে সম্পদ পাচার করে তবে উন্নয়নের সুফল দেশবাসী ভোগ করতে পারবে না।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে হস্তি ব্যবসা বেড়ে যাওয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বড় বড় রফতানিকারকের রফতানি আয়ের বড় অংশ বিদেশে রেখে দেয়া এবং যথাসময়ে রফতানি আয় দেশে না আনা। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ী সংগঠন রফতানি, আমদানি, রেমিট্যান্স প্রভৃতির ক্ষেত্রে ডলারের সঙ্গে টাকার বিভিন্ন মূল্যমান নির্ধারণ করে দিয়েছে। মূল্যমানে সমতা না থাকাও বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, হঠাৎ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ কমতে থাকা, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, ডলারের অবৈধ ব্যবসা, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এত অধিক হারে ডলার ছাড়করণ—এসব শুধু রেমিট্যান্স কম আসা এবং আমদানি বেড়ে যাওয়ার কারণে হয়নি। ডলারের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে কিছু ব্যাংকসংশ্লিষ্ট পরিচালক ও কর্মকর্তা এবং এক্সচেঞ্জ হাউজও জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া এর মধ্যে বিত্তশালী অর্থ পাচারকারীদের কারসাজি রয়েছে। কিছু কিছু ব্যাংক বা মালিক সংশ্লিষ্টদের পরিচালিত এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্রবাসী আয় থেকে ডলার সংগ্রহ করে দেশে না পাঠিয়ে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপে পাঠাচ্ছে। একই সঙ্গে এসব পাচারকারী হস্তি ব্যবসারও অংশীদার।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব হলো, মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুজন সাবেক গভর্নর এবং ব্যাংকসংশ্লিষ্ট কিছু বিশেষজ্ঞ মতামত রেখেছেন, সরকার যাতে দ্রুত সং ও অভিজ্ঞ লোকদের সমন্বয়ে কমিশন গঠন করে ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কারের দিকে নজর দেয়। দ্বিতীয়ত, দুর্ভাগ্য ও লুটেরাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে জনগণের অর্থ আর লুপ্ত না হয়। অনিয়মিতভাবে গৃহীত ঋণের টাকা ফেরৎ আনতে হবে। ব্যাংক আইনের কঠোর প্রয়োগ এক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সং, সাহসী ও আইনানুগ ভূমিকা নিশ্চিত করা যাতে অনিয়ম ও অন্যায় কাজে তাদের যোগসাজশ বন্ধ হয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যাতে আরো বড় অঘটন না ঘটে সেদিকে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সতর্ক থাকতে হবে।

মুদ্রানীতিতে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু সমাধান সঠিকভাবে দিতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক

কেমন হলো এবারের মুদ্রানীতি?

এবারের মুদ্রানীতিটি তেমন খারাপ হয়নি। কিন্তু এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু সীমাবদ্ধতা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তারা মুদ্রানীতিকে মোটামুটি যৌক্তিক করার চেষ্টা করেছে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে মুদ্রানীতিটি প্রণয়ন করা যায়নি বলে আমার মনে হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চ্যালেঞ্জ হলো একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নেয়া। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ২০২৩ সালকে মন্দার বছর হিসেবে সতর্ক করেছে। মন্দা থেকে বাঁচার জন্য একদিকে যেমন বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য ঋণপ্রবৃদ্ধিও কমানো দরকার। এ দুটো ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে ঋণের (ভোগ্যঋণ বাদে) সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা বাংলাদেশ ব্যাংক ওঠাতে পারেনি। ঋণের সুদহারের সীমা না তুলে নেয়ার বিষয়টি সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরই অংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু ভোক্তা ঋণের ওপর থেকে সুদহারের সীমা উঠিয়েছে। এটি কিছুটা বৈষম্যমূলকও বটে। মোট ঋণের বাজারে ভোক্তা ঋণের অংশ ৬-৭ শতাংশের বেশি হবে না। এতে মূল্যস্ফীতির ওপর খুব একটা প্রভাব পড়বে বলে আমার মনে হয় না। অন্যদিকে আমানতের সুদের ওপর যে সীমা ছিল (৬ শতাংশ), সেটা তুলে দেয়া হয়েছে। ঋণের সুদহারের সীমা না তুলে আমানতের হারের সীমা তুলে খুব একটা সুবিধা হবে না। এতে ব্যাংকগুলো অন্য ধরনের সুবিধা নিতে পারে। ব্যাংক চাইলে আমানতের সুদের হার আরো কমিয়েও দিতে পারবে। সে ঝুঁকিটা থেকে যাচ্ছে।

ঋণের বড় অংশই শিল্পভিত্তিক টার্মলোন বা ট্রেড লোন। ঋণের সুদের হার না বাড়িয়ে রেপো রেট বাড়ানো হয়েছে। সে জায়গায় বাংলাদেশ ব্যাংক খুব ভালো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। মুদ্রানীতি প্রণয়নের আগে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যে সভা আয়োজন করেছিল সেখানেও আমি বলেছিলাম, রেপো রেটের পরিবর্তনের দরকার নেই। কারণ আর্থিক বাজারে এরই মধ্যে তারল্য সংকট আছে। রেপো রেট পরিবর্তন করলে সংকট আরো বেড়ে যেতে পারে। দশমিক ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানো বা কমানোয় কিছুই হবে না, তার পরও বাজারে একটি বার্তা যাবে যে সরকার অর্থপ্রবাহ কমাতে চাইছে। এতেই তারল্য সংকট আরো বাড়বে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলো নেয়া জরুরি ছিল সেটা আংশিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু এতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে ঋণপ্রবাহ কিছুটা সংকুচিত করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সঠিক বার্তা দিতে পারেনি। ঋণের সুদহার পরিবর্তন না করতে পারলেও মন্দা এলে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যাতে একটি যৌক্তিক পর্যায়ে

থাকে, সেটি নিশ্চিত করা দরকার। আমি আশা করব, বাংলাদেশ ব্যাংক অচিরেই ঋণের সুদের হার নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের ওপর ছেড়ে দেবে এবং তা একটি যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার ক্ষেত্রে মুদ্রানীতিকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করবে।

ব্যাংকে আমানত ও সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি কমছে। এর কারণ মূল্যস্ফীতি। মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ আর ব্যাংক যদি আমানতের ওপর ৫-৬ শতাংশ সুদ দেয় তাহলে মানুষ ৩-৪ শতাংশ অর্থ হারাচ্ছে। এমন অবস্থায় ভবিষ্যতে সঞ্চয়ের চেয়ে মানুষ এখনই ভোগ করতে চাইবে বেশি। হয়েছেও তাই। তাছাড়া উচ্চমূল্যস্ফীতিতে টিকে থাকতে মানুষ সঞ্চয় ভাঙছে। ফলে ব্যাংকে আমানত প্রবৃদ্ধি কমছে। তারই ফলে তারল্য সংকট দেখা যাচ্ছে। আমানত করার আরো একটি কারণ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকগুলো সম্পর্কে যে স্ক্যান্ডাল শোনা যাচ্ছে, তাতে ব্যাংকের ওপর আমানতকারীদের আস্থা কমে যাচ্ছে। যে কারণে ব্যাংকগুলো থেকে মানুষ টাকা তুলে ফেলছে। টাকা তুলে ফেলার পর অনিরাপদ জায়গাগুলোয় মানুষ হয়তো টাকা আমানত হিসেবে রাখছে। এমন প্রবণতা আর্থিক খাতের জন্য ইতিবাচক নয়। সার্বিকভাবে বর্তমান মুদ্রানীতিতে সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু সমাধানগুলো সঠিকভাবে দিতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এবারের মুদ্রানীতি কতটা সহায়ক হবে?

মূল্যস্ফীতির প্রকৃতিটা যদি দেখি তাহলে দেখব, খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি অপেক্ষাকৃত বেশি। মূল্যস্ফীতির অনেকটাই আবার আমদানি করা মূল্যস্ফীতি, যেটা ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় টাকার অবমূল্যায়নের কারণে হয়েছে। আন্তর্জাতিক সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন ঘটায় পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। কভিড, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, কভিড-পরবর্তী অবস্থা এবং বর্তমানে চীনে যে কভিড চলছে তার কারণে সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রভাব পড়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের খুব বেশি করণীয় কিছু নেই। কিন্তু তার পরও যেটা বলা হয় যে স্থানীয় চাহিদা বেড়েছে। কভিড-পরবর্তী সময়ে এ চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুদ্রানীতিতে অর্থের সরবরাহ কিছুটা কমিয়ে দেয়াটাই যৌক্তিক। এখানেও ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপার আছে। প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমিয়ে মূল্যস্ফীতির হারকে কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে রাখাটাই যৌক্তিক। আমাদের প্রত্যাশা ছিল এবং বাজারও ডিম্বাঙ্ক করছে যে আমানতের সুদের হার বাড়ুক। সেদিক থেকে ৯ শতাংশ আমানতের সুদহার এবং ঋণের সুদহার ১২ শতাংশ সীমা নির্ধারণ করা হলে ভালো হতো। যেটা দিয়ে বাজারে অন্তত একটা সংকেত দেয়া যেত যে মূল্যস্ফীতি হার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। এখানে একটি বিষয় আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদহার একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। তাই সুদহার যদি ১২ শতাংশ হয়, তা ঋণের প্রবৃদ্ধিতে তেমন প্রভাব ফেলবে বলে আমার মনে হয় না। বরং খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ বেশি জরুরি। শুধু রেপো রেট বাড়ানো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে খুব একটি কার্যকর নীতি হতে পারে না। সরকারকেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ সাপোর্ট দিয়েছে, সেটিও মূল্যস্ফীতিতে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে, তাও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ জায়গাগুলোয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিক থেকে আরো প্রো-অ্যাকটিভ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

সরকারের রাজস্ব আহরণে গতি আশানুরূপ নয়। বাজেট বাস্তবায়নে সরকার ব্যাংক থেকে অর্থ নিচ্ছে। মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে এটি কি কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে?

সরকার কেন অতিরিক্ত ঋণ নিচ্ছে, সেটা অবশ্যই দেখার বিষয়। সরকারের রাজস্ব আয় কমে গেছে। যার কারণে সরকারকে ব্যাংকের ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সরকার যখন বেশি ঋণ নেবে তখন স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারি খাত কম ঋণ পাবে। কিন্তু গত ছয় মাসের ফলাফল তা বলে না। বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবৃদ্ধি বেশ ভালোই হয়েছে। এটা আগের স্বাভাবিক সময়ের মতোই রয়েছে। সরকারের জন্য ঋণের যে লক্ষ্য ছিল সেটি কিছুটা এদিক-ওদিক হতে পারে, তবে আমি সেটাকে দোষের বলে মনে করি না। কারণ ১০০ শতাংশ অনুমান তো করা যায় না যে সরকারি ঋণ প্রবৃদ্ধি কত শতাংশ হবে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্রড ম্যানি সরবরাহটা যেন নির্দিষ্ট পর্যায়ে থাকে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সেটা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারকে যদি অর্থ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাধা নাও দিতে পারে তাহলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিটা কিছুটা কমানো যেতে পারে। সরকারের ঋণ বিনিয়োগ, বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য জায়গায় যায় আর বেসরকারি খাতের ঋণ কিছুটা ভোগে ব্যয় হয়, কিছুটা বিনিয়োগে ব্যবহার হয়। বিনিয়োগ থেকে আবার ভোগে যায়। এ চক্রের কারণেও বেসরকারি ঋণ মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রাখে। তাই এ সময়ে বেসরকারি খাতের ঋণ কিছুটা কমানোর জন্য আমরা সবসময় বলে আসছি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমানো দরকার। এবারের মুদ্রানীতিতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আগের জায়গায় রাখা হয়েছে। বর্তমান মন্দার পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকে খারাপ মনে করি না। কিন্তু নীতিহার এবং সুদহারের সঙ্গে ইন্টার লিংকেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের কথা থেকেও বোঝা যায় যে ঋণের সুদহারের বিষয়টা তাদের হাতেও পুরোটা নেই। সেখানেও প্রশ্ন আসে দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতটা স্বাধীন। আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজের স্বাধীনতা থাকাটা খুবই জরুরি। সে জায়গাটায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের দিক থেকেও কিছুটা হস্তক্ষেপ থাকে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও থাকে। অনেক সময় ব্যবসায়ীরাও হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। তবে তাদের যে দায়িত্বটুকু আছে সেটা যথাযথভাবে পালন করে দেশের অর্থনীতিকে সঠিক ট্র্যাকে নিয়ে আসা, বিশেষ করে মুদ্রানীতির দিক থেকে যতটুকু করা যায়, সেটাকে চর্চা করার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা থাকতে হবে।

বাংলাদেশের আর্থিক খাতে বিভিন্ন ধরনের কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটছে, মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এগুলো কোনো সমস্যা তৈরি করবে কি?

মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ মুদ্রানীতির মানি ট্রান্সমিশন চ্যানেল হলো আর্থিক খাত। এ খাত যদি দক্ষ ও সক্ষম এবং উন্নত না হয়, তাহলে মুদ্রানীতি কাজ করে না। রেপো রেট বা পলিসি রেট বাড়ানো-কমানোর প্রভাব যদি আর্থিক খাতে না পড়ে, তাহলে সে মুদ্রানীতি কার্যকর হয় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটছে এবং তা ঘটার একটা বড় কারণ আমাদের আর্থিক খাত পুরোপুরি কম্পিটিটিভ ও দক্ষ নয়। এখানে অনেক ধরনের অদক্ষতা রয়েছে। অনেক ধরনের পক্ষ আছে, যারা বিভিন্নভাবে তাদের ব্যবসার জন্য আর্থিক খাতকে ব্যবহার করছে। যার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলেও সবকিছু সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারছে না। মুদ্রানীতির ভূমিকা এজন্যই বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে বরং রাজস্বনীতির ভূমিকা মুদ্রানীতির চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সে জায়গা থেকে আর্থিক খাতের তদারকি বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটা তাদের চার্টারেই লেখা আছে। জাপানে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সুপারভাইজরি ইউনিটকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আলাদা এবং স্বাধীনভাবে গঠন করা হয়েছে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এখানেও নানা ভাগ রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ দেখভাল করে। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেখার কথা। এ জায়গায় দ্রুত সংস্কার না করা হলে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আসবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিও খুব একটা কার্যকর হবে না। আর্থিক খাতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা নেয়, কিন্তু প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা খুবই কম। অথচ প্রতিরোধেই সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া উচিত ছিল। এটি খুব বেশি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নয়। বাংলাদেশের আর্থিক খাতের যে অবস্থা, বিশেষ করে নন-পারফর্মিং লোন যেভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে, সেগুলো কমানো এবং আর্থিক খাতের ওপর পূর্ণ সুপারভাইজরি নিয়ন্ত্রণ যেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর থাকে সেদিকে সরকারের মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে বিদ্যমান অস্থিরতা নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

চার-পাঁচ বছর বা আরো বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে ম্যানেজ করে আসছে, তা সঠিক ছিল না। টাকার মূল্যকে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃত্রিমভাবে একটি জায়গায় ধরে রেখেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই মুদ্রা অতিমূল্যায়িত হয়েছিল। যখন সংকট দেখা দিল তখন তারা আর ডলারের বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। আমাদের মতো দেশের জন্য মুদ্রা বিনিময় হার পুরোপুরি ভাসমান করা যথার্থ বলে মনে করি না। এটা ম্যানেজড ফ্লোটিংয়ে থাকা উচিত। আমি সবসময়ই বলি যে আমাদের মুদ্রা বিনিময় হার নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত দীর্ঘমেয়াদে ফ্লেক্সিবিলিটি এবং স্বল্পমেয়াদে স্থিতিশীলতা অর্জন করা। বাংলাদেশ ব্যাংক পুরোটা সময়ই টাকার মান স্থিতিশীল করে রেখেছে। যে কারণে রিয়েল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট অতিমূল্যায়িত হয়েছে এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অনেকটা হারিয়েছে। ফলে সংকটের সময় সেটাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। অদক্ষ আর্থিক খাতও এর সুযোগ নিয়েছে। ব্যাংকগুলোর স্পেকুলেটিভ আচরণ দেখা গেছে, যার ফলে টাকা অনেক বেশি অবমূল্যায়িত হয়েছে। বর্তমান গভর্নর ব্যাংকগুলোর সহায়তায় ডলারের চারটা দর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাতে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু চারটা দর গ্রহণযোগ্য নয়। এটা বাজারে বিভিন্নভাবে বৈষম্য তৈরি করে। এ চারটা দরকে অবশ্যই ইউনিফায়েড করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে তারা সহসাই মুদ্রা বিনিময় হার একীভূত করবে এবং এর বাজার ব্যবস্থাপনায় আরো মনোযোগ দেবে। আমি এখনো বলব, বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে এক্সচেঞ্জ রেট ম্যানেজ করছে, সেখানে তাদের আরো সক্ষমতা দেখানোর সুযোগ রয়েছে। মুদ্রার বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য যারা বলে আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। আর্থিক খাত উন্নত না হলে ফ্রিলি ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট অ্যাডপ্ট করার কোনো সুযোগ থাকে না। আমি নিজে পিএইচডি গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সংকট বিশ্লেষণ করেছি। সেখানে একটা বিষয় দেখেছি, যেসব দেশের আর্থিক খাত ভঞ্জুর সেসব দেশ কখনই ফ্রিলি ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট মেইনটেইন করতে পারেনি। এটা করতে গিয়ে উল্টো সংকট তৈরি হয়েছে। বিনিময় হারের ক্ষেত্রে আইএমএফ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যে স্ট্যাবিলাইজেশন নীতিগুলো নিয়েছে, তার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, এখানে হোম গ্রোন নীতিটা গুরুত্বপূর্ণ। ম্যানেজড ফ্লোটিং অবশ্যই করতে হবে এবং মার্কেটের সঙ্গে অ্যালাইনড করার জন্য ধীরে ধীরে এগোতে হবে। আজ বাংলাদেশে যদি মুদ্রার বিনিময় হার পরিপূর্ণভাবে বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে ডলারের দাম ২০০ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। যেটা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয়েছে। সেদিক থেকে আমরা ভালোই ম্যানেজ করছি বলব। তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে দুটি বিষয়ে: বিনিময় হার ম্যানেজ করতে গিয়ে আমাদের যেমন একদিকে রিজার্ভকে ধরে রাখতে হবে, তেমনি অন্যদিকে বিনিময় হার যেন অ্যাকসেসিভ ভোলাটিলিটি শো না করে তাও খেয়াল রাখতে হবে। এ দুটোর মাঝামাঝি থেকে বিনিময় হার ম্যানেজ করতে হবে। এজন্য বিনিময় হার ম্যানেজ করার টেকনিক্যাল যেসব বিষয় রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু ভূমিকা আছে, সরকারেরও ভূমিকা আছে। যেমন হস্তিটা বন্ধ করতে হবে। কালোবাজারে ডলার বিক্রি বন্ধ করতে মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো বন্ধ করে দেয়া দরকার। এগুলোই হচ্ছে বাজারে মেজর সোর্স অব ইনস্ট্যাবিলাটি। সেক্ষেত্রে বর্তমান গভর্নর বলেছেন সব ব্যাংককে ডলার বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হবে। সে পদক্ষেপ তারা নিতে পারেন, তাতে ভালোই হবে। কারণ মানি এক্সচেঞ্জের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব কম থাকে। কালোবাজারের সঙ্গে তারা ই জড়িত। সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা, বাজারের অবকাঠামো

উন্নত ও তদারকি বাড়তে হবে। আইএমএফ ইকুইলিব্রিয়াম মার্কেট এক্সচেঞ্জ রেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সিং অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করে। বাংলাদেশের জন্য এটা সঠিক পদ্ধতি না বলে আমি মনে করি, বিশেষ করে সংকটের সময়। আমাদের আমদানি অনেক বেশি, রফতানি কম, রেমিট্যান্স দৌলুমান। আইএমএফের নীতি অনুসরণ করতে গেলে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে অনেক অস্থিরতা দেখা দেবে। বরং আমাদের বিহেভিয়ারাল ইকুইলিব্রিয়াম এক্সচেঞ্জ রেটকে দেখা উচিত। যেটা দেখে অন্যান্য ইকোনমিক ফান্ডামেন্টালসের সঙ্গে অ্যালাইনড করে এক্সচেঞ্জ রেটটাকে ডিটারমাইন করা যায়। সেটা যদি ব্যাংকগুলো অনুসরণ করতে পারে, তবে সুফল মিলবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে তদারকির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে দিতে হবে।

বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে মুদ্রানীতি কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে?

মুদ্রানীতির কিছুটা ভূমিকা আছে। বিনিময় হার যদি ইকুইলিব্রিয়াম রেটের কাছাকাছি রাখা যায় তাহলে কিছুটা উপকার পাওয়া যেতে পারে। যদিও আমি মনে করি না বাংলাদেশের মতো দেশে শুধু বিনিময় হার দিয়ে ব্যালান্স অব পেমেণ্টকে খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ আছে বা এটাকে ভায়েবল করার সুযোগ আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণগ্রহণ খোলায় তদারকি বাড়িয়েছে। তারা ওভার ইনভয়েসিং, আন্ডার ইনভয়েসিং নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, বিলাসপণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে- এগুলো প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতে আমদানি কমে এসেছে। এখন একটা সংকটকালীন মুহূর্ত চলছে, সংকটের সময় যেকোনো ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আমদানি আরো কমানো যেতে পারে। আমাদের খুব উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে, তা নয়। গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারাটাই এ সময়ের জন্য যথেষ্ট। অর্থনীতির কাঠামো শক্তিশালী রাখার দিকে মনোযোগ দিতে হবে বেশি। ডলার রিজার্ভ ধরে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো ধরে রাখতে হবে। পাশাপাশি সরকারকে সাশ্রয়ীমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ই-কমার্স: আস্থার সংকট কাটাতে পারবে কি?

আধুনিক মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় এক অনুষ্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ই-কমার্স। বিশেষ করে ঘরে বসেই মুঠোফোনের স্ক্রিন বা পিসি অথবা ল্যাপটপের পর্দায় এক ক্লিকেই পণ্য অর্ডার করার এ সুযোগ এখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাজার করার চেনা দৃশ্য বদলে গিয়ে মোটরসাইকেলে করে ডেলিভারি এক্সিকিউটিভরা মানুষের ঘরে ঘরে বাজার পৌঁছে দিচ্ছে, এ দৃশ্য এখন শহরজুড়ে দেখা যায়। প্রথমদিকে মানুষ শুধু প্রসাধনী, অ্যাকসেসরিজ এবং নন-পেরিশেবল আইটেম (অপচনশীল দ্রব্য) অর্ডার করলেও বর্তমানে তরিতরকারি, মাছ-মাংস, ডিম, ফল এবং শাকসবজিও অনলাইনে অর্ডার করছে। এক্ষেত্রে অভিযোগের সংখ্যাও বিস্তর, তবে রিটার্ন এবং রিপ্লেসমেন্টের পলিসি থাকায় পণ্য ফেরত নিয়ে গুণগতমানসম্পন্ন সঠিক পণ্য দেয়ার কারণে অনেক ক্রেতা এখনো অনলাইনবিমুখ হননি। আধুনিক মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় এক অনুষ্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ই-কমার্স। বিশেষ করে ঘরে বসেই মুঠোফোনের স্ক্রিন বা পিসি অথবা ল্যাপটপের পর্দায় এক ক্লিকেই পণ্য অর্ডার করার এ সুযোগ এখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাজার করার চেনা দৃশ্য বদলে গিয়ে মোটরসাইকেলে করে ডেলিভারি এক্সিকিউটিভরা মানুষের ঘরে ঘরে বাজার পৌঁছে দিচ্ছে, এ দৃশ্য এখন শহরজুড়ে দেখা যায়। প্রথমদিকে মানুষ শুধু প্রসাধনী, অ্যাকসেসরিজ এবং নন-পেরিশেবল আইটেম (অপচনশীল দ্রব্য) অর্ডার করলেও বর্তমানে তরিতরকারি, মাছ-মাংস, ডিম, ফল এবং শাকসবজিও অনলাইনে অর্ডার করছে। এক্ষেত্রে অভিযোগের সংখ্যাও বিস্তর, তবে রিটার্ন এবং রিপ্লেসমেন্টের পলিসি থাকায় পণ্য ফেরত নিয়ে গুণগতমানসম্পন্ন সঠিক পণ্য দেয়ার কারণে অনেক ক্রেতা এখনো অনলাইনবিমুখ হননি।

তবে পণ্য ফেরত নেয়ার পর নগদ টাকা না দিয়ে সংশ্লিষ্ট ই-কমার্স কোম্পানির অ্যাকাউন্টে টাকা রিফান্ড করার নিয়ম রয়েছে, যেটা অনেক গ্রাহক মানতে পারেন না। কারণ ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেমে নগদ টাকা দিয়ে পণ্য কেনার পর একজন গ্রাহক স্বাভাবিকভাবেই নগদ টাকা ফেরত চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রিফান্ড করে দেয়া টাকার মাধ্যমে সে কোম্পানি থেকে পরবর্তীতে অন্য কিছু কেনার সুযোগ থাকায় এ নিয়মটিকে খুব একটা অস্বাভাবিক বলেও গণ্য করা যায় না। তাছাড়া মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে পেমেণ্ট করলে টাকা এমএফএসের ওয়ালেটে নেয়া যায়, সেজন্য সর্বোচ্চ সাতদিনের সময়সীমার কথা বলা হয়।

দৃশ্যত ই-কমার্স সাইটগুলো থেকে কেনাকাটা করার এ প্রেক্ষাপট স্বাভাবিক মনে হলেও গ্রাহকরা খুব সহজে অভ্যস্ত হতে পারছে না। যে কারণে দেখা যায় যে অনলাইনে অর্ডার করে সময়মতো পণ্য না পেয়ে পরে বাসার সামনের গ্রোসারি বা কনফেকশনারি থেকেই সে প্রডাক্ট কিনতে হচ্ছে। অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় ডেলিভারি না পাওয়ার অভিযোগ থেকে ই-কমার্স সাইটগুলো মুক্ত হতে পারেনি। এবং সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো কোনো প্রডাক্ট ডেলিভারি দিতে দেরি হলে এটাকে ই-কমার্স কোম্পানিগুলো কিছু মনেই করে না। যে কারণে নির্দিষ্ট সময়ের ৫/৬ ঘণ্টা পর প্রডাক্ট নিয়ে এসে খুব স্বাভাবিকভাবেই ডেলিভারি দিয়ে যায়। কিন্তু এটা যে কোম্পানির প্রতি

গ্রাহকের আস্থার সংকট তৈরি করে, সেটা আমলে নেয়া না হলে এ অনলাইন ব্যবসা ভবিষ্যতে ঝুঁকির মুখে পড়বে তা কোম্পানিগুলোর বিবেচনা করা উচিত।

বাংলাদেশে প্রথম ই-কমার্স শুরু হয় ২০০০ সালে, সাইটটির নাম মুন্সিজি ডটকম। বস্তুত ২০০৯ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা শহর থেকে গ্রামেও বিস্তৃত হওয়ায় ই-কমার্সের সম্প্রসারণ হয়েছে। এখন সারা বিশ্বেই অনলাইনে কেনাকাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ই-কমার্স দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অন্যান্য যেকোনো খাতের তুলনায় এ খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। করোনা মহামারীর সময়ে এ খাতের ব্যবসায় ২০০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থার (আজ্জটাড) এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত দেশগুলোয় যেখানে অর্ধেক মানুষ অনলাইনে কেনাকাটা করে, সেখানে নিম্ন আয়ের দেশগুলোয় সে সংখ্যাটা মাত্র ২ শতাংশ। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে তা ৫ শতাংশ এবং উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে ১৬ শতাংশ। তবে প্রতি বছর অনলাইনে কেনাকাটা করা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

আজ্জটাডের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ অনলাইনে কেনাকাটা করে।

আমাদের দেশে এ খাতে ছোট-বড় মিলিয়ে পাঁচ লাখের মতো উদ্যোক্তা রয়েছেন। ২০২১ সালে ই-কমার্স বাজারের আকার ছিল প্রায় ৫৬ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা। গবেষণা সংস্থা লাইটক্যাসল পার্টনার্সের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশের ই-কমার্সের বাজার দাঁড়াবে ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ২৫ হাজার কোটি টাকার মতো। ডাবলিনভিত্তিক বাণিজ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড মার্কেটস ডটকমের মতে, ২০২৬ সালের মধ্যে তা প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার বাজারে পরিণত হবে।

ই-কমার্সের মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ই-কমার্স সাইট পরিচালনায় ওয়ারহাউজ ব্যবস্থাপনা, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, কলসেন্টার, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইট ম্যানেজমেন্ট, কনটেন্ট ক্রিয়েটর, কাস্টমার হ্যাপিনেস টিম, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার, মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, ডেলিভারি এক্সিকিউটিভ ইত্যাদি খাতে প্রচুর জনবল কাজ করছে। বর্তমানে ই-কমার্স সাইটগুলোয় প্রতিদিন দুই লাখের বেশি অর্ডার সরবরাহ হচ্ছে।

দেশে অনলাইন বাণিজ্য বেড়ে ওঠার সময়ে ২০১৫ সালে দারাজ বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানিটির ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশসহ পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা ও মিয়ানমারে দারাজের ই-কমার্স স্টোর রয়েছে। একই বছর যাত্রা করা এখনই ডটকম দেশের সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ই-কমার্স ওয়েবসাইট ও ডিল সাইট। দেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন শপিং মল এবং বাংলা ভাষায় দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ই-কমার্স ওয়েবসাইট আজকেরডিল ডটকমও সে বছর কার্যক্রম শুরু করে। ২০১২ সালে যাত্রা করে দেশের অন্যতম সাইট রকমারি ডটকম। শুরুর দিকে বই বিক্রি করলেও বর্তমানে বইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাকসেসরিজ ও খাদ্য সম্পূরক পণ্য বিক্রি করছে সাইটটি। তবে রকমারির পর অনেক অনলাইন বুকশপ কার্যক্রম শুরু করলেও রকমারি এখন পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন বুকস্টোর। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম অনলাইনভিত্তিক গ্রোসারি সাইট চালডাল ডটকম যাত্রা করে। ই-কমার্স সাইটগুলোর সফলতা দেখে স্বপ্ন, মীনাবাজার, আগোরার মতো সুপারশপ আউটলেটগুলোও এখন অনলাইন শপিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সবমিলিয়ে দেশের ই-কমার্স সাইটগুলোর ব্যবসা এখন জমজমাট। তবে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের একটি প্রধান সমস্যা তারা জোয়ারে ভাসতে পছন্দ করে। যখন যার জোয়ার তখন তার পেছনেই ছোটে। ফলে কিছু অসাধু লোক বিশ্বাসকে পুঁজি করে তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে। এর ফলে ইভ্যালি, কিউকম, ধামাকা শপিং, আলেশা মার্ট, ই-অরেঞ্জ, সিরাজগঞ্জ শপ, আলাদিনের প্রদীপ, বুমবুম, আদিয়ান মার্ট, নিড ডটকম এসব কোম্পানির বিরুদ্ধে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ নেয়ার পরও পণ্য বুঝিয়ে না দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মূলত গ্রাহকদের আস্থা নষ্ট করার জন্য এ কোম্পানিগুলোই বড় ভূমিকা পালন করেছে।

এজন্য যেসব ই-কমার্স কোম্পানি স্বচ্ছভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে তারাও ভুক্তভোগী হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোর দায় যে একেবারেই নেই, সেটাও বলা যাবে না। দেখা যায় যে অনলাইনে প্রথম যে অর্ডার করা হয় কোম্পানিগুলো সে অর্ডার দ্রুতসময়ে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়। কিন্তু অর্ডার সংখ্যা বাড়তে থাকার পরই আর আগের সে মানসম্মত সার্ভিস পাওয়া যায় না। বিশেষ করে দেহিতে অর্ডার

সরবরাহ করার অভিযোগকে গুরুত্ব না দিলেও ভুল পণ্য, ডেলিভারিম্যানের আচরণ এসব নিয়ে অভিযোগকে তারা গুরুত্ব দেয়। তার মানে পণ্য সরবরাহে দেরি করাকে তারা স্বাভাবিক চোখে দেখতে চায়। এটা সত্য, জ্যামের নগরীতে সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা খুবই দুরূহ একটি কাজ, কিন্তু তার পরও গ্রাহকদের আস্থা ধরে রাখতে হলে ই-কমার্স সাইটগুলোকে এক্ষেত্রে মনোযোগী হতে হবে। আর এ কারণেই ই-কমার্সে এখনো প্রি-পেমেন্ট সিস্টেমকে জনপ্রিয় করা যায়নি। এর চেয়ে বরং ক্যাশ অন ডেলিভারি বা পণ্য বুঝে পাওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করার পদ্ধতিতেই গ্রাহকরা বেশি আস্থা রাখছেন। আবার অনেক সময় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে, যদিও অভিযোগ করার পর বদলে দেয়া হয়, কিন্তু এভাবে ভোগান্তির জন্য অনেক গ্রাহক ই-কমার্সে কেনাকাটা করতে আগ্রহী হন না।

কোনো পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ার পর স্টকে থাকা পুরনো পণ্য দিয়ে বর্তমান মূল্য রাখার অভিযোগও রয়েছে। সেই সঙ্গে নিম্নমানের বা ডিসকাউন্টের মাধ্যমে অবিক্রীত পণ্য বিক্রি করার প্রবণতাও ই-কমার্স কোম্পানিগুলোর আছে। ইদানীং নারী গ্রাহকদের সেলফোন নাম্বারে ফোন করে বিরক্ত করার মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া মার্কেটিংয়ের নামে যখন তখন ফোন করা বা খুদেবর্তা পাঠানোও গ্রাহকদের বিরক্তির উদ্রেক করে।

এসব অভিযোগ একপাশে রেখে যদি ই-কমার্সের ইতিবাচক দিকগুলো দেখা হয়, তাহলে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। বিশেষ করে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে রেইনকোট জড়িয়ে বা কনকনে শীতের রাতে সময়মতো পণ্য সরবরাহ করার পর ডেলিভারিম্যানদের প্রতি এক ধরনের মমতাবোধ তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। মোদ্রাকথা, গ্রাহক চাইলে ডেলিভারিম্যানরা একেবারে ঘরে এসে পণ্য পৌঁছে দিয়ে যান।

এভাবে ই-কমার্স আমাদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। তাই এ অনলাইন ব্যবসার মাধ্যম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হোক আমরা সেটিই প্রত্যাশা করি। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে ই-কমার্স বর্তমান সময়ের চাহিদার আলোকেই তৈরি হয়েছে। তাই ব্যবসার এ মাধ্যমকে সহজ ভেবে গ্রাহকদের আস্থা রক্ষার্থে কাজ না করলে গ্রাহক কিন্তু ঠিকই আগের মতো অফলাইনের প্রচলিত কেনাকাটাতে ফিরে যাবে। তবে মানুষ যেহেতু অনলাইনে পণ্য কেনায় অভ্যস্ত হচ্ছে, তাতে আগামীতে ই-কমার্সের বহল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখন পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে ই-কমার্স সাইটগুলো তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করলে আখেরে এ খাতের ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবেন। আর সেই সঙ্গে গ্রাহকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে সক্ষম হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের পথ ধরে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে এটিই সবার একান্ত চাওয়া।

ক্রিপ্টোকারেন্সি: বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নাকি মরীচিকাময় ফাঁদ

সবার কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি নামে পরিচিত হলেও মূলত এটি একটি ডিজিটাল মুদ্রা। এটি সম্পূর্ণরূপে বিকেন্দ্রিকভাবে পরিচালিত ডিজিটাল মুদ্রা যা অর্থ প্রদানের একটি বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। ক্রিপ্টো শব্দটির অর্থই হলো গুপ্ত বা গোপন। এজন্যই ক্রিপ্টোকারেন্সি অনলাইন ভার্সিয়াল জগতের এমন মুদ্রা যাকে হাতে ধরা বা ছোঁয়া যায় না। ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্পূর্ণ ধারণাটি আসলে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিপ্টোগ্রাফি ও ব্লকচেইন প্রযুক্তির ওপর। মুদ্রার লেনদেন ক্রিপ্টোগ্রাফির দ্বারা সুরক্ষিত হয়। অনলাইনে আদান-প্রদান (পিয়ার-টু-পিয়ার) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এ মুদ্রা দ্বারা সরাসরি তাত্ক্ষণিক অনলাইনে লেনদেন সম্পন্ন করা যায় যা থাকে ডিজিটাল ক্রিপ্টো ওয়ালেটে। এ মুদ্রার হিসাব রাখা হয় ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির মাধ্যমে ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা, যা কিনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়ে থাকে। এ মুদ্রার বিশেষত্ব, এ ধরনের মুদ্রা প্রচলন, প্রবহন ও নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর একদম নির্ভরশীল নয় এবং এটাকে হ্যাক করা প্রায় অসম্ভব।

ছদ্ম নামধারী জাপানি নাগরিক ‘সাতোশি নাকামোতো’ ২০০৯ সালে বিটকয়েনের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সির উদ্ভাবন করেন। ২০১৩ সালে প্রথম লোকনজরে আসে বিটকয়েন। ২০১৭ সালে এসে ক্রিপ্টো মুদ্রায় বড় মাত্রার পরিবর্তন আসে। বিশ্বে ২০১৭ সাল থেকেই ক্রিপ্টোকারেন্সি আরো বেশি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। ক্রিপ্টোকারেন্সির ওপর যেহেতু কোনো দেশের সরকারের বা আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ বা কোনো ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসংশ্লিষ্টতা নেই, সেজন্য বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ভার্সিয়াল মুদ্রায় নানারূপে নিষেধাজ্ঞা তৈরি হয়েছে। এত কিছুর পরও বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বিটকয়েনের লেনদেনের অনুমতি দেয় মধ্য আমেরিকার দেশ ‘এল সালভেদর’। মূলত নির্দিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রণকারী ও পর্যবেক্ষক সংস্থা না থাকার কারণে, প্রথম থেকেই এ ক্রিপ্টোকারেন্সি মুদ্রার প্রায়োগিক ব্যবহারের বিভিন্ন কমতি, জটিলতা ও নানা সমস্যার দিক আলোচনা, সতর্কবার্তা ও প্রশ্ন করে আসছে অর্থ, মুদ্রাবাজার বিশেষজ্ঞরা। তবে এর বিপরীত পিঠে অনেকেই মনে করেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি হয়তো সমগ্র বিশ্বের মুদ্রা ব্যবস্থায়ই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

কয়েন ক্যাপ মার্কেটের দেয়া তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বে প্রায় ২১ হাজার ৯১০টি ক্রিপ্টোকারেন্সি রয়েছে। বর্তমানে বহু ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে থাকলেও জনপ্রিয় কয়েকটি হলো বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, টেদার, ইউএস ডলার কয়েন, বাইন্যান্স কয়েন, কার্ডানো (এডিএ), পলিগন (মেটিক), এক্সআরপি, ডজি কয়েন ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন নতুন ক্রিপ্টোকারেন্সি কয়েকদিন দিন পরপর ক্রিপ্টো বাজারে আসছে।

২০১৭ সালে দাম বাড়ার মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপক সাড়া ফেলে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েন। এর ধারাবাহিকতায় ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহ ক্রমে বাড়ছে। বিশেষ করে দেশের তরুণদের কাছে ক্রিপ্টোয় বিনিয়োগ, ট্রেডিং, মাইনিং করে জলদি অর্থবান হওয়ার পন্থা হিসেবে অনেকেই প্রচার করে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন যোগাযোগমাধ্যমে। পুঁজিবাজারের মতো বিনিয়োগ, কেনাবেচা হচ্ছে অজানা বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির যাতে কোনো ধরনের মনিটরিং নেই। যেখানে অনেকেরই এসব মুদ্রার বাজার অস্থির প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নেই।

যদিও বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সির আইনি বৈধতা নেই। বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালে অবৈধ ঘোষণা করেছে ক্রিপ্টোকারেন্সির সবচেয়ে জনপ্রিয় মুদ্রা বিটকয়েনকে। এখন বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে বিটকয়েনের আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। তার পরও বাংলাদেশ, মিসর, আলজেরিয়া, মরক্কোসহ প্রভৃতি দেশে বিটকয়েন এখনো নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে কোনো প্রকার ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন বা সংরক্ষণ সম্পূর্ণ বেআইনি বলা আছে। ২০২২ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক মুখপাত্র আবুল কালাম আজাদ জানান, বর্তমান বিশ্বে ক্রিপ্টোকারেন্সি নামে বিভিন্ন ধরনের স্ক্যাম হচ্ছে যেমন—রাগ পুলিং, পঞ্জি স্কিম, এবং ফিশিং ইত্যাদি। বাংলাদেশ ব্যাংক আরো জানায়, ভার্সুয়াল ক্রিপ্টো মুদ্রা কোনো দেশের বৈধ কর্তৃপক্ষ দ্বারা যেহেতু ইস্যু করা হয় না, সেজন্য এ মুদ্রার বিপরীতে কোনো আর্থিক দাবি স্বীকৃত নয়। তাই এসব মুদ্রায় লেনদেন বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা অনুমোদন করে না। ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ দ্বারা সমর্থিত নয়।

ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যাপারে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অনলাইনে নামবিহীন বা ছদ্মনামধারীর সঙ্গে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনে অনিচ্ছাকৃতভাবে হতে পারে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাস অর্থায়ন আইন লঙ্ঘন। একই সঙ্গে আর্থিক লোকসানের ঝুঁকিও প্রবল। এটা সুস্পষ্ট যে ক্রিপ্টো মুদ্রার বাজার কখনোই স্থির নয়। অন্যদিকে ক্রিপ্টো মুদ্রার যেহেতু ট্যানজিবল অ্যাসেট মতো নয় তাই এ মুদ্রার দৈনন্দিন প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া ক্রিপ্টো মুদ্রার লেনদেনকারীদের যেহেতু চিহ্নিত করা যায় না, তাই এ মুদ্রা ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। সর্বোপরি এখনো ক্রিপ্টোবিষয়ক যথাযথ আইনের অভাব রয়েছে। সেটা শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেও সেটা সত্য।

২০০৯ সালে থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি বিকাশের যাত্রাকে আতশ কাচের নিচে রেখে যদি দেখা হয় আমরা তাহলে দেখতে পারব যে উদ্দেশ্য নিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সির উদ্ভাবন হয়েছিল অর্থাৎ সম্পূর্ণ এমন একটি বিকেন্দ্রিক মুদ্রা প্রতিস্থাপন করা, যা বিশ্বব্যাপী বৈশ্বিক অর্থ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনবে। বাস্তবে এখনো প্রথাগত মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ক্রিপ্টো মুদ্রা দাঁড়াতে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। তবে ব্যতিক্রম কিছু উদাহরণ নেই এমনও কিছু নয়।

গত কয়েক বছরে ক্রিপ্টো মুদ্রার বাজার রেকর্ড দেখলে বোঝা যাবে, ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রথাগত অর্থের বিকল্প না হয়ে বরং জলদি অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা তৈরির পথ হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে চটজলদি ধনী হওয়ার স্কিমের মতো কাজ করছে। বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অবশ্যই মন্দ কিছু নয়। তবে বেশির ভাগ নতুন ক্রিপ্টো মুদ্রা এখন বিনিয়োগ দ্বারা দ্রুত মুনাফার অর্থ তৈরি **(Ponzi Schemes)** পঞ্জি স্কিমে মতো হয়ে উঠছে। পঞ্জি স্কিমকে সহজ ভাষায় বললে প্রতারণামূলক বিনিয়োগ কার্যক্রম বলা যায়। পঞ্জি স্কিমের মতোই এমএলএম (মাল্টিলেভেল মার্কেটিং), পিরামিড লেভেল মার্কেটিং, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসার নামে আমাদের দেশে এ বিনিয়োগ ব্যবসা অনলাইন জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। চমকপ্রদ নানা চটকদার ওয়াদা ও দ্রুত মুনাফার আশায় অনেকেই এ পথে বিনিয়োগ করেছেন, বিশেষ করে আমাদের দেশের বেকার তরুণ যুবসমাজ এদিকে ঝুঁকছে। তাই আমাদের দেশের জনসাধারণ ও সরকারকে এখন থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ক্রিপ্টোর মতো নতুন মুদ্রাবাজারের ঝুঁকিকে পরিমাপ করে বিনিয়োগ করাটা যে সহজ নয়, সে ব্যাপারে কম-বেশি সবাই একমত হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য নেই কোনো আইন, নেই আইনি বৈধতাও, বাজার অনির্ভরযোগ্য ও অস্থিতিশীল, কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা নেই, সর্বোপরি এ মুদ্রার গতিপ্রকৃতি যেহেতু ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, সেখানে আমাদের হজুগে বিনিয়োগকারী হলে আর্থিক ক্ষতির সুযোগটা শুধু বাড়বে।

শেষে ফোর্বসের তালিকায় বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের একজন ওয়ারেন বাফেটের ক্রিপ্টো নিয়ে বলা কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, ‘সাধারণত ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্ষেত্রে আমি প্রায় এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি, এগুলোর সমাপ্তি ঘটবে মন্দে। আমরা মানুষেরা কেউ-ই বর্তমানে প্রকৃত অর্থে মনোনিবেশ করি না, হয় অতীত নিয়ে চিন্তিত, আর না হয় ভবিষ্যৎ নিয়ে কৌতূহলী আমাদের মনোজগৎ। কিন্তু ক্রিপ্টো জগতের ভবিষ্যৎ কী হবে আসলে কৌতূহলী মন ও মস্তিষ্ক নিশ্চিত করে বলতে পারবে না।’ আজকের ক্রিপ্টো মুদ্রা হট করে মুখ খুবড়ে যেকোনো সময় পড়ে যেতে পারে। তাই খুবই সতর্কতার সঙ্গে আমাদের ডিজিটাল মুদ্রার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক্ষেত্রে আইনি কাঠামো থেকে শুরু করে রেগুলেটরি বিষয়গুলো আগে থেকে পর্যালোচনা করতে হবে। এখন থেকেই এ মুদ্রার ঝুঁকির দিকগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। এ ধরনের ক্রিপ্টো মুদ্রায় ব্যাপক অনিয়মের সুযোগ থেকেই যায়। আর্থিক ঝুঁকি এবং ক্ষতির শঙ্কার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা আগের থেকে সতর্ক করে আসছেন। ক্রিপ্টো মুদ্রার সম্ভাবনা প্রকৃতরূপে যাচাই করার এখনই সময়। সেজন্যই সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তার সঙ্গে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংককেও এদিকে আরো মনোযোগী হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রবাসী আয়

বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদি এবং গুরুতর সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম জলবায়ু পরিবর্তন। মানবসভ্যতার অস্তিত্বকে ক্রমাগত হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে বায়ুমণ্ডলে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাস। বেঁচে থাকার প্রায় প্রতিটি নিয়ামককেই প্রভাবিত করছে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা। যেমন খাদ্যের সংস্থান, বাসস্থান, জীবিকা নির্বাহের উপায় ইত্যাদির পরিবর্তন হচ্ছে অহরহ। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বব্যাপী খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে তীব্র থেকে তীব্রতর। বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাস করে, যেখানে মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেকটাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তন সেই ধারার ঐক্য নাশ করেছে, ফলে এ অঞ্চলগুলো আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন। বন্যা, খরা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়, সুনামি, ক্রমবর্ধমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি করেছে, অন্যদিকে মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের বিধ্বংসী বন্যা প্রায় ৩০ লাখ লোককে করেছে গৃহহীন এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। দক্ষিণ সুদান টানা চতুর্থবারের মতো চরম বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। এদিকে সিরিয়ায় তিন বছর ধরে গড় বৃষ্টিপাতের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বজুড়ে লা নিনার বৈরী প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। ইউরোপে যখন গরমে জীবন ওষ্ঠাগত, উত্তর আমেরিকার অনেক শহর তখন রেকর্ড পরিমাণ বরফের নিচে চাপা পড়ে রয়।

উন্নত দেশগুলোই কার্বন নিঃসরণে প্রধানত দায়ী। শিল্প বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে উৎপাদনের মহাযজ্ঞ লক্ষ করা গেছে আজকের উন্নত দেশগুলোয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ডামাডোলে চাপা পড়ে ছিল পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা। তাদের উন্নয়নের দায় বহন করছে আজকের অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান ভুক্তভোগী বিশ্বের দরিদ্র অঞ্চলগুলো। এ কথা বেশি সত্যি, বাংলাদেশের মতো নিচু ও বন্যাপ্রবণ এলাকা যাদের মূল ভূখণ্ডের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তুলনামূলক কম। হয় ঋতুর বাংলাদেশ তার স্বাভাবিক ঋতুচক্র হারিয়েছে অনেক আগেই। গ্রীষ্মকালে প্রখর খরা, শীতকালে অভাবনীয় শৈত্যপ্রবাহ, বর্ষাকালে বন্যা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাণঘাতী জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য এক নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতের রেকর্ড ঘাঁটলে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার বৈরী প্রভাব বাংলাদেশের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে অনুমান করা হচ্ছে যে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতি সাতজনের একজন, যাদের বেশির ভাগই জীবনধারণের জন্যে কৃষির ওপর নির্ভরশীল, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হবে। উত্তর মেরুর বরফ গলার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বাংলাদেশ তার ব্যবহারযোগ্য ভূমির প্রায় ১১ শতাংশ হারাতে পারে। এতে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ, বিশেষ করে যারা নিচু এলাকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে, নানাভাবে প্রভাবিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবেলায় সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিও নানা ধরনের পদক্ষেপ এরই মধ্যে গ্রহণ করেছে। সে সঙ্গে প্রবাসী আয়ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে জীবন ধারার খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশী প্রবাসীদের একটা অংশ ‘জলবায়ু-অভিবাসী’ । জলবায়ুর বৈরী প্রভাব, যেমন জলোচ্ছ্বাস বা নদীভাঙনে তারা হয়তো হারিয়েছে তাদের শেষ ভিটেমাটিটুকু অথবা বানের জলে ভেসে গেছে জীবন রক্ষাকারী চাষের জমিটুকু। এদের অনেকেরই এক রকম বাধ্য হয়েই মাইগ্রেশন করতে হয়েছে দেশের অন্য কোথাও অথবা বিদেশে। তাদের পাঠানো অর্থই বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের

অন্যতম উৎস। প্রবাসী আয়ের আন্তঃপ্রবাহে দেশটি শীর্ষ ১৫টি দেশের মধ্যে একটি। বিগত বছরগুলোয় রেমিট্যান্সের বৃদ্ধি ছিল রেকর্ড পরিমাণ। গত এক দশকে বাংলাদেশের বৈদেশিক রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭৫ শতাংশ।

বলাবাহুল্য যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দরকার পর্যাপ্ত তহবিলের। অর্থের উপযুক্ত বরাদ্দের মাধ্যমে জলবায়ুর পরিবর্তন কিছুটা রোধ করা যায় এবং সে সঙ্গে বৈরী প্রভাবগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ২০০৯ সালে কপ-১৫ [কনফারেন্স অব পার্টি] সম্মেলনে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো সম্মিলিতভাবে বার্ষিক ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু-সহায়তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের মতো জলবায়ুর জন্য নিবেদিত বৈশ্বিক তহবিল থেকে অভিযোজন উদ্যোগের জন্য মাত্র ৩৭ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ হয়েছে বাংলাদেশের জন, যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। এ অবস্থায় রেমিট্যান্স হতে পারে অর্থায়নের একটি টেকসই উৎস। অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকরা রেমিট্যান্স বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করেন। অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরেও রেমিট্যান্সের ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হয় হারহামেশাই। তবে জাতীয় এবং পারিবারিক পর্যায়ে রেমিট্যান্স কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে সে সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়।

জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নানাবিধ পরিবেশ সহায়ক নীতি গ্রহণ করে সরকার। যেমন বেড়িবঁধ নির্মাণ, নতুন নতুন আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্বোধন, উপকূলীয় এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ইত্যাদি। এসব উদ্যোগে রেমিট্যান্স হতে পারে প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পারিবারিক এবং ব্যক্তি পর্যায়ে বেশি। রেমিট্যান্স গ্রহণকারী পরিবারগুলো জলবায়ুর নানান সমস্যা মোকাবেলায় এ অর্থ ব্যবহার করে। বিশেষ করে যারা পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে। উপকূলীয় অঞ্চলে উচ্চজনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। গ্রামীণ বাসিন্দারা যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের মতো জলবায়ু বিপর্যয়ে নিজেদের নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিতে পারে। এই নিমিত্তে উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দারা বিভিন্ন যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে আসন্ন পরিবেশগত বিপর্যয় সম্পর্কে অবগত এবং মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে পারে। যেসব পরিবারে রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ বেশি, সেসব পরিবারে যোগাযোগের মাধ্যম এবং প্রযুক্তি ক্রয় এবং ব্যবহার ক্ষমতা বেশি থাকবে। তাই তারা জলবায়ুজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় অধিকতর প্রস্তুত থাকবে। অধিকন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফি বছর। সে সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে বন্যার কারণে ক্ষতির পরিমাণও। আকস্মিক বন্যার পুনরাবৃত্তিসহ নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে প্রতি বছর। তাই বাড়িতে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু সহনশীল এবং টেকসই উপকরণের ব্যবহার, সমুদ্রসীমা থেকে বাড়ির উচ্চতা বৃদ্ধিকরণসহ গ্রামীণ এবং উপকূলীয় বাসিন্দাদের নানা পদক্ষেপ নিতে হয়। এ প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়বহুল। উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দারা যাদের রেমিট্যান্স প্রবাহ বেশি থাকবে তারা এসব ব্যয় বহন করা জলবায়ুজনিত ঝুঁকি হ্রাস করতে সমর্থ হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। খরা, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় বীজ, গাছপালা এবং ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে এ কথা বলা বাহুল্য। ফলে কৃষকের জীবিকা নির্বাহ ও খাদ্যনিরাপত্তায় নেতিবাচকভাবে প্রভাব পড়ে। কৃষক পরিবার যারা রেমিট্যান্স পায় তারা জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধী বীজ, ফসল এবং চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা রাখে।

মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন জরুরি। এ দুয়ের জন্যই আর্থিক সক্ষমতা অত্যাবশ্যকীয়। প্রবাসীদের পাঠানো তহবিল হতে পারে এ অর্থের অন্যতম উৎস। সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ কীভাবে পরিবারকে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করে সে দিকগুলো যথাযথ তুলে ধরতে পারলে প্রবাসীরা পরিবারের কাছে অর্থ পাঠাতে উৎসাহিত হবেন। বাড়বে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণও।

বিষাক্ত বায়ু থেকে অক্সিজেন টেনেই বেঁচে থাকতে হবে?

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং একবার বলেছিলেন, **পরিবেশ হলো জীবিকা**। আর সবুজ পাহাড় ও নীল আকাশ হলো সৌন্দর্য ও সুখ। আমাদের দেশে অবশ্য প্রকৃতি ও পরিবেশ এখনো ভোট পাওয়া বা না-পাওয়ার কারণ হয়ে ওঠেনি। তাই এ নিয়ে রাজনীতিকদেরও আগ্রহ কম! দূষণ নিয়ন্ত্রণে যেটুকু কাজ হয়, তার সিংহভাগই কোনো না কোনো আদালতের নির্দেশে আর কিছু পরিবেশবাদীর সরব

ভূমিকার সুফল। তবে দূষণ কমিয়ে প্রকৃতি বাঁচাতে কী কী করণীয়—তা নিয়ে সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালা, নানা গবেষণাও কম নয়; বেশির ভাগ প্রস্তাব ও পরামর্শ কাগজে-কলমেই আটকে যায়। পরিণতিতে যা হওয়ার তাই-ই হচ্ছে।

আবহমান গ্রামবাংলায় রাস্তার দুই পাশে একসময় ফলমূলের গাছ ছিল। যেখানে বিভিন্ন পশু-পাখি এসে বসত। প্রকৃতি রাঙানো শিমুল, পলাশ, জারুল, সোনালো গাছও হারিয়ে যাচ্ছে। সেই স্থান দখল করেছে ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, আকাশিয়া, শিশুসহ নানা ভিনদেশী গাছ। এর ফলে গত কয়েক দশকে দেশের প্রকৃতি থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে অন্তত হাজারখানেক প্রজাতির নিজস্ব গাছ, যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে স্বাভাবিক রাখত। বিদেশী এসব গাছ আমাদের পরিবেশে ছাকনির ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ফলে বাতাসে ছড়াচ্ছে বিষ, যা ডেকে আনছে অকাল মৃত্যু। ধূমপানের থেকেও বেশি ঘাতক বায়ুদূষণ। শুধু তাই নয়, এতে রোগের প্রকোপ যেমন বাড়ছে, তেমনই কমছে মানুষের আয়ু।

সার্বিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি বায়ুদূষণের ফলে নানা রোগে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। এমনকি দূষিত বায়ুর কারণে বাংলাদেশীদের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে প্রায় এক বছর তিন মাস। বিশ্বজুড়ে একযোগে প্রকাশিত ‘বৈশ্বিক বায়ু পরিস্থিতি-২০১৯’ শীর্ষক প্রতিবেদন এ তথ্যই দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট (এইচইআই) এবং ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভালুয়েশনের (আইএইচএমই) যৌথ উদ্যোগে গবেষণাটি করা হয়েছিল। গেল তিন বছরে সে পরিস্থিতি তো আরো খারাপের দিকে গেছে। বায়ুদূষণে মৃত্যুর হারের দিক থেকে শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে আমরা পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, বছরে এ দূষণের কারণে বাংলাদেশে মৃত্যু হয় প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার লোকের।

পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যেও উঠে এসেছে বায়ুদূষণের ভয়াবহ চিত্র। বায়ুর মান পরীক্ষায় নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (সিএএসই) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল শহরে মোট ১১টি কন্টিনিউয়াস এয়ার মনিটরিং স্টেশন (সিএএমএস) স্থাপন করে অধিদপ্তর। এর ভিত্তিতে ২০১৭ ও ২০১৮ সালের শেষ কয়েক মাসের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। তাতে দেখা যায়, সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে; বিশেষ করে বছরের শেষদিকে বায়ুদূষণের মাত্রা বাড়ে। আর বাতাসে যেসব ক্ষতিকর উপাদান আছে, এর মধ্যে মানবদেহের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম) ২ দশমিক ৫। তার চেয়ে কম ব্যাসের অতিক্ষুদ্র এসব বস্তুকণার সহনীয় মাত্রা প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ৬৫ মাইক্রোগ্রাম, যদিও ঢাকার বাতাসে পাওয়া গেছে এর চেয়ে বেশি মাত্রায়। এসব সূক্ষ্ম বস্তুকণা নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণের ফলে সাময়িকভাবে দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট, শ্বাসযন্ত্রে প্রদাহ, চোখ জ্বলা ও ফুসফুসের রোগ। তবে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবই বেশি। দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ ছাড়াও ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্নায়ুতন্ত্র, কিডনি, লিভার ও মস্তিষ্কে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমনকি অকাল মৃত্যুও।

বাতাসে কয়েকটি রঙ ও ভাসমান ক্ষতিকর বস্তুকণার (ওজোন গ্যাস, হাইড্রোজেন সালফাইড, সিসা, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড) উপস্থিতির পরিমাণ দিয়ে বায়ুমান জানা যায়। মান ভালো হলে সবুজ, মোটামুটি ভালো হলে হলুদ, কারো কারো ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর হলে কমলা, সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর হলে লাল, খুবই অস্বাস্থ্যকরের ক্ষেত্রে বেগুনি আর বিপজ্জনক হলে খয়েরি রঙ দিয়ে সূচকে চিহ্নিত করা হয়। কয়েক বছর ধরে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বসিয়ে মার্কিন দূতাবাস ঢাকার বাতাসে দূষণ ও বিপদের মাত্রা, সেই সঙ্গে তাৎক্ষণিক করণীয় জানান দিয়ে আসছে। যেটির নাম রিয়াল টাইম এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) বা সার্বক্ষণিক বায়ুমান সূচক। বিশ্বে নির্ভরযোগ্য এ যন্ত্রের সূচকে ঢাকার বাতাসে দূষণ বা বিষের অবস্থান মারাত্মক। ২৪ ঘণ্টায়ও সবুজ সূচকে আসছে না বায়ুমান। এমনকি কমলাতেও না। বেশির ভাগ সময় বায়ুতে অতিবিপজ্জনক উপাদানের উপস্থিতি, যা কিনা চমকে ওঠার মতোই তথ্য। সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে চলতি বছরের ২০ জানুয়ারির রেটিং। ওইদিন ঢাকার বায়ুমান ছিল মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর। ওই তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংস্থা এয়ার ভিজ্যুয়ালের হিসাব অনুযায়ী, সাপ্তাহিক ছুটির ওইদিন সকাল ৮টার দিকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় ঢাকা ছিল এক নম্বরে। বায়ুমান সূচকে তখন স্কোর ছিল ৩১৭। খারাপ বায়ুর শহরের তালিকায় ওই সময় দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল ভারতের শহর কলকাতা। তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে ছিল ভারতের মুম্বাই। ওই সময়ে এ দুটি শহরের স্কোর ছিল ১৯৬ ও ১৮৯। তার মানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা কলকাতার চেয়ে ঢাকার বাতাসে দূষণের পার্থক্যটা প্রায় দ্বিগুণ!

অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণকাজ, তীব্র যানজট, মেয়াদোত্তীর্ণ মোটরযান ও শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ভারী ধাতু যোগ হচ্ছে ধুলার সঙ্গে। ফলে ঘরের বাইরে তো বটেই; বাড়িঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ ও খেলার মাঠেও ভেসে বেড়াচ্ছে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা। রাজধানীকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য ইটভাটা। যেখান থেকে নানা ধরনের সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছড়িয়ে যায় বাতাসের সাহায্যে। অবকাঠামো তৈরিতেও কোনো নিময় মানা হয় না। দীর্ঘদিন যত্রতত্র ফেলে রাখা হয় নির্মাণকাজের মাটি, বালিসহ অন্যান্য সামগ্রী। সেই সঙ্গে রাস্তার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা ময়লা-আবর্জনা থেকেও হচ্ছে বায়ুদূষণ।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) তথ্য অনুসারে, রাজধানীর বায়ুদূষণের ৫০ ভাগ হয় ইটভাটা থেকে, ৩০ ভাগের উৎস উন্নয়নের নামে চলা রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও সিটি করপোরেশনের বর্জ্য। এছাড়া ১০ ভাগ আসে গাড়ির জ্বালানি এবং বাকি ১০ ভাগ হয় শিল্প-কারখানার বর্জ্য থেকে। ঢাকার আশপাশে যেসব ভাটা রয়েছে সেগুলোয় ইট পোড়াতে যে মানের কয়লা পোড়ানো হয়, তাতে সালফারের পরিমাণ পাঁচ শতাংশ। অথচ সেটি কেবল ১ শতাংশ থাকার কথা। সেই দূষণ সরাসরি ঢাকার বাতাসে এসে মিশছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা বলছে, ব্যস্ত এ শহরে বায়ুদূষণে ধুলার অবদান প্রায় ৭৭ শতাংশ। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ হিসেবে এ দেশে ধুলা এমনিতেই বেশি। এরপর কয়েক বছর ধরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে উন্মুক্ত পরিবেশে নতুন নতুন নির্মাণযজ্ঞ বাড়িয়েছে ধুলাদূষণ। পাশাপাশি ঢাকা ও পাশের এলাকার জলাশয় ভরাট হওয়ায় ধুলার নতুন উৎস জন্মেছে, যা বায়ুদূষণ বাড়িয়েছে কয়েকগুণ। সাম্প্রতিক সময়গুলোয় বিশ্বের শহরগুলোর মধ্যে দূষণে ঢাকার অবস্থান প্রায়ই শীর্ষে উঠে আসাই তার প্রমাণ। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত শিকাগো ইউনিভার্সিটির এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউটের ‘এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্স’ -এর তথ্যে বলা হয়েছে, বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু কমেছে প্রায় পাঁচ বছর চার মাস। আর ঢাকায় কমেছে প্রায় সাত বছর সাত মাস।

প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে অভূতপূর্ব সফলতা দেখিয়েছে চীনের রাজধানী শহর বেইজিং। অথচ একসময় বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলোর একটি ছিল এটি। তখন নিয়মিত বিরতিতে এ মেগাসিটির দিকে ধেয়ে আসত বালিঝড়। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা থেকে ভেসে আসা ক্ষতিকর গ্যাস ও কালো ধোঁয়া। রাস্তায় চলাচলকারী লাখ লাখ যানবাহন তো ছিলই। কিন্তু মাত্র ১০ বছরে বেইজিংয়ের বায়ুর মান নাটকীয়ভাবে উন্নতির পেছনে কাজ করেছে সরকারের পরিবেশবান্ধব নীতিমালা এবং এসবের যথাযথ বাস্তবায়ন। যদিও অনেকেই শুরুতে তাদের এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও সাফল্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু বেইজিং পেরেছে; মাত্র এক দশকেই সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে বালিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হয়েছিল। বিপুলসংখ্যক উচ্চদূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ কিংবা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কয়লার বদলে বাড়ানো হয়েছে গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যবহার। বছরে বছরে কমিয়ে আনা হচ্ছে গাড়ির নতুন নম্বর প্লেট ইস্যু। বাড়ানো হয়েছে দূষণমুক্ত জ্বালানিচালিত গাড়ির সংখ্যা। শুধু তাই নয়, বিষাক্ত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে শহরে নামানো হয়েছে পরিবেশ পুলিশের দল। আর এ পুলিশ দলের কাজ হবে বিভিন্ন স্থান থেকে বায়ুদূষণের উৎস খুঁজে বের করা।

আর এদিকে গাছ ও পানির মাধ্যমে ঢাকার বায়ুর মান বাড়ানোর কথা থাকলেও, পরিবেশ অধিদপ্তরের বিনিয়োগ এক্ষেত্রে খুবই সামান্য। উল্টো বায়ুদূষণের কারণগুলোকে জিইয়ে রেখেই নেয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), সিটি করপোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও দূষণকারীদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। কল-কারখানা ও ইটভাটা বায়ুদূষণের প্রধান কারণ হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা বলতে গেলে শূন্য। এমনি উন্নয়নের দোহাই দিয়ে দূষণকারীদেরই ছাড় দেয়া হচ্ছে। রাজধানীর সড়কগুলোয় ধুলা নিয়ন্ত্রণে প্রতিদিন সকালে দুই সিটি করপোরেশনের কর্মীদের পানি ছিটানোর নিয়ম রয়েছে, কিন্তু সে দৃশ্য একেবারেই বিরল। তাছাড়া নির্মাণাধীন ভবনের ধুলা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব রাজউকের। তারাও সে দায়িত্বটা পালন না করে ঢাকার কলেবর বাড়ানোতেই মনোযোগী। দূষণের জন্য আমাদের আরামপ্রিয়তারও দায় আছে। কারণে-অকারণে এসি চালাচ্ছি। আর সেই শীতলীকরণ যন্ত্র থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস বায়ুকে দূষিত করছে। আবার বনায়নের নামে ভিনদেশী যেসব গাছ লাগানো হচ্ছে সেগুলো থেকে কতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড অবজার্ট হচ্ছে, কতটুকু অক্সিজেন নিঃসরণ হচ্ছে সেটা নিয়েও কোনো গবেষণা নেই। তাহলে কি আমাদের এ বিষবায়ু থেকেই অক্সিজেন টানতে হবে? নিঃশ্বাসের সঙ্গে ক্ষতিকর সূক্ষ্ম বস্তুকণা টেনেই বেঁচে থাকতে হবে?

অধিক যুদ্ধ মানে অধিক মূল্যস্ফীতি

২০২২ সালজুড়ে উন্নত অর্থনীতি ও উদীয়মান বাজারগুলোয় মূল্যস্ফীতির তীব্র উত্থান ঘটেছে। এক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ প্রবণতা সমস্যার ক্ষণস্থায়িত্বের চেয়ে সাধারণ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। বিশেষ করে অনেক দেশ এখন বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত। এর মধ্যে কিছুটা বাস্তব, কিছুটা রূপক, যা বড় রাজস্ব ঘাটতি, ঋণ হালনাগাদ এবং উচ্চমূল্যস্ফীতির দিকে ধাবিত করছে।

বিশ্ব এখন ভূ-রাজনৈতিক বিষণ্ণতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পশ্চিম এবং শ্রেণীবদ্ধ (যারা মিত্র নয়) চীন, রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া ও পাকিস্তানের মতো শোধানবাদী শক্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা সূচ্যগ্রহে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে শীতল ও উষ্ণ যুদ্ধ বেড়ে ওঠার ঝুঁকি রয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার নিষ্ঠুর আক্রমণ এখনো বাড়তে পারে এবং এখানে ন্যাটোর জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ইসরায়েল

এবং একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু অস্ত্রের রাষ্ট্র হওয়ার প্রান্তিক সীমায় থাকা ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষের পথেই রয়েছে। এদিকে বিস্তৃতভাবে মধ্যপ্রাচ্য চূর্ণ ব্যারেলের পরিণত হয়েছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও চীন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে যে এশিয়ায় কে কর্তৃত্ব করবে? যেখানে তাইওয়ানকে ভবিষ্যতে জোরপূর্বক মূল ভূমির সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করার বিষয়টি রয়েছে।

এমন প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও ন্যাটো পুনরায় সশস্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে, যা মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, এর মধ্যে জাপানও রয়েছে। দেশটি কয়েক দশক ধরে বৃহত্তম সেনাবাহিনী নির্মাণ শুরু করেছে। প্রচলিত ও অপ্রচলিত অস্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে (যার মধ্যে পরমাণু, সাইবার, বায়ো এবং কেমিক্যাল অস্ত্র রয়েছে)। নিশ্চিতভাবে এসব ব্যয় জনগণের অর্থ থেকেই করা হয়েছে।

অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক যুদ্ধ সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনের ক্ষেত্রে আগামী দশকে প্রতি বছরের জন্য ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হতে পারে। এটা ভাবা খুব অর্থহীন ব্যাপার যে এসব বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি বাড়াবে। প্রকৃত যুদ্ধের পর একটি দেশের অবকাঠামোগত পুঁজি যেভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, বিনিয়োগ প্রবাহ তখন অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে। তবু সে দেশটি সম্পদের বৃহৎ অংশ হারিয়ে ফেলায় অত্যধিক দরিদ্র হয়ে পড়ে।

এটি জলবায়ু বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সত্য। বিদ্যমান মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিস্থাপিত করার প্রয়োজন হবে। কারণ এটি পুরনো হয়ে গেছে অথবা জলবায়ুকেন্দ্রিক ঘটনায় বিলীন হয়েছে।

আমরা বর্তমানে ভবিষ্যৎ মহামারীর বিরুদ্ধে ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত। বিভিন্ন কারণে এর কিছু জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভবিষ্যতে মহামারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘন ঘন দেখা দেবে। ফলে দেশগুলো রোগ প্রতিরোধে বিনিয়োগ করছে অথবা রোগ প্রকাশের পর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সক্ষমকরণে স্থায়ী ভিত্তিতে উচ্চমূল্যে প্রতিষেধকে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। সত্য প্রকাশের পর এ সবকিছুই ক্রমবর্ধমান বোঝা হিসেবে যুক্ত হচ্ছে যা সামাজিক বার্ধক্য এবং স্বাস্থ্যসেবা ও পেনশন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে সেবা পাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরই মধ্যে এ অন্তর্নিহিত চলতি ঋণের বোঝা অধিকাংশ উন্নত অর্থনীতিতে স্পষ্ট আন্তর্জাতিক ঋণ মাত্রার অতি নিকটে অবস্থান করছে বলে ধরে নেয়া হচ্ছে।

অধিকন্তু গৌড়ামিপূর্ণ ঐক্যনাশক প্রভাবের বিরুদ্ধে আমাদের অভিন্নতা সন্ধান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশ্বায়ন এবং স্বয়ংক্রিয়তা (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবটিকসও অন্তর্ভুক্ত) নীল এবং সাদা কলারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ভীতি প্রদর্শন করছে। এক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়বে তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সরকারগুলো চাপের মধ্যে থাকবে, যা মৌলিক উপার্জন ক্ষিম, বৃহৎ রাজস্ব স্থানান্তর অথবা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়া সরকারি সেবার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে।

এ খরচগুলো বড় আকারেই থাকবে, এমনকি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রবাহে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখে। উদাহরণ হিসেবে ন্যূনতম সর্বজনীন মৌলিক উপার্জন প্রতি মাসে ১ হাজার ডলার হওয়াকে সমর্থন করা হলে তা যুক্তরাষ্ট্রে দেশটির জিডিপি প্রায় ২০ শতাংশের সমান হবে।

সর্বোপরি আমরা অবশ্যই উপার্জন এবং সম্পদের অসমতা বৃদ্ধি পাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করব, এটি জরুরি এবং সম্পর্কিত। অন্যথায় যুবসমাজের কষ্টদায়ক অস্থিরতা ও অনেক মধ্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর কাজ উদার গণতন্ত্র এবং মুক্তবাজার পুঁজির বিপক্ষে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবে। ক্ষমতায় আসা ও বেপরোয়া অনুসরণ, অস্থিতিশীল আর্থিক নীতি, উদার গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মুক্তবাজার থেকে জনপ্রিয় শাসনকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে যুবকদের সামাজিক নিরাপত্তাজাল শক্তিশালী করার জন্য ভাগ্য অতিবাহিত করা প্রয়োজন, যা অনেকে এরই মধ্যে করছে।

এ পাঁচটি যুদ্ধ ব্যয়বহুল হবে, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণ সরকারের সক্ষমতাকে উচ্চ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করবে। কর থেকে জিডিপি অনুপাত এরই মধ্যে অধিকাংশ অগ্রসর অর্থনীতিতে উচ্চ-অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোয় কর ফাঁকি দেয়া, পরিহার ও সালিশি অধিক উপার্জন এবং পুঁজির ওপর কর বৃদ্ধি পাওয়ার পরবর্তী প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলবে। (কল্পনা করা যায় এ পরিমাণটি লবিষ্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছিল এবং মধ্য ডান পক্ষের কাছ থেকে লেনদেন নিরাপদ করেছিল)

যদিও এসব প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরকারের খরচ বাড়িয়েছে এবং জিডিপির অংশ হস্তান্তর করছে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণতা ছাড়াই কর আদায় বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে কাঠামোগত বাজেট ঘাটতি যা এরই মধ্যে যে অবস্থানে রয়েছে, পরবর্তী সময়ে সে অবস্থানের তুলনায় বৃহৎ

আকারে বৃদ্ধি পাবে। সম্ভাব্যভাবে এটি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিকূল অনিবার্য প্রভাবের সঙ্গে অস্থিতিশীল ঋণ অনুপাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা ঋণের মূল্য বৃদ্ধি ও ঋণ সংকটকে চূড়ান্ত করবে।

এক্ষেত্রে সে দেশগুলোর জন্য যারা তাদের নিজস্ব মুদ্রা ধার করে, তাদের জন্য উচ্চতর মূল্যবৃদ্ধি অনুমোদনের উপযুক্ত উপায় হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি নির্দিষ্ট মূল্যের নামমাত্র ঋণের প্রকৃত মূল্য হাস করা। এ পন্থা সঞ্চয়কারী ও ঋণ প্রদানকারীর বিপক্ষে এবং ঋণগ্রহীতা এবং দেনাদারের পক্ষে পুঁজি ধার্য করার মতো কাজ করে। এটি সম্পূর্ণক, অর্থনৈতিক নিগ্রহের মতো কঠোর পরিমাপ, পুঁজির ওপর কর এবং পুরোদস্তুর ত্রুটির ক্ষেত্রে সমন্বিত হতে পারে (যে দেশগুলো বিদেশী মুদ্রা থেকে ধার করে অথবা যাদের ঋণ ব্যাপকভাবে স্বল্পমেয়াদি কিংবা মূল্যস্ফীতির দায়ে সূচিত)। কারণ করারোপের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির কর সূক্ষ্ম এবং গোপনীয়। এক্ষেত্রে আইনানুগ এবং নির্বাহী অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। এটি ন্যূনতম প্রতিরোধের ত্রুটিযুক্ত পথ, যখন ঘাটতি এবং ঋণ অস্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমি প্রাথমিকভাবে চাহিদার কারণের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাই, যা উচ্চতর ব্যয়, ঘাটতি, ঋণ নগদীকরণ এবং মূল্যস্ফীতির দিকে ধাবিত করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমষ্টিগত সরবরাহে অনেক মধ্যমেয়াদি নেতিবাচক ধাক্কা রয়েছে, যা বর্তমানের মূল্যস্ফীতিমূলক চাপ, মন্দার কুঁকি বৃদ্ধি এবং ঋণ সংকটের প্রবাহে নতুন সংযুক্তি ঘটাবে। সব মিলিয়ে বলা যায় সংযমের মহৎ গুণ মৃত্যুবরণ করার পর সমাধিস্থ হয়ে গেছে, তাই বিরাট মূল্যস্ফীতির বোঝা আমাদের ওপর চেপে বসেছে।

তরুণদের বিদেশযাত্রা না ঠেকালে দেশ স্মার্ট হবে কী করে

নাগরিক বিকাশের ধারায় মানুষ গ্রামের মেঠোপথ ধরে শহরে আসে। শহর অভিমুখে মানুষের এ যাত্রা চলমান। জীবনের বিচিত্র তৃষ্ণা, বৈচে থাকার রসদ ও স্বাস্থ্যের খোঁজে মানুষ শহর বা রাজধানীতে পা বাড়ায়। এ আগমন সবার জন্য মসৃণ নয়। তবু অনেকে নগরে ঠাই খুঁজে নেন। সাধ মিটে গেলে অনেকে নিজ নগরেও আর থাকতে চান না। কেউ কেউ পাড়ি দিতে চান ভিন কোনো রাজ্যে।

যে দেশে মানুষের জন্ম, যেখানে দীর্ঘসময় বসবাস, সে দেশ ছেড়ে মানুষ কখন যান? চেনা-জানার গন্ডি পেরিয়ে, কেউ যখন দূর দেশে উপস্থিত হন, তখন কি তার জন্য শুধু সুখ আর সুখ অপেক্ষা করে? অন্য ভাষা, অন্য মানুষ ও বিচিত্র ভৌগোলিকতা ভেদে জীবনের সে অধ্যায়ের পাতায় ভাগ্য কতটা সুপ্রসন্ন থাকে?

কথিত আছে, জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলে যাও। বাংলাদেশী তরুণদের বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা দেখে বলা যায়, এ কথার মর্ম তারা ভালোই বুঝতে পেরেছেন। শুধু চীন নয়, উচ্চশিক্ষার জন্য তারা এখন বিশ্বের সব প্রান্তে ছুটছেন। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রকাশিত ‘ওপেন ডোরস-২০২২’ শীর্ষক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া বিশ্বের ২৫ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৩তম। বর্তমানে দেশটিতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ৫৯৭।

সাকলাইন মোস্তাক নামে এক শিক্ষার্থী লুইজিয়ানা ইউনিভার্সিটিতে ক্যান্সার ফার্মাকোলজি বিষয়ে পিএইচডি করছেন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়ার আগে একজন শিক্ষার্থীর তিন-পাঁচ বছরের প্রস্তুতি ও ৩-৪ লাখ টাকা খরচ করতে হয়। জিআরই বা টোফেলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আবেদন ও ফাইল পাঠাতে, সেভিস ফি, ভিসা ফি এবং অন্যান্য খরচে এসব অর্থ ও সময় ব্যয় হয়।

এটা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের চিত্র। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, জার্মানিসহ অন্য ইউরোপীয় দেশগুলো পছন্দের তালিকায় রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন শিক্ষার্থীরা যাচ্ছেন। তারা যে শুধু বৃত্তি নিয়ে যাচ্ছেন তা নয়, বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যাওয়া অনেক শিক্ষার্থীর পরিবারকে সম্পত্তি বন্ধক কিংবা জমানো সঞ্চয় খরচ করতে হয়।

কানাডা সরকারের ইমিগ্রেশন, রিফিউজিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ (আইআরসিসি) বিভাগের তথ্যানুসারে, দেশটিতে অধ্যয়নে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের আবেদন ২০১৬-১৯ সালের মধ্যে ২৭০ শতাংশ বেড়েছে। ইউনেস্কোর তথ্যানুযায়ী, ২০১৫ সালে দেশের বাইরে পড়তে গিয়েছিলেন ২৪ হাজার ১১২ শিক্ষার্থী। ২০২০ সালে সে সংখ্যা চার গুণ বেড়েছিল। ইউনেস্কোর তথ্য বলছে, উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতি বছর গড়ে ৭০-৮০ হাজার বাংলাদেশী শিক্ষার্থী বিদেশে ভ্রমণ করছেন। যদিও প্রতি বছর বাংলাদেশে যত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায়, সে তুলনায় এ সংখ্যা খুব কম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিদেশে যারা যাচ্ছেন, মেধা ও দক্ষতার জোরেই যাচ্ছেন। দুঃখজনক হলো,

দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট থেকে প্রতি বছর বড় একটি সংখ্যা বিদেশ চলে যান, সেখান থেকে খুব কমই দেশে ফিরে আসতে চান।

শুধু শিক্ষার্থী নয়, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরাও দেশ ছাড়ছেন। অনেক শিক্ষক বিদেশে এমএস ও পিএইচডি করতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে যান। বিদেশে থাকাকালীন তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিত বেতন নেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ বছরের বেশি সময় তাদের বেতন দিয়ে যায়। কিন্তু ডিগ্রি শেষে দেশে ফিরতে তারাও অনিচ্ছুক। মূলত শিক্ষা বা ডিগ্রিকে বিদেশে ঠাই নেয়ার একটা উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন তারা।

আবেগী জায়গা থেকে দেশপ্রেমের কথা আসতে পারে, কিন্তু যারা পরদেশে স্থায়ী হতে চান তাদের কতটা দোষারোপ করতে পারবেন? বাস্তবিক অর্থে তাদের কাছে এ দেশে থাকার মতো কোনো কারণ নেই। মানহীন শিক্ষা কারিকুলাম, অপরিপূর্ণ চাকরির বাজার, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিদেশের মাটিতেই তারা স্বপ্ন বুনছেন।

এ সংকট নিয়ে দেশত্যাগী ও সরকার উভয়কেই ভাবতে হবে। কেউ যদি বসবাসের জন্য উপযোগী বা নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেশ ছাড়েন, সেটি আরেকবার ভাবতে হবে। কারণ, যে দেশে তারা ভবিষ্যৎ দেখছেন, সেখানকার পরিবেশ যে অনিরাপদ হয়ে উঠবে না, তার নিশ্চয়তা কি? উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে গুলিবর্ষণ ও সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতা বেড়ে যাওয়া। শ্রীলংকার অবস্থাও তো একসময় ভালো ছিল। এছাড়া কানাডা সরকার কিছুদিন আগে দেশটিতে বিদেশীদের বাড়ি কেনা বন্ধ করেছে। এতে অনেক প্রবাসী বিপাকে পড়েন। কারণ কানাডায় স্থায়ী ও আবাসন করার জন্য অনেকে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। কেউ নিজের সবটুকু সঞ্চয় নিয়ে সেখানে পাড়ি জমিয়েছেন।

সরকারকে মনে রাখতে হবে, কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে ভাবলে দেশ সুষ্ঠুভাবে এগোবে না। সরকারকে বুঝতে হবে, তরুণদের ছাড়া দেশ স্মার্ট হবে না। তারা নিজ দেশের মাটি, জল, আলো বাধ্য হয়ে ছাড়ছেন। যে কেউ বা কোনো সংস্থা যদি তরুণদের মাঝে জরিপ চালায়, যদি তরুণদের প্রশ্ন করা হয়, ‘বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা আছে কিনা’ জবাবে ৭০-৮০ শতাংশ উত্তর আসবে হ্যাঁ। এর কারণ হিসেবে উন্নত শিক্ষা, জীবনমান, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার কথাই আসবে।

উচ্চশিক্ষা অর্জনে বিদেশে যাওয়া অবশ্যই ইতিবাচক, কিন্তু ফিরে না আসাটাই উদ্বেগ ও অর্থহানির। এজন্য সরকারকে শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও বিদেশী ডিগ্রিদারীদের দেশে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। বিকল্প হিসেবে সরকার বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাংলাদেশে শাখা খোলার অনুমোদন দিতে পারে। ভারত এরই মধ্যে ইয়েল, অক্সফোর্ড ও স্ট্যানফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দিতে একটি খসড়া তৈরি করেছে।

ইউএনএফপিএর তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বয়স ১৫-৩৫ বছর। এ বয়সে মানুষ দ্রুত শিখতে পারে ও নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের নিম্নমুখী জন্মহারের কারণে কর্মী চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষায় বৃত্তি দিয়ে অভিবাসী নিচ্ছে। আর এ সুযোগ লুফে নিচ্ছেন বাংলাদেশী তরুণরা। পাঁচ বছর আগে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম এক জরিপে দেখেছে, বাংলাদেশ থেকে ১৫-২৯ বছর বয়সী ৮২ শতাংশ মানুষ দেশ ছাড়তে আগ্রহী।

দেশে ভালো গবেষণাগার নেই, মানসম্মত পরীক্ষাগার নেই। গবেষণা বাড়ানো ও দক্ষ স্নাতক তৈরির জন্য গবেষণাগার নির্মাণ, ভালো একাডেমিক পরিবেশ নিশ্চিত সরকারকে মেগা পরিকল্পনা করতে হবে। কারণ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও স্থানীয় চাকরির জন্য স্নাতক তৈরি হচ্ছে। সে চাকরি পেতেও তারা হিমশিম খাচ্ছেন। আবার ভালো ও দক্ষ একাডেমিক রেকর্ডধারী শিক্ষার্থীরা দেশে পছন্দের চাকরি পাচ্ছেন না। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা একটি চাকরি পেলেও তাদের জীবন এবং পরিবার সহজভাবে চালাতে পারেন না। তবে বিদেশে একটি চাকরি বা কর্ম পেলে তারা কাঙ্ক্ষিত জীবনযাপনের আশা দেখেন। আর্থিক খাত, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ দেশের প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা প্রাধান্য পেয়েছে। এসব দেখে হতাশ হয়ে তরুণরা শিক্ষা ও চাকরির জন্য বিদেশে চলে যাচ্ছেন।

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে তরুণদের ধরে রাখতে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের বিকল্প নেই। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত চেষ্টা থাকতে হবে। একই সঙ্গে তরুণদেরও দেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার কথাটি মনে রাখতে হবে। বিদেশে থেকেও দেশ, দেশের মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কারণ, দেশটা আমাদের

সবার। প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে সং ও সুন্দরভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করলে ২০৪১ সাল লাগবে না, তার আগেই দেশ স্মার্ট হয়ে যাবে।

পরিণত অর্থনীতির নতুন দিনের চ্যালেঞ্জ

প্রতি বছরের মতো এবারো অনেক উৎসাহ আর উদযাপনের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবী ২০২৩ সালকে স্বাগত জানিয়েছে। সিডনি, টোকিও, লন্ডন, নিউইয়র্ক, এমনকি ঢাকার আকাশেও দেখা গেছে হরেক রঙের আতশবাজি। বিগত বছরের শুরু আর শেষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছি। বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পরবর্তী প্রথম বছর হিসেবে ২০২২ সালের শুরুটা অনেক ইতিবাচক ছিল। কারণ বিশ্বব্যাপী ভোক্তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং আশা করা হচ্ছিল যে বৈশ্বিক অর্থনীতি মন্দা ভাব থেকে ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে সৃষ্ট সংকটের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতির এ প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি থমকে যায়।

অনেক প্রত্যাশা থাকলেও ২০২২ সালটি ছিল বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ভাষায়, ২০২২ সাল ছিল ‘নৈরাশ্যজনক, আরো অনিশ্চিত’। মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ও খাদ্যপণ্য খাতের সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। ইউক্রেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য রফতানি করে। রাশিয়া বিশ্বের বিশেষ করে ইউরোপের জ্বালানির বড় একটা অংশ সরবরাহ করে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি আর খাদ্যশস্যের সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে এ দুটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। এ দাম বাড়ার ফল হিসেবে পৃথিবীব্যাপী মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায় এবং পণ্যের সংকট দেখা দেয়। আইএমএফের সমীক্ষা অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর মূল্যস্ফীতি ৮-১০ শতাংশে পৌঁছে, যা গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশ্বায়নের কারণে বিশ্বের সব দেশের অর্থনীতিই এখন অত্যন্ত সংযুক্ত আর যেহেতু বাংলাদেশ ক্রমেই একটি বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি হিসেবে বিকাশিত হচ্ছে, এ বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব আমাদের অর্থনীতিতে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে ব্যাপক আর প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়েছে।

বৈশ্বিক সংকটের কারণে শুধু রাশিয়া বা ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যই ব্যাহত হয়নি, সরবরাহ ব্যবস্থার বিপর্যয় আর বিশ্ববাজারে জ্বালানিসহ অত্যাবশ্যকীয় আমদানি পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমাদের মুদ্রাস্ফীতিও বেড়ে যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। বৈশ্বিক সংকটের প্রতিক্রিয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষ করে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়। টাকার অবমূল্যায়নের এ প্রভাব জ্বালানি ছাড়াও অন্যান্য খাত যেমন আমাদের ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস (এফএমসিজি) বা ভোগ্যপণ্য খাতেও দেখা দিতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে আমি সাবান বা ডিটারজেন্টের মতো বহুল প্রচলিত পণ্যগুলোর কথা বলতে পারি। সাবান, ডিটারজেন্ট বা টুথপেস্টের মতো পণ্যগুলো দৈনন্দিন জীবনে সব শ্রেণীর মানুষ ব্যবহার করে এবং এ পণ্যগুলোর ব্যবহার দেখেই যেকোনো অর্থনীতির গতিবিধি ও ধারা বিশ্লেষণ করা যায়। বাংলাদেশে বিক্রি হওয়া ইউনিলিভারের পণ্যগুলোর ৯৫ শতাংশেরও বেশি পণ্য বাংলাদেশেই উৎপাদিত হয়। কিন্তু এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কাঁচামালের ৬০-৭০ শতাংশ আমদানিনির্ভর এবং আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসব কাঁচামাল আমদানি করে থাকি। ২০২২ সালের বিশ্ববাজারে এসব শিল্প কাঁচামালের চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ কমে যায় ও দাম বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে টাকার বিনিময় হার আর পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের উৎপাদন ব্যয় প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। আমাদের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে ভোক্তা পর্যায়েও অধিকাংশ পণ্যের দাম সমন্বয় করতে আমরা বাধ্য হই।

বিগত বছরটা আমাদের সবার জন্য ছিল নিজেদের সক্ষমতা বিশ্লেষণ করে পরিণত, বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেয়ার। আমাদের আশঙ্কা ছিল যেহেতু আমাদের পণ্যের দাম অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে, এর ফলে সাবান বা ডিটারজেন্টের ব্যবহার আশঙ্কাজনক কমে যেতে পারে। আমাদের ব্যবসা পরিচালনার একটি মূল ভিত্তিই হচ্ছে ইকোনমি অব স্কেল বা ব্যাপক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করা, যাতে প্রতি ইউনিট পণ্যের উৎপাদন খরচ কম হয়। উৎপাদন কমে গেলে আমাদের অধিকাংশ পণ্যের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়। তাই বাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণে চাহিদা না থাকলে আমাদের পক্ষে পণ্যের উৎপাদন বা সরবরাহ চালু রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক লোকসানের মুখে পড়তে হয়। একই সঙ্গে আমাদের উৎপাদিত পণ্যগুলোর নিয়মিত ব্যবহার করা হয় মূলত অভ্যাসের কারণে। আমাদের ভোক্তারা কোনো কারণে একবার পণ্য ব্যবহার কমিয়ে দিলে বা ব্যবহার বন্ধ করে দিলে তাদের পণ্য ব্যবহারের সেই অভ্যাস পুনরায় ফিরিয়ে আনতে আমাদের কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কার্যক্রমে বিপুল বিনিয়োগ করতে হয়। তাই সর্বসাধারণের কথা, বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা আমাদের বহুল প্রচলিত ব্র্যান্ডের বেশি ব্যবহার

হওয়া প্যাকগুলোর দাম বৃদ্ধি করিনি। বেসিক ভ্যালু সেগমেন্ট বা এ প্যাকগুলোয় আমাদের মার্জিন বা লাভ কম হলেও আমাদের অগ্রাধিকার ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাদের নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ডের পণ্যের জোগান নিশ্চিত রাখা। এ জোগান নিশ্চিত করতে আমাদের ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় সংকোচন করতে হয়েছে এবং পণ্যের ব্র্যান্ড বিল্ডিং কার্যক্রমে বিনিয়োগ কমানোর মতো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

২০২২ সালে আগের বছরগুলোর মতো আমাদের প্রিমিয়াম সেগমেন্টগুলোর তেমন প্রবৃদ্ধি হয়নি, কিন্তু আমাদের এন্ট্রি সেগমেন্ট বা বেসিক ভ্যালু সেগমেন্টগুলোর পণ্য মানুষ বেশি হারে ব্যবহার করেছে। এ ধারা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সংকটের মধ্যেও জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে আত্মবিশ্বাসী আর এ মান ধরে রাখার মতো অর্থনৈতিক সক্ষমতা তারা এরই মধ্যে অর্জন করেছে।

গত এক বছরের জাতীয় পর্যায়ের অর্জনের কথা বলতে গেলে আমরা অবশ্যই পদ্মা সেতু বা মেট্রোরেলের মতো অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করার কথা গর্বের সঙ্গে বলব। পাশাপাশি আমি মনে করি আমাদের আরো একটি বড় অর্জন হচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের এ দুরূহ সময়েও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এ অর্জন সম্ভব করার জন্য সরকার, বেসরকারি খাতের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এ কারণেই আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ—যেমন পাকিস্তান বা শ্রীলংকার চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিশীল পর্যায়ে আছি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় একটি শক্তি হচ্ছে আমাদের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত ভোক্তা শ্রেণী, যাদের সংখ্যা ও আয় প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ উদীয়মান ভোক্তা শ্রেণীর বিকাশের কারণে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি বড় উৎস, যা আগামী দিনগুলোতে আরো জোরালো ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বর্তমান ধারা বজায় রাখার জন্য সরকার অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফল হিসেবে আমরা অর্থনীতি আর বৈদেশিক রিজার্ভ পরিস্থিতি উন্নতির কিছু পূর্বাভাস পাচ্ছি।

আমাদের উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে আর তাই ২০২৩ সাল আমাদের অর্থনীতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। আমরা জানি, সরকার প্রণোদনা আর বহুমুখীকরণের মাধ্যমে আমাদের রফতানি আর প্রবাসী আয় বৃদ্ধির জন্য নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু বিষয় বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে। যেমন বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধাগুলো দূর করে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের পাশাপাশি সরকারের উচিত দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সমর্থন দেয়া, যাতে সংকটের সময় আর্থিক খাতের প্রতি দেশের মানুষের আস্থার ঘাটতি দেখা না দেয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশী ও বৈদেশিক বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই, তাই বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। যেকোনো বিনিয়োগকারীর জন্যই দীর্ঘমেয়াদি কর নীতি একটা আস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট আর আশ্বস্ত করতে করনীতির স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সংস্থাও আলাদা হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের আরো প্রয়োজন আমদানিনির্ভরতা হ্রাস করার জন্য দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে আমাদের প্রাইমারি বা প্রথাগত শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে আমরা আমদানিনির্ভর কাঁচামালের দেশী বিকল্প উৎস নিশ্চিত করতে পারি। যেমন ১৯৮০-৯০ সালের আগেও আমাদের দেশের প্যাকেজিং পণ্যের প্রায় পুরোটাই ছিল আমদানিনির্ভর। কিন্তু ইউনিলিভার তখন স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কাজ করে এই খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করেছিল। এ বিনিয়োগের ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশের প্যাকেজিং খাত মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আমাদের অধিকাংশ প্যাকেজিং কাঁচামাল আমরা বাংলাদেশ থেকেই সংগ্রহ করি। একইভাবে ২০২২ সালের সংকট-পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আমরা শিল্প কাঁচামালের আমদানিনির্ভরতা কমানোর উদ্দেশ্যে বিকল্প উৎস উন্নয়নের জন্য বেশকিছু উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছি। এক্ষেত্রে সাফল্যের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে নতুন ধারার এ চিন্তাগুলোর সহজ ও দ্রুত বাস্তবায়ন। সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা উদ্ভাবনী আর নতুন চিন্তা বাস্তবায়নে অনুকূল নীতি সহায়তা আর নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে এ ধরনের পদক্ষেপ ইতিবাচক সহায়তা আর উৎসাহ প্রদান।

আমাদের সবার বিবেচনা করতে হবে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন অনেক পরিণত আর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত। সরকারের রাজস্ব আয় থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের জীবনমানের সবকিছুই দেশের অর্থনীতি আর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ কারণেই যেকোনো দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অংশগ্রহণমূলক হওয়া উচিত। তাই সরকার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলে বা নীতি প্রণয়ন করলে সরকারের

রাজস্ব আয় যেমন স্থিতিশীল থাকবে এবং নীতির বাস্তবায়ন সহজ হবে, তেমনি দেশের সাধারণ দেশবাসীর জীবনযাত্রাও সহজ হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশ হতে, বিশেষ করে ভিশন ২০৪১ অনুসারে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হতে হলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে হতে হবে এবং আমাদের আগামী দিনের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো আগের চেয়ে জটিল ও বহুমুখী হবে। কিন্তু আমাদের অর্থনীতিও এখন অপেক্ষাকৃত পরিণত, তাই চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান খুঁজে বের করে বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা ও ব্যবহার অর্জন করতে হবে।

নতুন বছরে কেমন যাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি

গত বছরটা ছিল বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ঝঞ্ঝাবিস্কন্ধ ও টালমাটাল এক বছর। বিশেষ করে মূল্যস্ফীতির জন্য বছরটি অনেক বছর ধরে বিশ্লেষকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কভিড-এর ধাক্কা সামলে যখন চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে গোটা বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পথে তখনই ইউক্রেনে যুদ্ধ ও তার ফলে সৃষ্ট ভূরাজনীতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সরবরাহ ক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। গত মার্চে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি গবেষণা সংস্থার খাদ্য মূল্যসূচক ছিল বিগত ৬০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চে। আবার জুনে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড করে। উন্নত দেশগুলোর সংগঠন ওইসিডিভুক্ত (অর্গানাইজেশন অব ইকোনমিক কো অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) দেশগুলোয় জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গড়ে ১০ শতাংশের ওপরে মূল্যস্ফীতি ছিল। ইংল্যান্ড, ইতালি, জার্মানিতেও মূল্যস্ফীতি দুই অংক অতিক্রম করেছে। ব্যারেলপ্রতি ক্রুড অয়েলের মূল্য ফেব্রুয়ারিতেই ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায় আর তা অব্যাহত থাকে জুলাই পর্যন্ত। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা ও গবেষকরা ২০২৩ সালের দিকে একটি মন্দা আসতে পারে বলে মত দিচ্ছিলেন।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের একটি স্টাডিতে (‘বিশ্বমন্দা কি আসন্ন?’) বলা হয়েছে যদি আগামীতে সরবরাহজনিত বিঘ্ন ও শ্রমবাজারের ওপর চাপ না কমে তবে ২০২৩ সাল নাগাদ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির (জ্বালানি বাদ দিয়ে) হার ৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে, যা করোনা মহামারীর আগের পাঁচ বছরের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি। এ হার যদি চলতে থাকে তাহলে মূল্যস্ফীতি কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যদি গড়ে আরো সুদের হার বাড়ায়, তাহলে বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমে যেতে পারে, যা মন্দার কারিগরি সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে যেতে পারে। ১৯৭০ সালের পর যত মন্দা হয়েছে এর সবই আগের বছরের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সম্প্রতি সতর্কবাণী দিয়েছেন, আগামী বছর বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশ মন্দায় আক্রান্ত হতে পারে। কারণ বড় অর্থনীতির দেশগুলোর (যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীন) একই সঙ্গে প্রবৃদ্ধি কমে যাবে। ব্লুমবার্গের অর্থনীতিবিদদের সমীক্ষাও বলছে, ২০২৩ সালে মন্দার ৭০ শতাংশ সম্ভাবনা আছে। ‘দি ইকোনমিস্ট’ ম্যাগাজিনও বলছে, ২০২৩ সালে মন্দা অনিবার্য। মন্দার পূর্বাভাস বলা যায় সর্বজনীন।

গত বছরটা আমাদের জন্য একদিকে যেমন ইতিবাচক ছিল, তেমনি অনেক চাপের মধ্যেও ছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গত আগস্টে মূল্যস্ফীতি প্রায় দুই অংকের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, যা ছিল এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চে। সে ধারাবাহিকতায় চলতি বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। বছরের দ্বিতীয় ধাপে ডলারের সংকট বেশ ভুগিয়েছিল, ফলে আমাদের সতর্কতামূলক পন্থা হিসেবে আইএমএফের কাছে ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের ঋণের আবেদন করতে হয়। তাছাড়া ডলারের বিপরীতে টাকার মান দ্রুত কমে যায়। বৈদেশিক রিজার্ভ জানুয়ারিতে ৪৫ বিলিয়ন ডলার থেকে নেমে গত ডিসেম্বরে ৩৪ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে। এর বাইরেও ডলার সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়াতে হয়েছিল। মাঝখানে মে-জুলাই-এ আগাম বন্যার কারণে বোরোর উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, দেশের পরিস্থিতি অর্থনীতির জন্য তেমন অনুকূলে ছিল না।

এ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সরকার কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থছাড় কমানো, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, সরকারি খরচের ওপর কৃষ্ণসাধন, বিলাসপণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বৃদ্ধি, বাজার তদারকিসহ খোলাবাজারে স্বল্প দামে নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়, কৃষিকাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, সার ও কৃষি উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রবাসী আয় বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা।

এর মধ্যে সুখবর হলো বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের দাম আগের বছরের অবস্থায় ফিরে এসেছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার খাদ্যমূল্য সূচক ডিসেম্বর ২০২২-এ ১৩২ দশমিক ৪, যা আগের বছরের ডিসেম্বরে ছিল ১৩৩ দশমিক ৭। ব্যারেলপ্রতি ক্রুড জ্বালানি তেলের দাম এ জানুয়ারি ২০২৩-এ ৭৫ ডলারে নেমে এসেছে। অথচ এক বছর আগে তা ছিল ৮৪ ডলার। সাম্প্রতিক কয়েক মাসেই

অর্থনীতির সূচকগুলো ইতিবাচক দিকে ধাবিত হচ্ছে। অক্টোবর থেকে রফতানি ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বমুখী। ডিসেম্বরেই রফতানির পরিমাণ ৫ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছে, যা মাস ভিত্তিতে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। আবার রফতানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমদানির প্রবণতা নিম্নমুখী, যা চলতি হিসাব ভারসাম্যে রাখতে সহায়ক হবে। আগস্টে যে মূল্যস্ফীতি এক দশকে সর্বোচ্চ ছুঁয়েছিল তা চার মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে কমছে। প্রবাসী আয়ের ধারাও অক্টোবর থেকে উর্ধ্বমুখী। সে সঙ্গে ব্যক্তি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডলারের বিপরীতে টাকার মানের যে অস্থিতিশীলতা ছিল তা মনে হচ্ছে দূরীভূত হয়েছে। বন্যার পর এবার আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে।

সরকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের দিকে লক্ষ রেখে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। গত জুনেই পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার দৃশ্যমান পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। গত নভেম্বরে ১০০ সেতু আর ডিসেম্বরে ১০০ সড়ক উদ্বোধন করা হয়েছে। নভেম্বরে কর্ণফুলী টানেলের প্রথম টিউব চালু ও ডিসেম্বরে মেট্রোরেলের প্রথম অংশ উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০২৩ সালে যেসব মেগা প্রকল্প উদ্বোধন করা হবে সেগুলো হলো—কর্ণফুলী নদীর তলদেশে দ্বিতীয় টানেল উদ্বোধন, পদ্মা সেতুতে রেলসংযোগ, ঢাকা-কক্সবাজার রেল লিংক, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বৃগপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। ২০২২ সালে যেসব প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে সেগুলোর পুরোপুরি সুফল পাওয়া শুরু হবে ২০২৩ সাল থেকে। কাজেই ধারণা করা যায়, ২০২৩ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি কভিড-এর আগের যে গতি ছিল তা পুনরায় ফিরে পাবে এবং ত্বরান্বিত হবে। অক্টোবর ২০২২-এ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আউটলুক ডাটাবেজে বলা হয়েছে ২০২২ ও ২০২৩-এ ভারত, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ—এ তিন দেশ হবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধিশীল দেশ। অবশ্য সেটা ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের প্রক্ষেপণ।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার আশঙ্কা, উন্নত দেশগুলোয় উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রক্ষেপণে এখন বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার কমিয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ২০২৩ সালে ৫ দশমিক ২, আইএমএফ ৬ দশমিক শূন্য এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৬ দশমিক ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করেছে। অর্থ বিভাগও চলতি অর্থবছরে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রস্তাব করেছে। বাংলাদেশ যেহেতু বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত সেক্ষেত্রে বৈশ্বিক মন্দায় প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কম হতে পারে। তবে আগামী অর্থবছর থেকে বাস্তবতা বিবেচনায় বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য স্বল্পমেয়াদি চ্যালেঞ্জ থাকলেও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। সে কারণে অর্থনীতিতে চাপ থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থা মুডিজ ও স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর এখনো বাংলাদেশের জন্য গ্রেড স্থির ও অপরিবর্তিত রেখেছে। লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক রিসার্চ (সিবিইআর) ডিসেম্বর ২০২২-এ ১৯১টি দেশের জন্য ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবল ২০২৩’ প্রকাশ করেছে। এতে ২০৩৭ সাল পর্যন্ত অর্থনীতির আকার দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ২০৩০-৩২ নাগাদ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। ২০৩৭ সালে অর্থনীতির আকারে ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে।

আমাদের সামনে বড় যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেটি হলো অভ্যন্তরীণ আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো। জিডিপির অনুপাতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়তে যে সংস্কার কার্যক্রম চলমান তা আরো বেগবান করতে হবে। সম্প্রতি আইএমএফ ঋণের জন্য যে শর্ত প্রস্তাব করেছে তার বেশির ভাগই যৌক্তিক এবং তা অনুসরণ করলে আমাদের অর্থনীতির জন্য বরং ভালো হবে। যে প্রস্তাবটি জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে সেটি হলো কাস্টমস ও আয়কর আইন সংসদে পাস করা। এছাড়া ২০১২ সালের ভ্যাট আইন কার্যকরে অটোমেশন, ই-পেমেন্ট, ইলেকট্রনিক ডিভাইস চালু করা। এছাড়া করের আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর পরিধি বিস্তৃত করা দরকার। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে টিআইএনধারীর মধ্যে রিটার্ন জমা দেয়ার হার সবচেয়ে কম বাংলাদেশে। ৭৪ লাখের বিপরীতে মাত্র ২৩ লাখ অর্থাৎ ৩১ শতাংশ অথচ শ্রীলংকা, নেপাল, ভারত, ভুটান, পাকিস্তানে এ হার যথাক্রমে ৮৮, ৭২, ৭১, ৪৪ ও ৩৩ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে তা হলো ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ যৌক্তিক সীমার মধ্যে নিয়ে আসা। আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত না হলে একধরনের অনাস্থা তৈরি হয়, যা সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়। অর্থ পাচারকারীদের মধ্যে একধরনের বার্তা দেয়া দরকার, যাতে এ ধরনের কাজ করে কেউ রেহাই না পায়। সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সরকার বরাবরই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আর্থিক খাত ও শেয়ারবাজারে অধিকতর সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেলে আমাদের অর্থনীতি নিঃসন্দেহে অদম্য হয়ে উঠবে। জাতীয় পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমে আমরা যে উচ্চ উন্নয়ন প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছি তার জন্যই অর্থনৈতিক সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, অবকাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক সুশাসনের দিকেও আরো বেশি নজর দিতে হবে। বিশেষ করে জনগণের সরাসরি সেবাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির সুযোগ কমাতে হবে। সরকারের আন্তরিকতার ফলে ধীরে ধীরে বিনিয়োগ ও বিনিয়োগসেবার পরিবেশ উন্নত হচ্ছে। সে ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

চতুর্থত, সামাজিক সুরক্ষা বেটনী সম্প্রসারণের পাশাপাশি টিসিবির কার্যক্রম সারা দেশে আরো বড় পরিসরে জোরদার করতে হবে। সে কারণেই নিজস্ব রাজস্ব বাড়ানোর বিকল্প নেই। চলতি বছর বর্তমান সরকারের জন্য সবদিক বিবেচনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ বছর। একদিকে করোনো মহামারী ও আপাত বৈশ্বিক মন্দা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বছর। সরকারের বড় উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়িত রূপের প্রভাব এ বছর থেকে অধিক দৃশ্যমান হবে। কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে আমরা এ বছর আরো এগিয়ে যাব। রফতানি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যায়ণ অব্যাহত থাকবে। অবকাঠামোগত সুবিধাগুলো এবং ক্রমবিকাশমান ডিজিটাল আর্কিটেকচার আমাদের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জকে নতুন বছরে মোকাবেলার সুযোগ সৃষ্টি করবে। মন্দার সব পূর্বাভাস সত্ত্বেও নতুন বছরে আমাদের আশঙ্কাগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই।

ব্যবসার আড়ালে অর্থ পাচার প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ডিপার্টমেন্ট নামে একটি হিন্দি সিনেমা আছে। ২০১২ সালে এটি মুক্তি পায়। বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এতে একজন আন্ডারওয়ার্ল্ড গ্যাংস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তার একটি সংলাপ জনপ্রিয়তা পায়। তদন্তরত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে তিনি বলেন, ‘**ম্যায় লিগ্যালি ইললিগ্যাল নেহি, ইললিগ্যালি লিগ্যাল কাম কর রাহা হু।**’ সিনেমায় অমিতাভ বচ্চনের চরিত্রটি ‘ইললিগ্যালি লিগ্যাল’ কাজ করত। তবে বর্তমানে অপরাধীরা অপরাধ সংঘটনের জন্য ‘লিগ্যালি ইললিগ্যাল’ পদ্ধতি অনুসরণ করছে। অর্থাৎ বৈধ উপায়ে অবৈধ কাজ সম্পাদন করছে। অপরাধীরা কখনো নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতিতে আটকে থাকে না। প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ইত্যাদির চোখে খুলা দিতে তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করে। সময়ের সঙ্গে তারা নিজেদের অধিকতর চৌকস করে। সে তুলনায় যদি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো পিছিয়ে থাকে তাহলেই ঘটে বিপত্তি। সারা বিশ্বে বর্তমানে অন্যতম একটি অপরাধ হলো বিদেশে টাকা পাচার। এ কাজ সম্পাদনে জড়িত চক্র হাল আমলে অভিনব একটি পদ্ধতি অনুসরণ করছে। তারা বিদ্যমান আইনের ফাঁকফোকরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যাংকিং এবং নন-ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে এমনভাবে বিদেশে টাকা পাচার করছে, সাদা চোখে সেটিকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করার সুযোগ থাকে না। তারা অবৈধ কাজ করছে, কিন্তু তার ওপর খুব সুন্দরভাবে দিয়ে দিচ্ছে বৈধতার প্রলেপ। বাংলাদেশসহ বিশ্বে বৈধ উপায়ে টাকা পাচারের সর্বাধিক অনুসৃত মাধ্যমটি হলো ‘ট্রেড বেসড মানি লন্ডারিং (টিবিএমএল)’। ব্যবসার নামে টাকা পাচার। টাকা পাচার প্রতিরোধকারী প্যারিসভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফএটিএফ) কর্তৃক ২০০৬ সালে পরিচালিত এক গবেষণা অনুসারে, ব্যবসার ছদ্মবেশে বিদেশে টাকা পাচার এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ অপরাধীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম এটি।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একজন ব্যবসায়ী পণ্য আমদানির উদ্দেশ্যে কোনো একটি ব্যাংকে এলসি (লেটার অব ক্রেডিট বা ঋণপত্র) খুললেন। আমদানীকৃত পণ্যের পুরো টাকাও পরিশোধ করলেন। কাগজে-কলমে পণ্য আমদানি হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোনো পণ্য দেশে প্রবেশ করেনি। ম্যাজিক মনে হচ্ছে? প্রশ্ন জাগছে না, তাহলে তিনি কেন ব্যাংকে টাকা জমা দিলেন? সে টাকা তবে কোথায় গেল! উত্তর সহজ। সম্পূর্ণ টাকা রফতানিকারী দেশে পাচার হয়ে গেছে।

এলসি বা ঋণপত্রের বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করা যাক। বাংলাদেশে সংগঠিত ট্রেড বেসড মানি লন্ডারিং ঠেকানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৯ সালে একটি গাইডলাইন তৈরি করে। সেখানে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাণিজ্য প্রক্রিয়া চার্ট ঠেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চার্ট অনুসারে, প্রথমে আমদানিকারক ও রফতানিকারকের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। আমদানিকারক তখন একটি ব্যাংকে এলসি খোলার জন্য আবেদন করে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকটি একটি এলসি খোলে। তারপর সেটি রফতানিকারক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংককে অবগত করা হয়। সে ব্যাংক তখন এলসি যাচাই করে এবং তা রফতানিকারকের কাছে পাঠায়। রফতানিকারক তখন ফরোয়ার্ডিং এজেন্টকে পণ্য সরবরাহ করে। এজেন্ট সে পণ্য শিপমেন্টের ব্যবস্থা করে বন্দরে পৌঁছে দেয়। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সে পণ্যের ছাড়পত্র দেয়। অতঃপর ক্লিয়ারিং এজেন্টের মাধ্যমে পণ্য আমদানিকারকের কাছে পৌঁছে যায়। এদিকে রফতানিকারক তার মনোনীত ব্যাংকটিকে ডকুমেন্ট জমা দেয়। মনোনীত ব্যাংক সে ডকুমেন্ট ইস্যুকারী ব্যাংকের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং টাকা পরিশোধ করতে বলে। ইস্যুকারী ব্যাংক টাকা পরিশোধ করে। অতঃপর আমদানিকারক ইস্যুকারী ব্যাংকে টাকা জমা

দেয়। ব্যাংক তাকে ডকুমেন্টগুলো সরবরাহ করে। এভাবে সম্পন্ন হয় সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। দেখা যাচ্ছে, এ প্রক্রিয়ায় অনেক পক্ষ জড়িত। সব পক্ষের যোগসাজশে কিংবা কয়েকটি পক্ষের যোগসাজশে এবং বাকি পক্ষের অসচেতনতার কারণে ব্যবসার নামে এভাবে টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। অথচ বিনিময়ে দেশে প্রবেশ করছে না কোনো পণ্য।

ব্যবসার নামে টাকা পাচারের ক্ষেত্রে ভুয়া এলসির পরবর্তী স্থান দখল করে আছে ‘ওভার ইনভয়েসিং’। একজন আমদানিকারক যখন পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য ঘোষণা করে পণ্য আমদানি করেন, তখন তাকে ওভার ইনভয়েসিং বলা হয়। পণ্যের প্রকৃত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ পাচার হয়ে যায় বিদেশে। গত ২ ডিসেম্বরের ডয়চে ভেলে বাংলার একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) বরাত দিয়ে সংস্থাটি জানায়, ওভার ইনভয়েসিংয়ের ক্ষেত্রে গত অর্থবছরে (২০২১-২২) শতকরা ২০ থেকে ২০০ ভাগ অতিরিক্ত আমদানি মূল্য দেখিয়ে অর্থ পাচারের ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের সন্দেহজনক লেনদেনের সংখ্যা গত অর্থবছরে ছিল ৮ হাজার ৫৭১টি। এ সংখ্যা তার আগের অর্থবছরের (২০২০-২১) চেয়ে ৬২ দশমিক ৩৩ শতাংশ বেশি। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩ হাজার ৬৭৫ ও ৩ হাজার ৫৭৩। এতে স্পষ্ট, ব্যাংকিং চ্যানেলে অব্যাহতভাবে অর্থ পাচার বাড়ছে। গত অর্থবছরে তা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

এছাড়া ব্যবসার আড়ালে টাকা পাচারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপায় হলো শর্ট শিপিং, অর্থাৎ যত পরিমাণ পণ্য আমদানি করার ঘোষণা করা হয়েছে, সে তুলনায় জাহাজে পণ্য কম থাকা। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট পণ্যের দাম বিদেশে পাচার হয়ে যায়। ফ্যান্টম শিপিং—এক্ষেত্রে আমদানি ঘোষণার বিপরীতে পণ্য আদৌ আমদানি হয় না। সম্পূর্ণ টাকাই পাচার হয়ে যায়। অনেক সময় একই আমদানীকৃত পণ্যের একাধিক চালান দেখিয়ে বারবার বিদেশে টাকা পাচার করা হয়। এ প্রক্রিয়া মাল্টি ইনভয়েসিং নামে পরিচিত।

টিবিএমএলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক ঝুঁকিতে আছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৯-১৮ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে মোট ৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার পাচার হয়, বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় সোয়া ৪ লাখ কোটি টাকা।

সমস্যা আছে। তার সমাধানও আছে। এরই মধ্যে টিবিএমএল প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। তার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত নীতিতে। ৩০ কোটির বেশি মূল্যমানের প্রতিটি এলসি তারা সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করছে। ওভার ইনভয়েসিং প্রতিরোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের প্রকৃত দাম যাচাই করছে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে চাহিবামাত্র যথাযথ তথ্য সরবরাহের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিদেশে টাকা পাচার প্রতিরোধ অনেক আগে থেকেই বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বের জায়গায় আছে। এ লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে ‘মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট, ২০১২’ এবং ‘মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন রুলস, ২০১৯’। নিঃসন্দেহে তা সরকারের সং দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। এর সঙ্গে আছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭, কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯, দি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট, ১৯৫০, ইমপোর্টারস, এক্সপোর্টারস অ্যান্ড ইনডেন্টরস (রেজিস্ট্রেশন) অর্ডার, ১৯৮১ ইত্যাদি। এ তালিকা থেকে অনুধাবন করা যায়, টিবিএমএল প্রতিরোধে পর্যাপ্ত আইন বাংলাদেশে আছে। তবে এসব আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আইনগুলোয় কোনো রকম ছিদ্র আছে কিনা তা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বারবার যাচাই করে দেখতে হবে। ব্যাংক কর্মকর্তা এবং কাস্টমস কর্মকর্তাদের এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স মানসিকতা প্রদর্শন করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা অপরাধীদের পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্ব, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং আইনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে হালনাগাদ রাখতে হবে। ব্যাংক কর্মকর্তা, কাস্টমস কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হলো তথ্যের অপ্রাপ্যতা। অনেক সময় দেখা যায়, টিবিএমএলের বিরুদ্ধে মামলা হয়, কিন্তু সে মামলা পরিচালনায় পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করা হয় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির ক্ষেত্রে তথ্যের এ অপ্রাপ্যতা নিঃসন্দেহে বড় প্রতিবন্ধকতা।

এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে দেশের সব মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষই সং জীবন যাপন করছে। সবার সমন্বিত চেষ্টায় দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হোক ২০২৩-এর মূল প্রতিপাদ্য।

দেশের খাদ্যনিরাপত্তা পরিস্থিতি ও বৈশ্বিক সতর্কবার্তা

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) ২০২২ সালের প্রথম দিক থেকেই সতর্ক করে বলছে, ২০২৩ সালে বিশ্বের ৪৫টি দেশে তীব্র খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যা বিশ্বের অন্তত ২৭৬ মিলিয়ন মানুষকে মারাত্মক খাদ্য সংকটে ফেলবে। জাতিসংঘের মহাসচিব এন্টনিও গুতেরেসসহ কৃষিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বারবার বৈশ্বিক ক্ষুধা পরিস্থিতির অবনতির হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সর্বসাম্প্রতিক এক জরিপে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৬৮ শতাংশ মানুষ এখন যথাযথ পরিমাণ খাদ্য খেতে পারছে না। ৮৮ শতাংশ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় গত ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় আঘাত হয়েছিল খাদ্যমূল্যের ক্রম-উর্ধ্বগতি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও দেশের মানুষকে ২০২৩ সালে খাদ্যনিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি রয়েছে বলে সতর্ক করেছেন। তিনি কিছুদিন ধরেই তার বিভিন্ন বক্তব্যে ‘দুর্ভিক্ষ’ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। যদিও বৈশ্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ টেনেছেন। তথাপি বাংলাদেশ যাতে এ ধরনের পরিস্থিতিতে না পড়ে সেজন্য তিনি সবাইকে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের আশঙ্কা প্রকাশ করায় প্রধানমন্ত্রী সাধুবাদ পেতেই পারেন। কারণ, আমাদের শাসক শ্রেণী ও সুবিধাবাদী মহলের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, সুদিন-দুর্দিন যা-ই হোক অর্থনীতির শক্তির পাশাপাশি খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ স্ফীত ও ভোগের পরিমাণ কম দেখিয়ে মহাডম্বরে খাদ্যে স্বনির্ভরতা ও আর্থিক নিরাপত্তার কথা ক্রমাগত সাড়ম্বরে জানান দিয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী সংকটের এ সময়ে প্রধানমন্ত্রী সে পথে যাননি। তবে এখানে লক্ষণীয়, যেকোনো দেশের সরকারপ্রধান তার দেশের অর্থনীতি নিয়ে কোনো কথা বললে জাতীয় অর্থনীতিতে নিশ্চিতভাবেই তার কোনো না কোনো প্রভাব পড়ে। দুর্ভিক্ষের সতর্কতার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জনগণকে অর্থ সঞ্চয়েরও তাগিদ দিয়েছেন। অর্থনীতি শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত সঞ্চয়প্রবণতা অর্থনীতিতে মন্দার ঝুঁকি বাড়ায়, অর্থনীতির গতিশীলতা বাধাগ্রস্ত করে। এ সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী এসব শব্দ ব্যবহার করছেন, যা নিশ্চয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা আমাদের জন্য জরুরি।

প্রবাদ আছে—টাকার পাখা আছে, টাকায় টাকা আনে। এর অর্থ হচ্ছে, টাকাকে যদি সঞ্চয় বা আবদ্ধ না করে উৎপাদনশীল কাজে লাগানো যায়, তাহলে তা বিভিন্ন হাত ঘুরে বাড়তি মূল্য নিয়ে আবার ফিরে আসে। অন্যদিকে যেকোনো দেশে তীব্র খাদ্য ঘাটতি বা দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ এলে তা মূলত দেশটির নাগরিকদের প্রধান খাদ্যের উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ ও জোগানের অস্বাভাবিক অবনতিতে ইঞ্জিত করে। সর্বব্যাপ্ত সংকটের এ মুহূর্তে জনগণের সঞ্চয়ের বিষয়ে কিছু বলা অবান্তর। কারণ কভিড-১৯ অভিঘাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতেই সঞ্চয় করার মতো অর্থ নেই, নুন আনতেই তাদের পাত্তা ফুরায় অবস্থা, বরং খাদ্য পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত, যা ধান-চাল দিয়ে তৈরি। আর দ্বিতীয় পছন্দ গমের তৈরি রুটি ও অন্যান্য খাবার। এ দুটি খাদ্যের দেশী-বিদেশী উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির মর্মার্থ বোঝা সহজ হবে।

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্ববাজার ব্যবস্থায় বৈশ্বিক পরিস্থিতি এড়িয়ে গিয়ে কোনো দেশের পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব নয়। বিশ্বের ৭৯৬ কোটি জনসংখ্যার অর্ধেকেরই প্রধান খাদ্য ধান-চালে তৈরি খাবার, যা তাদের দৈনিক ক্যালরি ভোগের ৫০ শতাংশ পূরণ করে। ২০২১ সালে বিশ্বে ৫০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি চাল উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে চীনের ১৪৮ দশমিক ৩ এবং ভারতে ১২২ দশমিক ২৭ টন। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া ৩৫ দশমিক ৩ টন ও বাংলাদেশ ৩৪ দশমিক ৬ টন। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য গম উৎপাদনে শীর্ষ তিনে রয়েছে যথাক্রমে চীন, ভারত ও রাশিয়া, যারা বৈশ্বিক মোট উৎপাদনের প্রায় ৪১ শতাংশের ভাগীদার। চীন বিশ্বের বৃহত্তম গম, চাল ও আলু উৎপাদনকারী এবং ভুট্টা ও ইক্ষু উৎপাদনে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। গত ২০ বছরে চীন গড়ে ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন টন করে গম উৎপাদন করেছে, যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ১৭ শতাংশ। উৎপাদনের হার এমন হলেও চাল-গম রফতানির চিত্র বেশ ভিন্ন। ২০২১ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০ চাল রফতানিকারক দেশ যথাক্রমে ভারত, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, বার্মা, কম্বোডিয়া, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে চীন, ভারত, ব্রাজিলসহ আরো কয়েকটি দেশ অন্যতম চাল-গম রফতানিকারী হলেও গম উৎপাদনে চতুর্থ ও চাল উৎপাদনে মাত্র ২ শতাংশের অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে কৃষিপণ্যের শীর্ষতম আয় উপার্জনকারী এবং বিশ্ব অর্থনীতির কজাকারক হিসেবে চাল-গমসহ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের আর্থিক কারসাজি ও নীতির মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও খাদ্যপণ্য উচ্চমূল্যে বাজারজাত হয় ধনী দেশ কানাডা, মেক্সিকো, ইউরোপ, জাপান, জার্মানিসহ ইউরোপের দেশগুলোয়। আর বাংলাদেশের চাল-গমসহ অন্যান্য প্রধান খাদ্যক্রয়ের উৎস ভারত, চীন, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা। এসব দেশের কৃষিপণ্য আমদানিতে সমস্যা হলে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া অথবা অন্য কোনো দেশ। বাংলাদেশের বর্তমান চাল-গম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের সকাল-দুপুর-রাত তিন বেলায় প্রধান খাদ্য ভাত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে ১৭ কোটি মানুষের মাথাপিছু ১৫২ কেজি চালের প্রয়োজনীয়তা ধরে নিয়ে আমাদের বার্ষিক চালের চাহিদা ২ কোটি ৫৮ লাখ টন। এর সঙ্গে বীজ ও অপচয় এবং পশুখাদ্য বাবদ ১৫ শতাংশ যোগ করে মোট চালের প্রয়োজন ২ কোটি ৯৬ লাখ টন বা প্রায় ৩ কোটি টন। দৈনিক চালের চাহিদা আরো বেশি বিবেচনায় নিয়ে মাথাপিছু দৈনিক আধা কেজি

বা বার্ষিক জনপ্রতি ১৮২ দশমিক ৫০ কেজি হিসেবে চালের চাহিদা দাঁড়ায় ৩ কোটি ১০ লাখ ২৫ হাজার টন। বীজ, অপচয় ও পশুখাদ্য হিসেবে আরো ১৫ শতাংশ যোগ করা হলে মোট চাহিদা দাঁড়ায় ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৭৮ হাজার টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ৪ কোটি ৩০ লাখ টন, যার মধ্যে চাল ৩ কোটি ৬৬ লাখ টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লাখ টন, যার মধ্যে চাল ৩ কোটি ৮৬ লাখ টন। চাল উৎপাদন ও চাহিদার এ পরিসংখ্যান ফলাও করে তুলে ধরে সুবিধাবাদী মহলের তরফ থেকে প্রায়ই বলা হয়, বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। কিন্তু সত্যি হচ্ছে, প্রতি বছরই আমরা বিপুল পরিমাণ চাল আমদানি করি। ২০২০-২১ অর্থবছরে চাল আমদানি হয়েছে ১৩ দশমিক ৫৯ লাখ টন। ২০২২ সালে এরই মধ্যে চাল আমদানি হয়েছে ৮ লাখ ৭৭ হাজার টন। অন্যদিকে ভাত ছাড়া সারা দিন আমরা যা-যা খাই, তাতে গমের তৈরি খাবারই বেশি। দুই দশক আগেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনেই পূরণযোগ্য যে গম গরিবের খাবার ছিল, চালের মূল্যের সমান হওয়াসহ নানা কারণে সব শ্রেণীর কাছেই এখন তা অনেকটা আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। দেশে গমের চাহিদা এখন কমবেশি ৭০ লাখ টন, কিন্তু আমাদের গমের উৎপাদন ১০-১২ লাখেই সীমাবদ্ধ। ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০ লাখ ৯৯ হাজার, ১১ লাখ ৪৮ হাজার ও ১২ লাখ ৪৬ হাজার টন করে গম উৎপাদিত হয়েছে। আর ২০২০-২১ অর্থবছরে গম আমদানি হয়েছে ৫৩ দশমিক ৪১ লাখ টন। বিশ্ববাজারে গমের সংকটে ২০২২ সালে আমদানি তুলনামূলক অনেক কমে এখন পর্যন্ত ২০ দশমিক ২৩ লাখ টন হয়েছে। সরকারি তথ্যানুযায়ী, চাহিদা পূরণে চলতি অর্থবছরে অন্তত ১ কোটি টন চাল-গম-ডাল আমদানি করতে হবে। কিন্তু এসবের আমদানি পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয়, অনিশ্চিত; গত সাত বছরের মধ্যে একই সময়ের হিসাবে চলতি অর্থবছরে (২০২২-২৩ জুন-অক্টোবর) সবচেয়ে কম খাদ্য আমদানি হয়েছে। ডলারের বিপরীতে টাকার দাম কমে যাওয়ায় ঋণপত্র খুলতে সমস্যা ও বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক সংকটে চাল-গম আমদানির উৎস কমে যাওয়াই মূলত এর কারণ। এর মধ্যে আবার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে চালের উৎপাদন কমারও আভাস দিয়েছে। অক্টোবরে প্রকাশিত সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, এবার ৩ কোটি ৫৬ লাখ টন চাল উৎপাদন হতে পারে, যা গত অর্থবছরের চেয়ে দুই লাখ টন কম। বাজার স্বাভাবিক রাখতে সরকার নিজে আমদানি করছে, পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও কম শুল্কে আমদানির বরাদ্দ দিচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে এ পর্যন্ত সরকারিভাবে ১৪ লাখ ৩০ হাজার টন চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে। গমের চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করে পূরণ করতে হয়, যার প্রধান উৎস রাশিয়া-ইউক্রেন। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ চলতি অর্থবছরে দেশে ৭০ লাখ টন গম আমদানিরও আভাস দিয়েছে। গত কয়েক বছরে দেশে গড়ে বার্ষিক ৬৪ লাখ টন গম আমদানি হচ্ছে। এনবিআরের হিসাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে গম আমদানি হয়েছে ৯ লাখ ৮৪ হাজার টন। গত অর্থবছরে একই সময়ে আমদানি হয়েছিল ১৫ লাখ ৩০ হাজার টন। এ হিসাবে আমদানি ৩৬ শতাংশ কমেছে। উপরন্তু রাশিয়া দিনকয়েক আগে ইউক্রেনের সঙ্গে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় করা গম রফতানিসংক্রান্ত চুক্তি বাতিল করে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের পথে থাকা কয়েক লাখ টন গম কৃষ্ণ সাগরে আটকা পড়েছে। এসব কারণে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক খাদ্য সংকট নিয়ে সবার উদ্বেগ আরো জোরালো হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিষয়ক সংস্থা ইউএসডিএ ‘বাংলাদেশে সার সরবরাহ ও ব্যবহারে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব’ শীর্ষক অক্টোবর-২০২২ প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশের এমওপি সারের ২০ শতাংশ সরবরাহ কমানো হলে বোরো মৌসুমে ধান, গম ও রবি মৌসুমের অন্যান্য ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ কমবে, যা দেশের খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপত্তাকে হুমকিতে ফেলবে। ২০২২ সালের মার্চ থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ সারের বাজার ও প্রধান খাদ্যপণ্যের দাম রেকর্ড হারে বাড়ছে। স্বাভাবিক সময়ে দেশের নাইট্রোজেন সারের চাহিদার ৩১ শতাংশ, ফসফেটের ৫৭ এবং পটাশ (এমওপি) সারের ৯৫ শতাংশ পূরণ হয় বিশ্বের প্রধান সার রফতানিকারক রাশিয়া ও বেলারুশের মাধ্যমে। যুদ্ধের প্রভাবে ওই সারও যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু কিনতে হচ্ছে অন্য উৎস থেকে, যার মূল্যও অনেক বেড়েছে। যেহেতু দেশের মূল শস্য বোরো ধান সেচ ও রাসায়নিক সারনির্ভর, সেহেতু কৃষি উপকরণ অর্থাৎ ডিজেল-পেট্রলচালিত সেচযন্ত্র এবং রাসায়নিক সারের মূল্য ও সরবরাহ ব্যবস্থাও এখানে বড় একটি নিয়ামক। বাংলাদেশ পেট্রল-ডিজেল শতভাগ ও রাসায়নিক সারের ৮০ শতাংশই আমদানি করে। দেশে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে ৬৯ লাখ টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারই ৫৭ লাখ টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান চার ধরনের সারের চাহিদা কমিয়ে ৫৫ লাখ ৫০ হাজার টন নির্ধারণ করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, দেশে রাসায়নিক সারেও সংকট চলছে, চলবে।

যদিও বিগত ১০ বছরে খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে, উৎপাদন বেড়েছে ৩০ শতাংশেরও বেশি। কিন্তু জনসংখ্যা তো প্রতি বছর বাড়ছে ২০ লাখ করে, আবাদি জমিও কমছে আট লাখ হেক্টর করে। উচ্চমাত্রার দারিদ্র্য, ব্যাপক হারে বৈষম্য বৃদ্ধি ও অনমনীয় খাদ্যনিরাপত্তাহীনতাও এখন বড় দুর্ভাবনার বিষয়। সাধারণত খাদ্যনিরাপত্তা নিরীক্ষণে সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটি হচ্ছে, কী সংখ্যক জনগণ ক্ষুধার্ত আছে তাদের সংখ্যা নিরূপণ। এক্ষেত্রে দুটি প্রধান নিয়ামক হচ্ছে—

- ১. অপুষ্টিতে আক্রান্ত জনগণের সংখ্যা নিরূপণ,
- ২. বয়সের তুলনায় ওজনহীন শিশুদের ব্যাপকতা গণনা।

এ পরিমাপকগুলো বাংলাদেশের যে চিত্র তুলে ধরে, তা যথেষ্ট হতাশা ও উদ্বেগজনক। খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে নাগরিকদের অনেক বিষয় জড়িত, যেমন অত্যধিক দুর্বলতা ও অপুষ্টি, অসুখের প্রকোপ বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অক্ষমতা, অবশেষে অকালমৃত্যু। দেশে পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। দরিদ্র পরিবারগুলো যদিও কিছু পরিমাণ খাদ্যগ্রহণে সফল হয়, তবে তা তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পূরণে ব্যর্থ। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফুড প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিটের (এফপিএমইউ) একটি যৌথ গবেষণা মতে, বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর ৩৬ শতাংশ এখনো খর্বকায় এবং শীর্ণকায় ১৪ শতাংশ। অপুষ্টির কারণে কম ওজন নিয়ে প্রতি বছর দেশে জন্মগ্রহণ করছে ৩৩ শতাংশ শিশু। পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪১ শতাংশ শিশু এখনো পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এছাড়া বিভিন্ন বয়সী ৭৩ শতাংশ নারীর রয়েছে জিংক ও ভিটামিন 'এ' স্বল্পতা। দেশে পাঁচ বছর বয়সী প্রতি তিনটি শিশুর একটি খর্বাকৃতির। অপুষ্টিতে আক্রান্ত মানুষেরা যেহেতু কম উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন, তাই তারা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের এমন একটি অভ্যেদ্য ও বিপজ্জনক চক্রের সৃষ্টি করে, যা জাতির জন্য একসময় ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। জীবনের প্রারম্ভে কোনো শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত হলে বাকি জীবনে তার কাছ থেকে উৎপাদনশীলতা আশা করা অন্যায্য। সরকারি-বেসরকারি গবেষণায় স্পষ্টই বোঝা যায়, সার্বিকভাবে অপুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি থেকে এখনো বের হতে পারেনি বাংলাদেশ। অথচ বিবিএসসহ তথ্য-উপাত্ত প্রণয়নকারী প্রায় সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ভুলভাল আর সুবিধার প্রবৃদ্ধি তুলে ধরে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অভিযাত্রাকে দুর্বল করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের ৫০ বছর পরও বাংলাদেশে আগামী কয়েক প্রজন্মের খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টির আশঙ্কা সত্যিই জাতির জন্য ভীষণ বেদনাদায়ক।

নানা অপ্রাপ্তি, অসংগতি, আশঙ্কা সত্ত্বেও পরিশেষে বলা যায়, প্রথাগতভাবে যাকে আমরা দুর্ভিক্ষ বলে জানি, বাংলাদেশে তা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা সম্প্রদায়ের মাঝে অন্তত ২০ শতাংশ পরিবার সীমিত সামর্থ্যের কারণে চরম খাদ্য সংকটে পড়ে স্বল্প সময়ে অনাহার ও অপুষ্টিতে মৃত্যুমুখে পতিত হলে সেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে বলে ধরে নেয়া হয়। যেমন ১০ লাখ মানুষের দক্ষিণ সুদানকে জাতিসংঘ সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষবলিত বলে ঘোষণা করেছে সেখানকার গৃহযুদ্ধ, দীর্ঘকালীন তীব্র খরা ও উচ্চমূল্যের কারণে মানুষের খাদ্য সংকটে মৃত্যুর হার দেখে। তার পরও দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য ও নানা পরিসংখ্যানে যেহেতু দুর্ভিক্ষ না হলেও বড় ধরনের খাদ্য সংকটের আভাস স্পষ্ট, তাই আমাদের সতর্ক হওয়া জরুরি। সতর্ক ও সচেতন হতে হবে এ কারণে যে দেশে ১ হাজার ৬০০ পরিবারের ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ৮০ দশমিক ৬০ শতাংশ মানুষ খাদ্যের ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে, ৬৪ দশমিক ৫০ শতাংশ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয়ও কমিয়েছে, ঋণ নিচ্ছে ৬০ দশমিক ৮০ শতাংশ মানুষ, আর ৪৭ দশমিক ২০ শতাংশ মানুষ প্রোটিন খাওয়া কমিয়ে দিয়ে মাছ-মাংস এড়িয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে, কেউ কেউ তো তিন বেলার বদলে এক বেলা কি দুই বেলা করে খাচ্ছে, ১০ শতাংশ মানুষ শিশুখাদ্য কেনাও বন্ধ করেছে। সর্বোপরি দেশে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন (বীজ, প্রাণী ও মৎস্যখাদ্য, শিল্প, অপচয় প্রভৃতি) বিবেচনায় ২০৩০ সালে চালের মোট চাহিদা হবে ৩৯ দশমিক ১ মিলিয়ন টন এবং ২০৫০ সালে ৪২ দশমিক ৬ মিলিয়ন টন। আর বর্তমান উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ ও '৫০ সাল নাগাদ চালের মোট জোগান হবে যথাক্রমে ৪৩ দশমিক ২ এবং ৫৪ দশমিক ৯ মিলিয়ন টন। নীতিনির্ধারকরা নাগরিকদের ওপর গলার ফাঁসের মতো চেপে বসা উচ্চমূল্যস্বীতি ও নানা ধরনের ঘাটতি নিয়ে ভবিষ্যতের ওই চাহিদা ও উৎপাদন কীভাবে নিশ্চিত করেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে খাদ্যের অধিকার যেহেতু একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত, তাই রাষ্ট্রকে অবশ্যই এ খাতে আর্থিক, বস্তুগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

মূল্যস্বীতি নিয়ন্ত্রণ ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন

অর্থনীতিবিদরা বিশ্বব্যাপী ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক পরিস্থিতি খুব যত্নের সঙ্গে দেখার পাশাপাশি বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রদান করছেন। বাংলাদেশের বেলায়ও এমন দৃশ্য তৈরি হয়েছে। সুশীল সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও অর্থনীতিবিদরা দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছেন ও আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে পারে এবং সরকারের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ কীভাবে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম অভিন্ন সহযোগিতা করতে পারে তার সন্ধান পেতে সহায়ক পরামর্শ দিচ্ছেন।

কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন যে অর্থায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যা খুব সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা দরকার। বিশেষ করে এটি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঋণ নেয়ার সঙ্গে জড়িত থাকে। বিশ্লেষক আনিস চৌধুরী এবং জে. কে. সুন্দারাম এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে কিছু দেশ এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাজস্ব ব্যয়ের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নও করেছে।

দৃশ্যত এমন আইনগুলোর ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদরা মূল্যস্ফীতির লাগাম ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা প্রয়োজন বলে মনে করছেন, তবে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য এটি ২ শতাংশের কম না হওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। এসব ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্ভাব্য উন্নয়নমূলক ভূমিকা এবং সংকটকালীন অবস্থায় সরকারের সক্ষমতাকেও সীমাবদ্ধ করেছে। কাঙ্ক্ষিত কাঠামোগত রূপান্তরের জন্য উন্নত আর্থিক-রাজস্ব নীতি সমন্বয়ও প্রয়োজন, বিশেষ করে ডিকার্বনাইজিং অর্থনীতিতে।

যা হোক, এ ধরনের পরিস্থিতিতে দেশগুলোকে সীমাবদ্ধ আইনের সঙ্গে তাদের নিজ হাত বেঁধে রাখা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে মহামারীতে ত্রাণকার্যে অর্থায়ন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের জন্য অন্য হাতগুলো প্রায়োগিকভাবে স্থগিত অথবা স্ব-আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

এ রকম পদক্ষেপ জরুরি প্রয়োজনে চক্রাকারে আবর্তনশীলতা ও উন্নয়নভিত্তিক রাজস্ব অর্থায়ন নীতির সমন্বয়ে বিভিন্ন মতের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া প্রত্যাশা করে। সামাজিক কুশলীরা এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত অনুসরণ করেন। কারণ কিছু আর্থিক সংস্থা দাবি করে এ প্রক্রিয়া সরকারি বাজেট ঘাটতিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহায়তা করে। উদাহরণ হিসেবে অর্থায়নের কথা বলা যায়। অন্যদিকে অন্য কুশলীরা পরামর্শ দেন যে অর্থায়ন সবসময় সরকারি ঋণ, ব্যালাপ্স অব পেমেন্টে ঘাটতি এবং মূল্যস্ফীতি থেকে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কাজ করে না। এ প্রসঙ্গে কিছু অর্থনীতিবিদ ডব্লিউ ইন্টারলির দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করিয়ে দেন, তিনি মন্তব্য করেছিলেন রাজস্ব ঘাটতি বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক রুগ্নতার জন্য দায়ী, যা আশির দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় হয়েছিল। যেমন অত্যধিক ঋণ এবং ঋণ সংকট, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, দুর্বল বিনিয়োগ পরিবেশ এবং প্রবৃদ্ধি। ধারাবাহিকভাবে এটি অর্থায়নকে সন্দেহের সঙ্গে সাক্ষাতের আহ্বান জানিয়েছিল, যদি সরাসরি বিরোধিতা না থাকে। আনিস চৌধুরী এবং জে. কে. সুন্দরম এ দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশ করেছেন যে অর্থায়ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতাকে অবমূল্যায়ন করতে পারে। এবং রাজস্ব কর্তৃপক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত আর্থিক পৃথককরণকে প্রভাবিত করে। এটি মূল্যস্ফীতির ধাবমানতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চেষ্টাকেও লাইনচ্যুত করতে পারে।

এক্ষেত্রে মৌল বিষয় এবং দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে অনেক অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংক খাতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য পরিমাপের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সাবেক গভর্নর রেড্ডি উল্লেখ করেছেন যে রাজস্ব অর্থায়ন শিল্প, কৃষি, গৃহায়ন ইত্যাদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তহবিল সরবরাহ করা, এছাড়া বিগত দশকগুলোয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণগুলোও রয়েছে। এক্ষেত্রে এ. চৌধুরী এবং জে. কে. সুন্দরম রেড্ডি মন্তব্য করেছেন যে স্বল্প সন্তোষজনক ফল যেমন ‘সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা’ এবং ‘স্বয়ংক্রিয় নগদীকরণে ঘাটতি’ এ বিষয়গুলো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে ‘রাজস্ব সক্রিয়তা কিন্তু নমনীয় বাজেটে বাধা’ এবং সরকারি বিনিয়োগে ‘বিদ্যমান অপরিাপ্ত প্রত্যাবর্তন’ এসবের কারণে হয়নি।

এটি শুধু প্রাসঙ্গিক এবং স্মরণীয় যে আর্থিক নীতি একই সময়ে বৃহৎ আকারে ও বিদ্যমান রাজস্ব ঘাটতিতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। দেশ থেকে দেশে এটি ভিন্ন হতে পারে। যাই হোক রেড্ডির জন্য ‘দ্বিধাহীনভাবে রাজস্ব এবং আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়া দেশগুলোর বিশেষায়িত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে।’ ধারাবাহিকভাবে রেড্ডি আর্থিক-রাজস্ব নীতি সমন্বয়ে বৃহৎ আকারে অভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিষয়ে তুলে ধরেছেন।

এক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে কিছু পাঠ নেয়া যেতে পারে। সেখানে রাজস্ব ঘাটতির সঠিক মাত্রা চিহ্নিত না থাকায় ভারতে এসব সংকটপূর্ণ ক্ষেত্রে গুরুত্বের মাপকাঠিতে ধরে নেয়া হয় কীভাবে এটার অর্থায়ন হয়েছে এবং কোথায় প্রয়োজ্য হচ্ছে? এমন দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানকে যে সক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যক্ষমতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। রেড্ডি সঠিকভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, ভারতের মতো দেশে সরকারি ঋণের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় অর্থনৈতিক বাজারের উন্নয়নে, আর্থিক নীতি পরিচালনা, বিশেষ করে কার্যকর প্রেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দারুণ ব্যাপার পিপলস ব্যাংক অব চায়নার সঙ্গে জড়িত জে. জিয়াও চুয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী দায়িত্বের বিষয়ে জোর দিয়েছেন। এর মধ্যে উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর চলমান রূপান্তরে অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার মতে, স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে ‘আর্থিক নীতি নিঃসন্দেহে ব্যালাপ্স অব ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট এবং পুঁজির প্রবাহের মাধ্যমে প্রবাহিত।’ তাই সামষ্টিক বিবেচনাপূর্ণ এবং আর্থিক প্রবিধানগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য স্পর্শকাতর আদেশ হিসেবে গণ্য হয়। ধারাবাহিকভাবে পিপলস ব্যাংক অব চায়নার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে চীন সরকারের সুদীর্ঘ আদেশ রয়েছে। এর মধ্যে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা তত্ত্বাবধান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচার, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, ব্যালাপ্স অব পেমেন্টের সমস্যা চিহ্নিতকরণ রয়েছে।

এসব বহুমুখী লক্ষ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অধিক সমন্বয় এবং যৌথ চেষ্টা প্রয়োজন। জেট এটাও জোর দিয়েছেন যে বহুমুখী লক্ষ্য এবং আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে কার্যকারিতায় সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা যা কৌশলী বিষয় বটে। তিনি এটাও জোর দিয়েছেন যে এমন অস্থির সময়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার সহজীকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শুধু সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখলেই হবে না, এর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ নীতির নমনীয়তার ক্ষেত্রে পরিমাপের বিষয়টিও রয়েছে।

এক্ষেত্রে কিছু আকর্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন যে চীন সরকার এবং তাদের পিপলস ব্যাংক অব চায়না কীভাবে মহামারীর সময়ে কাজ চালিয়ে গেছে এবং কীভাবে আর্থিক নীতি কভিড আক্রান্ত খাতে সহায়তার লক্ষ্যে তাদের চেষ্টা চালিয়েছে। কাঠামোগত অনুষ্ণগুলো আন্তঃব্যাংক তারল্যের পর্যাঙ্গতা এবং আমানত প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক থাকার বিষয়ে সহযোগিতা করেছে। এ কার্যকারিতা চীন সরকারের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্যের সঙ্গে যত্নসহকারে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রত্যাশিত বিনিয়োগে সহায়তা এবং সম্পদের মূল্যে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের বিষয়টা প্রতিরোধ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে জেট-এর মতে সমন্বয় এবং মিথস্ক্রিয়া আর্থিক নীতিকে রাজস্ব এবং শিল্পায়ন নীতিতে কাঙ্ক্ষিত স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি এবং বাজারে আত্মবিশ্বাস প্রচার করায় জড়িত। এর ফল হিসেবে চীনে যৌক্তিকভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এখানে উল্লেখ করতে হবে ইকোনমিস্টের মতো বিদেশী গণমাধ্যম উল্লেখ করেছিল যে চীনে গত ২০ বছরে ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি গড়ে ২ দশমিক ৩ শতাংশ ছিল।

আমরা দেখেছি কীভাবে সাম্প্রতিক দিনগুলোয় মূল্যস্ফীতি কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই মূল্যস্ফীতির আদর্শ মানের বিপরীতে বাড়তি সুদহার নির্ধারণ করেছে। যাই হোক, এক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া হয়েছে যে এ বাড়তি সুদহার সহযোগিতা করতে পারে যদি মূল্যস্ফীতি প্রধানভাবে আমানত চাহিদা সহজতর করায় জ্বালানির ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে আমানত আঁটসাঁট হয়ে যাওয়া কার্যকরভাবে মূল্যস্ফীতির সরবরাহ পার্শ্ব নির্ধারণ করে, যা সাধারণত বাধা উত্তরণে লক্ষ্য পরিমাপের বিষয়টি দাবি করে।

বাড়ন্ত সুদহারের প্রতিকূল উপচে পড়া প্রভাবও বিবেচনাযোগ্য। উন্নত অর্থনীতির মুখ্য দেশগুলোয় সুদহার বৃদ্ধি পাওয়া উদীয়মান বাজারকে দুর্বল করে ফেলে এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোয় পুঁজির প্রবাহ, মুদ্রা, রাজস্ব অবস্থান এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিশেষ করে সার্বভৌমত্ব ঋণ গত দুই বছরে বেলুনের মতো ফুলেফেঁপে উঠেছে।

উঁচু সুদহারের ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য, বিনিয়োগ সংকীর্ণ এবং গৃহস্থালি খরচ বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে। এটি ব্যবসাকে আঘাত করে, এক্ষেত্রে শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগে অভিঘাত করে না এর সঙ্গে উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে এটি বাধাহীনভাবে সর্পিলা প্যাঁচানো বস্তুর মতো নিম্নগামী হয়ে যায়। এটি সরকারের ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করে, সরকারকে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো সরকারি সেবায় খরচ কমাতে বল প্রয়োগ করে। এ অনুসারে এটি বোঝা কঠিন যে কীভাবে উথিত সুদহার বিনিয়োগ, চাকরি, উপার্জন, সামাজিক সুরক্ষা অথবা কার্ব ফুড বা তেলের মূল্য বৃদ্ধি করে। একটি সঠিক চিন্তার বিষয় রয়েছে, ভোক্তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, এমনকি উঁচু সুদহারের ক্ষেত্রে।

উঁচু সুদহার মূল্যস্ফীতিকে তীব্রতর করতে পারে, যেভাবে ব্যবসায় বিনিয়োগের খরচ কর্তন করে। যদিও বিশেষ করে প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ বাধা মূল্য বৃদ্ধি পেলে সম্ভাব্যভাবে ব্যাপক হতে পারে।

আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন একটি উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ জনগণ ঋণগ্রস্ত থাকে। ফলে দরিদ্র জনগণ খরচের ক্ষেত্রে কৃষ্ণসাধন করে। যদিও দরিদ্র জনগণ বিভিন্নভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যেমন চাকরি এবং উপার্জন হারানো, সামাজিক সুরক্ষা কম মোকাবেলা এবং উচ্চতর সুদহার গ্রহণ। তাই আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে উচ্চতর সুদহারের মানসম্মত ওষুধের ব্যাপক সামাজিক মূল্য রয়েছে। এদিকে উচ্চ সুদহারের প্রধান উপকারভোগী, নিট আমানতকারী এবং অর্থনৈতিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীগণ নিম্নতম মূল্যস্ফীতিতে ধনী হচ্ছে।

ধারাবাহিকভাবে কার্যকর রাজস্ব-আর্থিক নীতি সমন্বয়ের যথাযথ ব্যবস্থাপনা দরকার কার্যকর আর্থিক এবং রাজস্ব নীতি সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য। যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মক্ষম ব্যবস্থাপনা দেশের বিশেষায়িত উন্নয়নের মাত্রা এবং অর্থনৈতিক গভীরতা ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।

দ্বিধাহীনভাবে একজনের এটাও স্মরণ করা উচিত এ সামগ্রিক চেষ্টিয় উন্নত শাসন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রয়োজন। এটি অবিলম্বে এবং দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি করতে পারে সরকারের ঋণগ্রহণ এবং ব্যয় বৃদ্ধির কারণে। নাগরিক এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের অধিক কার্যকর, উন্নত শৃঙ্খলাবদ্ধ নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চক্রাকারবিরোধী এবং উন্নয়ন খরচে রাজস্বের জায়গা তৈরি করায় জনসমর্থন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

Laudable universal pension scheme

The passage of the Universal Pension Management Bill, 2023 by the Jatiya Sangsad (JS) on Tuesday last is indeed a remarkable achievement for the country. According to the parliament-approved Bill, all the citizens of the country aged between 18 and 50 years, if they want, will be able to join the pension scheme by regularly contributing a certain amount of subscription to the pension fund. In fact, the Bill, if and when takes effect as a law, will mark the realisation of a long-cherished dream of the country's working people most of whom remain unprotected after their retirement age. Notably, people in government service or those working for organisations with regular wage or salary structure have post-retirement provisions for them. But that is not so with the nation's majority workforce, 85 per cent of whom are engaged in the informal sector.

In the past, the bread earners in society would depend on their younger family members to support them in their old age. But time has changed and the extended family system is breaking up giving way to nuclear families. As a result, even after retirement, with none to look after, many old people have to fend for themselves. Against this background, such a law can be a lifeline not only for the young working population who are going to reach their retirement age within the next two to three decades, but also for those who have already retired from work. The approved Bill provides that people above 50 can also benefit from the pension scheme, if they contribute to the pension fund for at least 10 years. In case of the death of a pensioner, her/his nominee will get certain amounts of benefit. This is definitely a reassuring piece of news for the country's older population and their dependants. However, certain important details about the pension scheme are yet to be worked out. These include, for example, the amount of monthly or quarterly subscription that a prospective pensioner will have to pay to the pension fund or what the government's matching contribution to it is going to be. These points need to be spelt out clearly. Because, these are the issues of highest interest to the would-be clients of the pension scheme.

Apart from the benefits the would-be pensioners are going to derive from the scheme, the government itself will also be a big beneficiary of the scheme, since pension fund will be invested in various profit-making activities including the government's various debt instruments like treasury bills, bonds and in development projects. Such investments promise to be an additional source of the government's income. In that case, the government's dependence on bank borrowing could be reduced considerably. Once operational, the pension scheme can also be of help for the government in other ways. For instance, a portion of the financial support that the government is now providing to the old people and the vulnerable segments of society under the social safety net programmes could be channelled through the pension scheme.

There is no question that the promises the universal pension scheme holds out are immense. Equally, the challenges facing the government particularly regarding its implementation will be humongous. As expected, the universal pension scheme's success will hinge on its efficient and

transparent management by a set of people who have the required know-how to run such programmes. Understandably, the cardinal virtue of those in charge, especially in the envisaged National Pension Authority and other executives down the line should be beyond question.

How not to fall into 'middle-income trap'

Bangladesh's transition from a lower middle-income economy to a developing country is yet to be complete. The target set for achieving that status is by 2026. There was no doubt the country was well on course of that target. Only the combined ill impacts of Covid-19 and Russo-Ukraine war have cast some doubt about a smooth sailing to the shore on schedule. But to go by the observation of World Bank's managing director of operations, Axel van Trotsenburg, there are reasons to be optimistic. According to him, achieving the middle-income status is not the issue, the objective for Bangladesh ought to be to attain the higher-income status. He categorically sounds a note of caution for the country about falling into the 'middle-income trap'. True, transition from a lower-income economy to a middle-income one is quite a struggle but the next move up the ladder to the higher-income status is a gargantuan task.

The WB managing director who has just concluded his three-day visit to Bangladesh on Tuesday made it explicit that the multilateral lender will support the country to navigate through the 'challenging and uncertain economic times brought on' by the pandemic, Ukraine war and a climate change of unprecedented order. Acclaiming Bangladesh's growth and its target of doubling the per capita income by 2031, the high official of the WB has prescribed some measures for its sustainable growth. Failing to do so, the country, he warns, will find its graduation from the middle-income to a higher-income status wavering in the vortex of the middle-income trap. In this context, he has cited the example of Argentina and Greece which could not come out of this trap. Then, there is the danger of an about-turn on the reverse course as a few Latin American countries have had the bitter taste of experiencing.

It is exactly at this point that Bangladesh has to make its option clear. All multilateral agencies including the WB have time and again suggested institutional reform. Indeed, strengthening of institutions is at the heart of streamlining transparent financial management, stemming corruption such as bribery and money laundering and revenue generation in real terms. So far as wealth creation is concerned, it could be at a higher rate by at least 2.0 percentage point if only financial corruption could be tackled effectively, if not stopped totally. This has to be complemented by rational distribution of wealth so that people at the lower level of society can earn enough to improve their living conditions.

Well, the WB's MD has then mentioned a list of must-do's which have been reiterated by both local and international experts. From macro-fiscal management to export diversification to investment in infrastructure to development of human capital ---all major issues he brings under the ambit of strategic planning and action. The recipe is not quite unknown. But knowing what to do is one thing and doing it in practical terms is a completely different matter. However, given the political will, the priority areas can be identified for immediate action. Developing human capital

is one such issue that calls for far larger investment than what is allocated now in education which has, according to the authorities, been radically changed to undergo a paradigm shift. In the same way, corruption, export diversification etcetera can be taken care of gradually in the interest of catapulting the country on the trajectory of higher-income status.

Miami lesson for **mosquito** eradication

The fight for mosquito eradication so far has been a losing battle. It may not remain so if Mayor Atiqul Islam of the Dhaka North City Corporation has got the lesson from his visit to Miami Dade County right. At least he is confident that he has found the way out of the endemic problem of mosquitoes' proliferation beyond control. Citing the mayor's statement, the public relations department of the DNCC issued a press release on Saturday last to the effect that the mayor has realised how the method applied so far to control mosquitoes in Dhaka is inappropriate. There is a clear admission that the authorities here have applied a wrong method. It has failed to eradicate mosquitoes and in the process a huge amount of money has gone to waste.

Now on a visit under a programme of the government of the USA, the mayor leading a delegation of the DNCC was given a practical demonstration of the different dimensions of mosquito control by experts of the Miami Dade County. The emphasis on fogging to kill adult mosquitoes is misplaced; rather focus has to be shifted to larvae. Destroying larvae, the mayor learns, will be effective. Well, destroying larvae can surely be an effective way but is not rooting out the mosquito breeding grounds even better way of fighting the awful curse from the tiny insects? Well, in a messy city like Dhaka, not all breeding spots can be cleared for reasons understandable. In that case both larvicide and clearing of as many breeding grounds as possible are likely to be an answer to the problem. Then there are advanced scientific methods now either applied or under study that can be useful. Cytogenetic study of mosquitoes has by now developed male mosquitoes which when mate with their female counterparts do not produce eggs. This and there are other ways of neutralising mosquito breeding.

It is good to learn that the mayor has a plan to set up a laboratory for detection of different species of mosquitoes. He is also flexible enough to have the job done at a university laboratory if possible. Miami Dade County, the mayor informs, has 52 species of mosquitoes and the county is at risk of falling victim to different kinds of mosquito-borne diseases such as dengue, chikungunia and zika virus all through the year. But the county has successfully averted any such crisis.

The DNCC mayor has reasons to be optimistic about bringing about a discernible change in the fight against mosquitoes here as weather in Mimami Dade County and Dhaka are almost similar. He would make arrangement for video conferences between entomologists in Dhaka and those of the Dade County. This will help exchange the knowledge and framing of an action plan for eradicating mosquitoes in Dhaka. Well, experts here also can conduct a study on the life cycles of different varieties of mosquitoes and get the idea of limiting their breeding. So far as the Aedes genus is concerned, its breeding season and process are more or less known. What needs to be brought under scrutiny is how this dangerous variety survives in the off season. If effective programme can be taken against those ---and other genera --- at the time when they are most vulnerable, the programmes stand to succeed.

Addressing unemployment

The International Labour Organisation's (ILO's) projection on the global employment situation for the 2023 is hardly encouraging. Titled, 'World Employment and Social Outlook: Trends 2023 (WESCO trends)', the report was released on Monday focusing on job creation or the lack of it along with inflation, productivity and broad economic recovery or not in each country, region and continent separately and collectively. Against the projected global employment growth of a paltry 1.0 per cent which is half that of the previous year, unemployment will be slightly higher by just 3.0 million to 208 million to stay at a rate of 5.8 per cent. South Asian region's employment growth will also be almost half at 1.6 per cent from 3.0 per cent a year ago. So far as employment generation is concerned, Bangladesh's performance will be at the centre of attention for its people. According to the ILO report, there will be a slight drop in the country's unemployment from 5.0 per cent in 2022 to 4.8 per cent in the current year. It can be seen either way--positively or negatively. Positively because, although it is a negligible recovery of just 0.2 per cent, it is after all a decline in unemployment at the same annual rate since 2020. If the higher number of working-age population who join the workforce here is taken into consideration, even the 0.2 per cent drop in annual unemployment at this crunch time cannot be considered a dismal development on the labour front. The negative perspective is that this is much too inadequate for a country's healthy and equalitarian socio-economic order--particularly when it is poised to attain the low-income developing status by 2026. Significantly, despite the drop in unemployment, the rate of unemployment will still remain higher by 0.4 per cent over the pre-pandemic level of 4.4 per cent in 2019.

As the free-market economy is increasingly exposing its ills in terms of uneven growth and atrociously unequal distribution of wealth, Bangladesh has also followed suit in that respect. The fact that even in the pandemic and post-pandemic periods, two-thirds of the world's wealth were accumulated into the hands of just one per cent of the global population is likely to be true for Bangladesh as well. When inflation bites and not all retrenched people succeed in getting employment or are forced to accept lower-paid jobs on adverse terms and conditions, the ILO report's underlying message becomes even more troubling.

The ILO has suggested prudent government policy intervention. Well, in order to make the macroeconomic health as much stable as possible, governments almost everywhere have generously allocated stimulus packages for big businesses with hardly any corresponding return or facilities for workers, avenues of fresh employment or any condition for limited profits. Had there been such strings attached to the generous allocations, inflation would not flare like forest fire crippling the economy at the micro level. Big businesses were reluctant to downsize their operative capital and profits and governments preserved their interests instead of the small units and workforces. What if the small and medium enterprises could maintain their optimum operation and workers were provided with higher wages, and fresh hands recruited particularly in post-pandemic recovery time? People's purchasing capacity would perhaps propel large industries and big businesses also to run full capacity. At least it was possible before the escalation of fuel price and Ukraine war. Now the only option is to realise wealth tax more than proportionate to the undue possessions by the rich and the superrich in the meantime.

Renewable energy gets a big boost

It is good to know that the KfW Development bank is coming forward with €181.5 million as aid to Bangladesh in two very important fields. These include increasing energy efficiency and developing renewable-energy resources in country, and has signed two grant agreements to that effect with the government. This assistance could not have come at a better time, as the government has aggressively been pursuing ambitious targets - economic development and fulfilling the Paris agreement. The issue of renewable energy has been a contentious one in the country as land is a scarce and highly precious commodity. That said, there is a lot of potential for using photovoltaic systems on roofs of buildings in villages, towns and cities.

With regards to increasing energy efficiency in industry, the funds will assist efforts to transform energy-intensive industries in the country by opening the door to concessionary loans. These will go to pay for the replacement of existing machinery with more energy-efficient ones. The idea is to reduce energy consumption in these industries, particularly at a time when energy prices are rising phenomenally. The other benefit from such transformation that comes through is that with adoption of more energy-efficient machinery, CO₂ emissions will reduce considerably. The dual effect of this initiative, if implemented properly, will save much-needed primary energy and help keep check on carbon footprint.

The implementing agency, Infrastructure Development Company Limited (IDCOL), has also adopted two programmes that will, in effect, increase the use of renewable energy sources. And that will also combat CO₂ emissions in the overall power sector. IDCOL and Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL) will act as conduits for extending low-interest loan facilities to investors in the renewable energy sector. Sub-sector activities will include promotion of off-grid renewable energy like solar irrigation pumps, domestic biogas plants, etc. While it is certainly commendable that these funds are being given as grant, it begs the question why the government, through its own renewable body SREDA isn't spearheading the renewable issue on a much grander scale.

Yes, the multi-million Euro aid package will certainly help, but obviously, much greater emphasis is needed at policy level. The rooftop solar programme should be made mandatory for all government buildings to start with, particularly in urban centres like Dhaka and Chittagong. Once this is done, only then can authorities demand the same from the private sector and permanent residents of cities to follow suit. Similarly, there is no need to explain in detail the benefits of the solar pump for agricultural purposes. IDCOL has had some success with the technology, but as it costs a few hundred thousand Taka to install one, matching funds should come from the government to expedite the process. With diesel prices rising around 50 per cent in one go, solar irrigation makes much more sense from an economic point of view.

While the benefits of these systems are well understood, some systems are still lagging behind. For off-grid photovoltaic systems to really take off, we need "mini-grids" that can take energy produced by the solar systems when not being used in homes, for agriculture or elsewhere. The need to move away from fossil fuels wherever possible should be pursued and funds need to be committed nationally as part of the transformation process. With nearly 95 per cent of the general

populace now having access to the national grid, it has become more imperative than others that the grid part of the renewable eco-system is invested in.

BB's green refinancing scheme

The refinancing programme recently announced by the Bangladesh Bank (BB) could be singled out for its thrust on a critical issue --- greening of entrepreneurship. Clearly, the central bank's initiative has been prompted by the global tendency to go green in every sector of life, including that of industries and technology-based agriculture. As reported in the media, the BB has put its refinancing package's monetary value at Tk 50 billion. The sum is aimed at promoting green industry in the export and production sectors. The essence of the BB's refinancing carries a universal appeal and a timeless significance as well.

Under the scheme, the so-called green entrepreneurs in the country will be entitled to get loans at a 5.0 per cent interest, a BB circular says. Globally, the thrust is on making the production units green. Bangladesh, albeit in a small way, has been taking initiatives in that direction. Its readymade garment sector has now 117 US Green Building Council Leadership in Energy and Environment Design (LEED)-certified green factories. The number is the highest in the world. These green units have lower operational cost, though their building cost is higher than that of conventional factories. The green factories help cut down energy use by around 40 per cent and water consumption by more than 30 per cent. They also release less carbon dioxide.

In order to supplement its refinancing scheme, the Bangladesh Bank created a similar fund titled Green Transformation Fund worth US\$200 million in 2016. The size of the fund became bigger through the addition of 200m euros in 2020. Ostensibly, it's a back-up of the main scheme. The fund is designed to finance procurement of capital machinery and related paraphernalia meant for putting into effect green industrialisation. It's a hard truth that disbursement from the above funds, however, has been slow. In line with the fast approaching small and large climate disasters, weathermen are unanimous on the point: the world, the poorer countries in particular, cannot afford to undermine the green issue. It's also true the multi-pronged struggles to attain an all-round greening require large amounts of money at national levels. It's only after the local initiatives, can the world dream of a global camaraderie in attaining success in its green mission.

These are, indeed, the signs of new times that humanity lately has not been confined to its day-to-day activities to go green. They have also included different other sectors related to their hazard-free survival. Those include efficient use of water expanses, water conservation and management, waste management, resource efficiency and recycling, renewable energy, heat and temperature management and many other localised areas. In the fast-expanding sphere of the greening efforts, the industrial sector doesn't lag behind. Following their peers in the developed countries, entrepreneurs in Bangladesh, too, have lately focused on making their industrial production processes environment-friendly. They love to call these products green. Ranging from textile production, RMG in particular, to that of the automated ones, the country's entrepreneurs are apparently eager to go green. The BB's refinancing scheme will go a long way in helping Bangladesh realise its green dream.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

Padma Bridge (Short Note or Paragraph)

Padma Bridge is a multipurpose bridge project over the fast-flowing Padma River in Bangladesh. It is the country's largest mega project which has been built with full domestic funding without any foreign aid. The bridge connects the southwestern part of Bangladesh to the northern and eastern parts, which includes 21 districts. The bridge is in the districts of Shariatpur and Madaripur. The bridge has 42 pillars and 41 spans. The 6.15km-long and 18.10m wide bridge considered as a 'game changer' of the country's economy has connected Dhaka to 21 southern districts through road and railways. The construction of the bridge started in 2014 with only concrete and steel. Building the bridge was a big challenge. But overcoming all the obstacles and challenges, on 25 June 2022, the honourable Prime Minister and Leader of the Nation 'Sheikh Hasina' along with some prominent leaders and some others inaugurated the much awaited Padma bridge. After the opening of the bridge, it has become the largest bridge in Bangladesh and has started contributing to the country's communication, economy and industrialization. More than 1000 thousand crore taka toll has already been collected from the bridge within less than one and half years. Studies have predicted that the national GDP growth rate will increase by 1.2 percent. It is also predicted by different sources that poverty rate will decrease by 1.9 annually. So it can be said that the Padma Bridge is able to help Bangladesh grow socially, economically, and industrially, and it's something the country is very proud of.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

পদ্মা বহুমুখী সেতু (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

পদ্মা সেতু প্রকল্পের নাম 'পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প'। এটি বিশ্বের প্রথম কংক্রিট ও স্টিল নির্মিত দ্বিতলবিশিষ্ট বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু এবং বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু। এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কি.মি. এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। ৪২টি পিলার ও ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যানের মাধ্যমে পদ্মা বহুমুখী সেতুর মূল অবকাঠামো নির্মিত। পদ্মা সেতু প্রকল্পে মোট ব্যয় ৩৮,৯০১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। 'চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি' পদ্মা সেতু নির্মাণে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই সেতু মুন্সিগঞ্জ জেলার মাওয়া থেকে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা প্রান্তকে সংযুক্ত করেছে। তবে প্রকল্পটির চলার পথ সহজ ও সাবলীল ছিল না। বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের টানা পোড়ন, ঋণ স্থগিত ও দীর্ঘসূত্রিতার ফলে এ সেতুর বাস্তব কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। যেখানে এ সেতুর কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৪ সালে সেখানে এই সেতুর নির্মাণ কাজই শুরু হয় ২০১৫ সালে আর সেটি নিজস্ব অর্থায়নে। এতো বড় মেগাপ্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করাটা ছিল বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২২ সালের ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই বড় চ্যালেঞ্জ উতরে যায় ভালোভাবে। পদ্মা বহুমুখী সেতু চালুর ফলে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ২১ জেলার সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের কৃষি, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, মাঝারি শিল্পের পণ্য পরিবহনে সময় ও অর্থ কম লাগার পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হচ্ছে। উদ্বোধনের পর থেকে দেড় বছরের কম সময়ের মধ্যে ১ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় দেশের জিডিপি হার ১.২৩% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিবছর ১.৯% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে এবং ভিশন-২০৪১ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ সামনে রেখে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পদ্মা বহুমুখী সেতু নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

Metro Rail (Short Note Or Paragraph)

Traffic jam has been a regular phenomenon in Dhaka city. Dhaka is one of the most highly populated and traffic congested cities in the world. Due to the traffic congestion the valuable time of the citizen of Dhaka is being wasted. As the people are facing unbearable traffic congestion and wasting the valuable times, they

can not complete their work and reach their destination in time. So with keeping these things in mind, the government has made some plans to implement. Dhaka metro rail is one among the plans. Dhaka metro rail is a new metro rail system being constructed by the Dhaka Mass Transit Company (DMTC) in Bangladesh. Through the world's first metro rail system opened in 1890 in London, it is totally a new concept in Bangladesh. Under the project, a total of five lines, MRT Lines 1, 2, 4, 5, and 6, have been proposed. MRT Line-6 is the first line which is being constructed. The other MRT lines will be constructed with the time framed by the government. The Metro Rail from Uttara to Agargoan has already been inaugurated on 28 December, 2022. The route is 20.1 kms from Uttara to Motijheel with 16 stations. JICA and the government of Bangladesh are funding the project. The metro rail coaches are equipped with modern facilities like information display, well organized seating arrangements, air conditioning with wheelchair accessibility. There is an arrangement of reducing vibration and noise. The metro rail is bringing some benefits for the city people. When completed fully and in operation about 60,000 people will be able to commute per hour. There has been a declaration that Agargoan-Motijheel part will be inaugurated on 20 October 2023. It will take only less than an hour from Uttara to Motijheel. There will be no traffic congestion like roads and the metro rail will be eco-friendly. As there will be a train in 4 minutes the people will not have tension to reach their working places in time. Travel to work place will be enjoyable one as people can have modern train facilities and beautiful look from above. There will be less pressure on roads as more people will use the metro rail to reach their destination. Once completed the metro rail will be the time efficient, reliable, safe and environment friendly

solution to the traffic jam. This addition to Dhaka city will turn Dhaka into more active, commutable and pollution free city.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

এজেন্ট ব্যাংকিং (শার্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেভিংস, লোন, রেমিট্যান্স ছাড়াও পেমেন্ট সার্ভিস যেমন- ইউটিলিটি বিল, কর বা সরকারি ভাতা তোলা মতো কাজগুলো করার নিমিত্তেই এই উদ্যোগ অর্থাৎ এজেন্ট ব্যাংকিং এর মতো সেবা চালু করা। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে, ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৯টি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স নিয়ে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সব স্তরের জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের মাঝে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম অন্যতম। বর্তমানে সারাদেশে ১৭ হাজারের অধিক আউটলেটের মাধ্যমে অশিক্ষিত ও কম শিক্ষিত গ্রামপর্যায়ের মানুষরাও এখন ব্যাংকিং সেবা নিয়ে যাচ্ছে। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেবা নিচ্ছে প্রায় সোয়া কোটি এর অধিক গ্রাহক। বর্তমানে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের সেবা মিলছে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিভাগের সর্বশেষ হিসাবে দেখা গেছে, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের এক কোটি ২২ লাখ পাঁচ হাজারের অধিক হিসাবের ৮৬ শতাংশই গ্রামের বাকিটা শহরের অধিবাসীদের। রাস্তার ধারে, ফুটপাথ ও অলি-গলিতে মিলছে ব্যাংকের সেবা, যা সম্ভব হয়েছে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নারীদের আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে এসেছে। দূর করেছে লিঙ্গ বৈষম্য। চাঙ্গা করেছে ৮৬ শতাংশের গ্রাহকের গ্রামীণ অর্থনীতি।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

স্মার্ট বাংলাদেশ (শার্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ হলো এমন এক আধুনিক বাংলাদেশ যেখানে সবকিছু প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হবে, দেশের নাগরিকরা প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং এর মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতি পরিচালিত হবে। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ এর ভিত্তি মূলত চারটি; সেগুলো হলো স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশের মেয়াদকাল ২০২২-২০৪১। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে ১৪ দফা কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই দফাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির অধীনে আত্ম-কর্মসংস্থান ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন কার্যক্রম

নিশ্চিতকরণের জন্য ‘ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম’ ব্যবস্থা হাতে নেওয়া, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠাকরণ, দ্রুত টেকসই দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিকরণসহ আরো বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি, ২০৪১ সাল নাগাদ রূপকল্প-৪১ এবং ২১০০ সাল নাগাদ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে। তাছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশবান্ধব আর্থিক বাজেট রাখতে হবে প্রতিবছর। বাংলাদেশের স্মার্ট ধারণার বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই লক্ষ্যে বহুমুখী তৎপরতাও শুরু হয়েছে বেশ। তবে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য অনুসঙ্গ হিসেবে অনেক কিছু প্রয়োজন তার অনেক কিছুই এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য সবচেয়ে যেটি প্রয়োজন, সেটি হলো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। এক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পেতে দেশের সবাইকে উপযুক্ত করে তোলাটাও বেশ জরুরি। এখানেও পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি এখনো। আর এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যাবতীয় বিষয় ভালোভাবে রপ্ত করাটাও বেশ বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের শ্রমিকরা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেশ কম। কারিগরি শিক্ষা না থাকায় অদক্ষ, আধাদক্ষ শ্রমিক বিদেশে যাওয়ার কারণে কাজক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ। যা স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের আরেকটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধু স্লোগান বা কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যথাযথ আধুনিক এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিভিন্নখাতে মানুষকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। তবেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

Smart Bangladesh (Short Note Or Paragraph)

After successfully implementing the goals to build Digital Bangladesh, Bangladesh is moving forward with a new program and that is Smart Bangladesh. The timeline of Smart Bangladesh is 2022-2041. On the basis of four foundations of Smart Citizen, Smart Economy, Smart Government and Smart Society, a cost-effective, sustainable, intelligent, knowledge-based, innovative Smart Bangladesh will be built by 2041. The main purposes of Smart Bangladesh are that every citizen will be skilled in using

technology, economic activities will run through using technology, the government will be technologically smart, the whole society will be technologically smart and that Bangladesh will be a smart Bangladesh. The elements of Smart Bangladesh-2041 will mostly include smart education, smart healthcare, smart agriculture, smart trade and smart transformation. To implement Smart Bangladesh-2041, the government has set up 14 action plans. And the government has already formed 'Smart Bangladesh Taskforce' to implement the 14 action plans. We can only materialize the dreams of Smart Bangladesh by preparing the young generations as smart citizens. Besides the government has to develop the country's hardware industry and manufacture world-class technology-based industries. Besides unskilled and inexpert youth are required to be trained to make them skilled in cyber security, blockchain, artificial intelligence to build Smart Bangladesh. Only then, all the citizens, regardless of their socio-economic background, all businesses, regardless of their size, can benefit from Smart Bangladesh. After Digital Bangladesh, Smart Bangladesh is the ongoing major step towards realizing Bangabandhu's dream of Sonar Bangladesh, a Golden Bangladesh.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

মোবাইল ব্যাংকিং (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

মোবাইল ব্যাংকিং হলো মোবাইলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পরিষেবা যেখানে গ্রাহক স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটের মতো মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যাংকিং লেনদেন করতে সক্ষম। অর্থাৎ যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একজন গ্রাহক মোবাইল বা ট্যাবলেট ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পাও সেই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বলে মোবাইল ব্যাংকিং। বাংলাদেশে মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক সেবার যাত্রা শুরু হয় ২০১১ সালের মার্চে। ডাচ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম এ সেবা চালু করে। পরে এটির নাম বদলে রাখা হয় রকেট। এরপর ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমএফএস সেবা চালু করে বিকাশ। বর্তমানে রকেট বিকাশের পাশাপাশি ডাক বিভাগের সেবা নগদসহ মাই ক্যাশ, এম ক্যাশ, উপায়, শিওর ক্যাশসহ ১৫টির মতো ব্যাংক এ সেবা দিচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে

বড় বাজার দখল করে আছে বিকাশ, দ্বিতীয় রকেট এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ডাক বিভাগের সেবা নগদ, যা ২০১৯ সালের মার্চে চালু হওয়া সেবা; মাত্র দুই বছরে বড় বাজার দখল করে নিয়েছে। এখন মোবাইল ব্যাংকিং শুধু টাকা পাঠানোর মাধ্যমই নয়। বরং ছোটখাটো লেনদেন যেমন বিল পরিশোধ, স্কুলের বেতন, কেনাকাটা, সরকারি ভাতা, টিকিট ক্রয়, ব্যাংক প্রিমিয়াম পরিশোধ, মোবাইল রিচার্জসহ ব্যবহার হচ্ছে আরও নানা সেবার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, গত এক বছরের মাঝে মোবাইল আর্থিক সেবা ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যানুসারে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে ৫৭ হাজার কোটির অধিক লেনদেন হয় যা ২০২২ সালের জানুয়ারিতে এসে ৭৩ হাজার কোটির অধিকে এসে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, ২০২২ সালের জানুয়ারি শেষে এ সেবার নিবন্ধনকৃত গ্রাহক সংখ্যা ১১ কোটি ৪০ লাখ। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

চ্যাটজিপিটি (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

বর্তমান ডিজিটাল বিশ্বে দ্রুতগতিতে অগ্রগতি হচ্ছে প্রযুক্তির। আর প্রযুক্তির এই অগ্রগতিতে কার্যত চালকের ভূমিকা রেখে চলেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে এআই দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি আলোড়ন ফেলে দিয়েছে ইলন মাস্ক এবং স্যাম অল্টম্যান ডিজিটাল সংযোজন চ্যাটজিপিটি বা ChatGPT। এর জনপ্রিয়তা এতোটা যে চ্যাটজিপিটি উন্মুক্ত করে দেওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ বা এক মিলিয়ন ছাড়িয়েছে বলে সংবাদসংস্থা ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। ২০২২ সালের নভেম্বরে তৈরি হওয়া চ্যাটজিপিটি শুধুমাত্র জানুয়ারি মাসেই ব্যবহার করেছে প্রায় ১০ কোটি মানুষ। বর্তমানে এর জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জিপিটির পূর্ণরূপ হলো Generative Pre-trained Transformer। চ্যাটজিপিটি হলো আসলে একটি চ্যাটবট/Chatbot আর এই চ্যাটবট তৈরি করা হয়েছে জিপিটি-৩ এবং পরবর্তীতে তৈরি করা জিপিটি-৩.৫ এর উপর ভিত্তি করে যা আসলে একটি ল্যান্গুয়েজ মডেল। এটি একটি অত্যাধুনিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ AI মডেল OpenAI দ্বারা তৈরি। এই ওপেন এআই চ্যাটবটটি ইন্টারনেটে থাকা ওয়েব পেইজ, ওয়েব টেক্সট, বই, উইকিপিডিয়া, আর্টিকেলসহ বিভিন্ন সোর্স থেকে প্রায় ৫৭০ জিবির বেশি ডাটা সমৃদ্ধ। শুধু তাই নয়, এই চ্যাটবটে রয়েছে ৩০০ বিলিয়ন শব্দের ভাণ্ডার। এই চ্যাটবটটি মানুষের মতো

টেক্সট তৈরি করতে সক্ষম। চ্যাটবট ব্যবহারকারীর যেকোনো প্রশ্নের উত্তর খুব গঠনমূলক, নির্ভুল, যুক্তিযুক্ত এবং সহজভাবে প্রদর্শন করে এই চ্যাটবটটি। কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ অর্থাৎ বিজ্ঞাপন ছাড়াই কাজ করে এই চ্যাটবটটি। কবিতা লেখার পাশাপাশি অর্থনীতি-রসায়ন থেকে শুরু করে সকল বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম এই চ্যাটবটটি। অনেকের মতে গুগলের চেয়ে ভালো এই প্রযুক্তি জানতে চাওয়া প্রশ্নের উত্তর গুগলের মতো অনেকগুলো লিঙ্ক দেখায় না বরং কয়েক সেকেন্ডের মতো উত্তর ব্যবহারকারীর সামনে এনে দেয়। এই চ্যাটবটের সুবিধা থাকলেও এর অসুবিধাও নেহায়েত কম নয়। মূলত এই চ্যাটবটে কেবল টেক্সট রেজাল্ট পাওয়া যায়, ভিডিও বা ভিজুয়াল রেজাল্ট আসে না। তাছাড়া এটি সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে উত্তর প্রদানে অক্ষম। কারণ এর সিস্টেমে থাকা ডাটা তুলনামূলক পুরোনো, আর এই পুরোনো ডাটা থেকেই এটি উত্তর প্রধান করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের হালনাগাদ উত্তর প্রদানে অক্ষম। এই চ্যাটবটটি আপাতত পাবলিক টেস্টিংয়ের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং এর উন্নয়নের কাজও চলমান রয়েছে।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

ChatGPT (Short Note Or Paragraph)

Nowadays technology is advancing rapidly in this digital world. And Artificial Intelligence (AI) is working behind this technological advancement. ChatGPT is an artificial intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and released in November 2022. It is built on top of OpenAI's GPT-3.5 and GPT-4 fundamental large language models. In few days after it is public, ChatGPT has garnered a lot of attention in and outside the tech world and hit the one million user mark. ChatGPT enables people to have natural language talks with a computer-generated creature. As it is incredibly easy to sign up and use and has many benefits, it has become and is becoming increasingly popular among professionals, companies and users across the globe. ChatGPT is a generalist chatbot that does a variety of tasks like answering questions of all kinds, creation of songs, poems and essays, translating languages in different languages, solving mathematical

equations, writing and correcting computer code, editing and summarizing research assignments, creating jokes or writing children's stories, writing a film scrip, writing different kinds of articles, theses, research proposals and books etc. ChatGPT has some drawbacks or disadvantages too. One of the biggest limitations of ChatGPT is that it sometimes produces texts that are incorrect. So using that chatbot alone for research purposes is not ideal. Besides it can only provide information about events occurring in 2021 and earlier. So it has limited knowledge of facts because it uses datasets that are not updated. Besides researchers have worried about copyright infringement regarding this Chatbot as its outputs are based on human-generated texts. So it should be used responsibly with care as it has both negative and positive sides.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

ডেল্টা প্ল্যান বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য একটা কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার নাম হলো ডেল্টা প্ল্যান বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা। এই ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ গ্রহণ করা হয়েছে ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডের আদলে। ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যান হিসেবে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০-এর অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)। শতবর্ষী এই ডেল্টা প্লানের অষ্টটি লক্ষ্যগুলো হলো বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয় থেকে রক্ষার কৌশল খুঁজে বের করা, নগর ও শহরের নিরাপদ পানি সরবরাহ করা, টেকসই নদী অঞ্চল, জলাভূমি সংরক্ষণ, আন্তঃদেশীয় নদীর পানির সুসম বন্টন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশণ ব্যবস্থা উন্নতকরণ। এ মহা-পরিকল্পনার জাতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যগুলো হলো ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করা; ২০৩০ সাল নাগাদ চরম দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত সমৃদ্ধিশীল দেশের মর্যাদা লাভ করা। এ পরিকল্পনার অগ্রগতি তদারকি করার জন্য ৫ বছর পর পর ডেল্টা প্লানের তথ্য হাল-নাগাদ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ব-দ্বীপ

পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত ৮০টি প্রকল্পে আগামী ১০ বছরের জন্য বিনিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হিসেবে জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছে এবং বেসরকারি খাত থেকে ০.৫ শতাংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে অনেকের কর্মসংস্থান হবে। তবে এই পরিকল্পনার অনেক চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অর্থের সমাবেশ করা। এক্ষেত্রে জনগণের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরকেও এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ সরকার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে দৃঢ়সংকল্প ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে এক সুখী সমৃদ্ধিশীল উন্নত বাংলাদেশ।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

Delta Plan-2100 (Short Note Or Paragraph)

Bangladesh Delta Plan-2100 or the Delta Plan-2100 is a long term strategy that combines adaptive management approaches to adapt to climate and the uncertainties of challenges. Bangladesh Delta Plan-2100 was approved by the National Economic Council chaired by Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina in 2018. Its primary goals are to achieve long term food or water security and economic development as well as to ensure a sustainable environment. This 100 year visionary plan, Bangladesh Delta Plan-2100 is an important step towards fulfilling the commitment of achieving a safe, resilient and prosperous Bangladesh. Bangladesh is the first country in the world to develop such a comprehensive long-term, inter-sectoral, water-centric and techno-economic plan for its entire delta. The government of Bangladesh plans to spend 2.5% of GDP for delta-related interventions, through investments and maintenance of already realized projects. The Delta Plan will also help reduce urban migration by about 60%, coastal zone out-migration by 50%, and river area-migration by 50%. The Delta Plan will create an opportunity to harmonize regional and local development plan for agriculture, water management, environmental affairs, ecosystem management, urbanization, tourism etc with the national plans. In the coming years, attempts

have been made to form Bangladesh Delta Plan-2100 or Delta Plan-2100 in exactly how we would like to build Bangladesh.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

ভবিষ্যতকে সুবিন্যস্ত রূপে গড়ে তুলতে কোনো উদ্দেশ্য কোনো কিছু করার ইচ্ছাকে বলে পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হলো একটি সচেতন ও পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা। আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের বিবিধ সম্পদকে সুবিবেচিত ও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে চাহিদামাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এই পরিকল্পনা। মূলত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর পরিপেক্ষিতে ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ এনইসি সভায় ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে পরবর্তী পাঁচটি অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ ধরা হয়েছে ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ (দেশীয়) উৎস থেকে খরচের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৫৭ লাখ ৪৮ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা, বৈদেশিক উৎস থেকে আসবে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৫৯০ কোটি টাকা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো হলো: ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা, পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো থেকে বিদেশে কর্মী পাঠানোর সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে সঠিক তথ্য, প্রশিক্ষণ, অভিবাসন ব্যয় মেটাতে ঋণ সহায়তা দেওয়া, সবশেষ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৫-এর নিচে নিয়ে আসা, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ, দারিদ্র্য হার ১৫.৬% এ নামানো, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য পথপরিষ্কার প্রণয়ন। মূলত দারিদ্র্যবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমবাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করা, আয়- বৈষম্য কমানো, সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, টেকসই নগরায়ন, সরকারের 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

8th Five Year Plan (Short Note Or Paragraph)

Five year plan means a plan for a national and industrial development within a period of five years especially as undertaken by the country's government. In general, the five-year plan is an important document for the nation's national journey and development for a definite period of time. Through such a plan, the country's goals are established and areas of investment are identified. The time duration of the Eighth Five-Year Plan in our country is July 2020 to June 2025. The National Economic Council (NEC) approved the 8th Five Year Plan (8FYP) on 29 December with the theme 'No one will be left behind'. The plan has some specific goals like achieving 8 percent GDP growth per year and at maturity 8.51 percent, decreasing the gap between export income and import cost, achieving the target of 74 year average life expectancy, reducing poverty rate to 15.6% creating employment of more 1 cores 16 lacs people, increasing agricultural production growth to 3.9% and industrial production growth 11.9% and 30,00 MW electricity generation within this five year plan. Besides the government has emphasized to speed up the fulfilment of becoming an upper-middle-income country by 2031 and a status of a high-income country by 2041, commencement of Delta Plan 2100 and accelerating rural development through this 8th Five Year Plan.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। এটি সরকারের মেগাপ্রকল্পের একটি। মহাসড়ক যখন মাটি থেকে উপরে পিলারের উপর নির্মিত হয়ে, তখন সেটিকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বলা হয়। মূলত মহাসড়কে চলাচলের নানা বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে বিরামহীনভাবে যান চলাচলের সুবিধা দিতেই এই এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া। এটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

থেকে শুরু হয়ে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও হয়ে মগবাজার, কমলাপুর, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী এলাকায় গিয়ে শেষ হবে। এই প্রকল্পের মূল দৈর্ঘ্য ১৯.৭৩ কিলোমিটার। তবে সংযোগ সড়কসহ এটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। যানবাহন চলাচলের জন্য প্রস্তুত বিমানবন্দরের কাওলা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত এই ১১ কিলোমিটার। যা ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অংশে ১৫টি র‍্যাপ রয়েছে। এই এক্সপ্রেসওয়েটিতে ১১টি টোলপ্লাজা থাকবে। ২০০৯ সালে কাজ শুরু হওয়া প্রকল্পটির চালু হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালে। তবে নানা জটিলতায় প্রায় এক যুগ পিছিয়ে এর নির্মাণ কাজ। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। এটি থাইল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড ৫১ শতাংশ, চীনা প্রতিষ্ঠান শেনডং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন লিমিটেড ১৫ শতাংশ এবং সিনোহাইড্রা করপোরেশন লিমিটেড ১৫ শতাংশ অংশীদারিত্বে নির্মাণ হচ্ছে। এই প্রকল্পের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ফাস্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি লিমিটেড। এই এক্সপ্রেসওয়ের সুবিধা নিতে হলে যানবাহনের মালিকদের টোল দিয়ে উড়ালসড়কে উঠতে হবে। যানবাহনভেদে টোল নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বনিম্ন ৮০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা। এর উপর দিয়ে দৈনিক প্রায় ৮০ হাজার যানবাহন চলাচল করতে পারবে। এই মহাসড়কে চলাচলাকারী যানবাহন গন্তব্যে পৌঁছে যাবে অন্য যানবাহনের তুলনায় কম সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এছাড়া এ প্রকল্পটি কল্যাণে ঢাকা শহরের যানঘট অনেকেংশে কমে যাবে এবং ভ্রমণের সময় এবং খরচ দুটোই বাঁচবে। বিমানবন্দরের কাওলা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত এই ১১ কিলোমিটার চালু হলেও পুরো প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ। বাকি অংশের কাজ ২০২৪ সালের মাঝামাঝিতে শেষ হবে।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

Dhaka Elevated Expressway (শর্টনোট বা প্যারাম্বাফ)

An elevated expressway is a type of highway constructed above the ground level, typically on pillars or columns. Dhaka Elevated Expressway is the country's first elevated expressway project. This elevated expressway is connecting the Shahjalal airport with Kutubkhali via Mohakhali, Tejgaon and Kamalapur of Dhaka. To ease traffic jam in the capital, this is one of the largest infrastructure projects taken by the present government. The length

of the expressway is 19.73 km with the total length of 46.73 km including the connecting ramps. The 19.73 km expressway costs tk 8940 crore. On September 2, 2023, Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the 11.5 km Airport-Farmgate section of the Dhaka Elevated Expressway. Commuters can cover the distance between Kawla and Farmgate in just 10 minutes with the speed reaching up to 60 km per hour. The vehicles using the Dhaka Elevated Expressway are to pay tolls being in four categories. There is a restriction on three wheelers and motorcycles to ply on the expressway. The rest of the project is expected to open by the mid of the next year. Thanks to the Dhaka Elevated Expressway commuters can save travel time and money within the capital city and it will ultimately reduce the traffic congestion as well.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

পদ্মা রেল সেতু

পদ্মা বহুমুখী সেতু হলো বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। ২৫ জুন ২০২২ পদ্মা সড়ক সেতুর উদ্বোধন হলেও রেল সেতুর কাজ অসম্পন্ন থাকায় তা উদ্বোধন করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১০ অক্টোবর ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে রেল চলাচল শুরু হবে পদ্মা সেতু দিয়ে। এ সেতু উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিমি দীর্ঘ নতুন রেলপথ নির্মাণ করছে রেলওয়ে। এর মধ্যে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার চালু হচ্ছে আগামী ১০ অক্টোবর। এই রেলপথ জিটুজি (সরকারের সঙ্গে সরকারের) ভিত্তিতে চীনের অর্থায়নে নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কাজ করছেন চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চায়না রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। ২০১৬ সালের ৩ মে এই প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা তবে পরবর্তীতে এর নির্মাণ ব্যয় বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকায়। গত ৪ এপ্রিল পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল শুরু হয় এই সেতু দিয়ে। এটি বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। এই সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে যাতায়াত ও বাণিজ্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ঢাকা যশোর ট্রেনে চলাচল করা যাবে দুই ঘণ্টারও কম সময়ে। এতে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সময়

বাঁচবে। পদ্মা সড়ক সেতু ও রেল সেতু হয়ে উঠেছে দেশের অর্থনৈতিক করিডোরের মূল কেন্দ্র। এ সেতুর সড়ক ও রেল সংযোগ আঞ্চলিক নয় আন্তর্জাতিক সংযোগও বটে। ট্রান্স-এশিয়ান রেল ও সড়ক এ সেতুর মাধ্যমেই যুক্ত হবে। পদ্মা রেল সেতু চালু হলে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ২১ জেলার সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে। ফলে এ অঞ্চলের কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং মাঝারি শিল্পের পণ্য পরিবহনে সময় ও অর্থ কম লাগবে, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করবে।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

ডেঙ্গু জ্বর (শর্টনোট বা প্যারাছাফ)

ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে মশাবাহিত ভাইরাস ঘটিত রোগ। এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয়ে থাকে। এ রোগে প্রথমবার আক্রান্ত হলে রোগীর বিশেষ কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। শুধু অল্প কিছু ক্ষেত্রেই রোগের প্রভাব গভীর হয়। ডেঙ্গুর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো উচ্চ জ্বর (১০২ ডিগ্রী থেকে ১০৪ ডিগ্রী), তীব্র মাথা ব্যাথা, প্রচণ্ড পেট ব্যাথা, চোখের নিচে যন্ত্রণা, ক্রমাগত বমি হওয়া, মাড়ি ও নাক থেকে রক্তপাত, তকের নিচে রক্তক্ষরণ, অনেক সময় অনিয়মিত পায়খানা এবং প্রস্রাব ও মলের সাথে রক্তপাত হওয়া। আগে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর অবস্থা ৬ দিন পর সংকটাপন্ন হতো। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ১ বা ২ দিন পরই রোগীর অবস্থা অবনতি হচ্ছে। একজন ব্যক্তি সারাজীবনে একাধিকবার এমনকি চারবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারেন। যেহেতু ডেঙ্গু জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই সেহেতু ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার যেমন (ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের জুস এবং খাবার স্যালাইন) খেতে হবে এবং অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। তাছাড়া রোগীকে ভিটামিন সি, জিঙ্ক, আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তবে রোগীকে অবশ্যই আমিষ, চর্বি ও তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। ডেঙ্গু রোগের প্রতিকার হিসেবে নিজেকে এডিশ মশার কামড় থেকে বাঁচাতে হবে এজন্য শরীর ঢাকা জামাকাপড় পড়তে হবে, রাতে শোবার সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। মশা নিরোধক কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে আর সর্বোপরি বাড়ির চারপাশে জল জমতে দেওয়া যাবে না। এক পরিসংখ্যান থেকে উঠে এসেছে যে বাংলাদেশে ২০২১ সালে ডেঙ্গু জ্বরে মারা যাওয়া রোগীর সংখ্যা ১০৫ জন তা ২০২২ এসে দাঁড়ায় ২৮১ জনে আর ২০২৩ সালে এ ডেঙ্গু জ্বর মহামারি আকার ধারণ করেছে। এ বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ ৬১৮ জন রোগী মারা গেছে যা অতীতের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

Dengue Fever (শর্টনেট বা প্যারাগ্রাফ)

Dengue is a viral infection caused by the dengue virus, transmitted to humans through the bite of infected Aedes mosquitoes, particularly Aedes aegypti. Dengue is found in tropical and sub-tropical climates worldwide, mostly in urban and semi-urban areas. It is common in more than 120 countries, mainly in Southeast Asia, South Asia and South America. In Bangladesh, there is highest dengue death this year. Till September 2023, 618 people have died so far and 2023 is the deadliest year in the history of Bangladesh. WHO has already declared dengue in Bangladesh as a pandemic. The number of dengue death was 105 in 2021 whereas in 2022 the number was 281. Most people with dengue have mild or no symptoms and will get better in 1–2 weeks. Rarely, dengue can be severe and lead to death. The symptoms include high fever (40°C/104°F), severe headache, pain behind the eyes, muscle and joint pains, nausea, vomiting and rash. Individuals infected for the second time can have severe abdominal pain, persistent vomiting, rapid breathing, bleeding gums or nose, fatigue, restlessness, blood in vomit or stool, being very thirsty, pale and cold skin and feeling weak. The mosquitoes that spread dengue are active during the day. People can lower the risk of getting dengue by protecting themselves from mosquito bites by using clothes that cover as much of your body as possible, mosquito nets during the day or window screens, mosquito repellents and coils and vaporizers. The dengue patients should take rest, drink plenty of liquids and should contact a doctor as soon as possible if severe symptoms are noticed. As there is no specific treatment for dengue/severe dengue, and early detection and access to proper medical care greatly lower fatality rates of severe dengue.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

ক্যাশলেস বাংলাদেশ (শার্টনোট বা প্যারাছাফ)

বিনিময় প্রথা থেকে শুরু করে কাগজে মুদ্রার গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে অনলাইন এবং মোবাইল ব্যাংকিং এখন মানুষের দোরগোড়ায়। ব্যাংক চেক, তারবার্তার মাধ্যমে মানি ট্রান্সফার, ওয়্যারলেস ট্রান্সফার পরিষেবা ও ইলেকট্রনিক যুগে এটিএম কার্ডসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার সংযোজন ঘটেছে। বাংলাদেশের অনেক মানুষ এই ইলেকট্রনিক লেনদেনে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোভিড-১৯ সময়ে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে টাকা পরিশোধ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশকে ক্যাশলেস বাংলাদেশে রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রায় ১২০০ মার্চেন্ট নিয়ে রাজধানীর মতিঝিলে ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে কিউআর কোডভিত্তিক সার্বজনীন পরিশোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ ক্যাশলেস বা নগদবিহীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। নগদ অর্থে লেনদেন না করে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার মূল্য প্রদান করাকেই ক্যাশলেস পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে দেশের সকল ফিন্যান্সিয়াল ট্রানজিকশন মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, মোবাইল অ্যাপসে পেমেন্ট, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং অন্য যেকোনো অনলাইন পেমেন্ট করা অর্থ আদান-প্রদানও নগদবিহীন লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত। ক্যাশলেস বাংলাদেশের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সকল আর্থিক লেনদেন হবে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে। অ্যাপে বাংলা কিউআর কোডের মাধ্যমে সব ব্যাংকের গ্রাহক পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে। এছাড়া বিকাশ, নগদ, এমক্যাশ, রকেটের মতো মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অ্যাপ দিয়েও পণ্যের দাম পরিশোধ করা যাবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে লেনদেনকে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল লেনদেনের আওতায় নিয়ে আসতে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী ৪ বছরের মধ্যে (২০২৭) ৭৫ শতাংশ লেনদেন ক্যাশলেস মাধ্যমে আনার লক্ষ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। যেসব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাশলেস বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তাদের সেবার আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের ব্যবসাও বাড়বে। বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। ক্যাশলেস বাংলাদেশ সেবা চালুর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের সম্ভব প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। এছাড়া এ পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা কাউকেই ক্যাশ টাকা হাতে রাখার প্রয়োজন হবে না, ফলে উভয়ই চুরি-ডাকাতি ও চিনতাই এর হাত থেকে রেহাই পাবে। ক্যাশলেস অর্থনীতির প্রধান সুবিধা হচ্ছে-মুদ্রা মুদ্রণ এবং পরিচালনার খরচ হ্রাস। এছাড়া খুচরা টাকার বামেলা ও সময়ের অপচয় কমে, নকল বা জাল টাকার

জালিয়াতি থেকে সুরক্ষিত। আর এ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশে সকল লেনদেনের অর্থাৎ নগদ অর্থবিহীন লেনদেনই হলো ক্যাশলেস বাংলাদেশ।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

সর্বজনীন পেনশন (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

বাংলাদেশে বর্তমান গড় আয়ুষ্কাল ৭২ বছর। এক প্রাক্কলনে দেখানো হয়েছে ২০৭৫ সালে সেটি হবে ৮৫ বছর। বার্ষিকজনিত কারণে একটা জনগোষ্ঠী অভাবগ্রস্ত হবে এবং একটা সময়ে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এই সাহায্য লাভের অধিকার দেশের প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। বর্তমানে দেশে শুধু সরকারি কর্মচারীরা পেনশন পেলেও বেসরকারি চাকরিজীবীসহ সবাইকে পেনশনের আওতায় আনার প্রয়োজন ছিল। দেশের এই অংশ বঞ্চিত হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনগণের মাঝে সমৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি করা, জীবনযাত্রার মানকে দারিদ্রসীমার উপরে রাখার লক্ষ্যে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন-২০২২' এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দেন মন্ত্রিসভা। একে চূড়ান্তরূপ দিতে ২৩ জানুয়ারি ২০২৩, জাতীয় সংসদে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল ২০২৩' কঠোরভাবে পাস হয়। এবং ১৭ আগস্ট ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী এ পেনশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী দেশের ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল নাগরিক এই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারবে। বিশেষ ব্যবস্থায় এর বেশি বয়সীরাও এ পেনশনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীরাও এ ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারবে। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের আপাতত নতুন জাতীয় পেনশন-ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে। সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচিতে চারটি স্কিম রাখা হয়েছে এগুলো হলো যথাক্রমে প্রবাস স্কিম, প্রগতি স্কিম, সুরক্ষা স্কিম এবং সমতা স্কিম। প্রবাস স্কিম বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য। প্রগতি স্কিম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যেকোনো কর্মচারী বা ওই প্রতিষ্ঠানের মালিকের জন্য। সুরক্ষা স্কিম অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা নিজ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির যেকোনো-কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলেদের জন্য। সমতা স্কিম হলো দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের জন্য অর্থাৎ যাদের আয় বছরে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা। পেনশনধারীরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি মাসে এই পেনশন সুবিধা ভোগ করবে। নির্ধারিত চাঁদা জমাকারী পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে জমাকারীর নমিনি বাকি সময়কালের জন্য মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো পেনশনভোগী ব্যক্তি যদি ৬৫ বছর বয়সে মারা যান, তাহলে তাঁর নমিনি আরও ১০ বছর পেনশন সুবিধা পাবে। তবে জীবিত থাকলে মৃত্যুর

আগ পর্যন্ত এ সুবিধা পাবে। অর্থাৎ পেনশন সুবিধা পাওয়া যাবে ৬০ বছর হওয়ার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। মোট কথা দেশের সকল বয়স্ক নাগরিককে ৬০ বছরের পর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জনগণের মাঝে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে এক মাইলফলক।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

কর্ণফুলী টানেল (শর্টনোট বা প্যারাথ্রাক্স)

কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মাণাধীন দুই টিউববিশিষ্ট বহুলেনের টানেল হচ্ছে কর্ণফুলী টানেল। একে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বা বঙ্গবন্ধু টানেল বা বঙ্গবন্ধু সুড়ঙ্গ বা কর্ণফুলী সুড়ঙ্গ নামেও ডাকা হয়। এ টানেল যুক্ত করছে চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা এবং দক্ষিণের আনোয়ারা প্রান্তকে। এ টানেলের মধ্য দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সহসাড়ক যুক্ত হবে। কর্ণফুলী টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। তাছাড়া প্রতিটি টিউবের চওড়া ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা ১৬ ফুট। ২০১৯ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি টানেলের বোরিং কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে চীনা প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিসিসিসি) লিমিটেড। ১০ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে সরকার এবং চীনের এলিম ব্যাংক। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ৯৮ শতাংশের অধিক কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ২ শতাংশের কাজ শেষ করার ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২৮ অক্টোবর ২০২৩ প্রকল্পটির উদ্বোধনের দির ধার্য করেছে সরকার। টানেলটি নির্মাণ হলে এটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে প্রথম ও দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ। তাছাড়া টানেলটি চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ অঞ্চলে সুচিত হবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। টানেল চালুর প্রথম বছরেই ৫০ লাখ গাড়ি যাতায়াত করবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। কক্সবাজারের সঙ্গে চট্টগ্রামের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমে যাবে। ২০২৫ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২৮,৫০৫ টি যানবাহন যাতায়াত করতে পারবে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে নতুন অর্থনৈতিক দ্বার উন্মোচিত হবে বাড়বে জিডিপির পরিমাণ। ফলে চীনের সাংহাইয়ের আদলে চট্টগ্রামও হয়ে উঠবে ওয়ান সিটি টু টাউন।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

জিআই পণ্য (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

জিআই (GI)-এর পূর্ণরূপ Geographical indication। এই জিআই পণ্যের স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো WIPO (World Intellectual Property Organization)। কোনো একটি দেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মাটি, পানি, আবহাওয়া ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এবং সেখানকার জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাহলে সেটিকে সে দেশের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় অর্থাৎ পণ্যটি শুধু ওই এলাকা ছাড়া অন্য কোথায় উৎপাদন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্টস, ডিজাইনস এবং ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের পণ্যের ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করে আর তা করে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ববিষয়ক সংস্থার (WIPO) নীতিমালা অনুসারে। জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পেতে একটা পণ্যকে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, পণ্যটি যে মৌলিক তারও প্রমাণ দিতে হয় অর্থাৎ মৌলিকভাবে শুধু যে বাংলাদেশে হয় তার প্রমাণ দিতে হয়। জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্ববাজারে জিআই পণ্যের চাহিদা বাড়ে, রপ্তানি বাড়ে সাথে ঐসকল পণ্যের দামও বাড়ে। কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে এ পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে, বিশ্বব্যাপী পণ্যগুলোর চাহিদা বেড়ে যায়। বাংলাদেশ জিআই পণ্যের স্বীকৃতি চেয়ে আবেদনকৃত পণ্যের মধ্যে ১৭টি পণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। জিআই সনদ পাওয়া ১৭টি পণ্য হলো ইলিশ মাছ, চাপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরসাপাতি আম, দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল ও বাংলাদেশের কালিজিরা চাল, জামদানি শাড়ী, ঢাকাই মসলিন, রাজশাহীর সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি, নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদামাটি, ফজলি আম, বাগদা চিংড়ি, বাংলাদেশের শীতলপাটি, বগুড়ার দই, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া ও আশ্বিনা আম, শেরপুরের তুলশীমালা ধান এবং নাটোরের কাঁচাগোল্লা।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

GI Products (শর্টনোট বা প্যারাগ্রাফ)

The full form of GI is Geographical indication. The only institution that gives recognition of GI production is WIPO (World Intellectual Property Organization). In Bangladesh Department of Patents, Designs and Trademarks under Ministry of Industries gives the recognition of GI products according to the standard and instruction of WIPO (World Intellectual Property Organization). To achieve the GI tag, both the product and its quality must depend

on the geographical place of production. The Geographical Indication Rights prevent all the third-parties and unauthorized users or manufacturers from using the indication in the products that do not conform to the applicable standards. It allows expanding business a global level. The right builds a global reputation around the world and therefore it helps in the growth of the tourism industry of that particular region as well. Currently, Bangladesh has 17 GI registered products, namely hilsa, the Khirsapat mango of Chapainawabganj, Kataribhog rice of Dinajpur, Kalijira rice of Bangladesh, the Jamdane, Maslin of Dhaka, silk of Rajshahi, Shatranji of Rangpur, White Clay (Sada Mati) of Vijoypur in Netrakona, Fazli Mango, Bagda Shrimp, Shitolpati of Bangladesh, the Langra mango of Chapainawabganj, the Ashini mango of Chapainawabganj, Tulshimala Rice of Sherpur and Curd of Bogra and Natorer Kachagolla.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

www.exambd.net

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। এটি সরকারের মেগাপ্রকল্পের একটি। মহাসড়ক যখন মাটি থেকে উপরে পিলারের উপর নির্মিত হয়ে, তখন সেটিকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বলা হয়। মূলত মহাসড়কে চলাচলের নানা বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে বিরামহীনভাবে যান চলাচলের সুবিধা দিতেই এই এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া। এটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও হয়ে মগবাজার, কমলাপুর, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী এলাকায় গিয়ে শেষ হবে। এই প্রকল্পের মূল দৈর্ঘ্য ১৯.৭৩ কিলোমিটার। তবে সংযোগ সড়কসহ এটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। যানবাহন চলাচলের জন্য প্রস্তুত বিমানবন্দরের কাওলা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত এই ১১ কিলোমিটার। যা ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অংশে ১৫টি র্যাপ রয়েছে। এই এক্সপ্রেসওয়েটিতে ১১টি টোলপ্লাজা থাকবে। ২০০৯ সালে কাজ শুরু হওয়া প্রকল্পটির চালু হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালে। তবে নানা জটিলতায় প্রায় এক যুগ পিছিয়ে এর নির্মাণ কাজ। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। এটি থাইল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড ৫১ শতাংশ, চীনা প্রতিষ্ঠান শেনডং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন লিমিটেড ১৫ শতাংশ এবং সিনোহাইড্রো করপোরেশন লিমিটেড ১৫ শতাংশ অংশীদারিত্বে নির্মাণ হচ্ছে। এই প্রকল্পের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ফাস্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি লিমিটেড। এই এক্সপ্রেসওয়ের সুবিধা নিতে হলে যানবাহনের মালিকদের টোল দিয়ে উড়ালসড়কে উঠতে হবে। যানবাহনভেদে টোল নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বনিম্ন ৮০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা। এর উপর দিয়ে দৈনিক প্রায় ৮০ হাজার যানবাহন চলাচল করতে পারবে। এই মহাসড়কে চলাচলাকারী যানবাহন গন্তব্যে পৌঁছে যাবে অন্য যানবাহনের তুলনায় কম সময়ে এবং একটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে। এছাড়া এ প্রকল্পটি কল্যাণে ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে কমে যাবে এবং ভ্রমণের সময় এবং খরচ দুটোই বাঁচবে। বিমানবন্দরের কাওলা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত এই ১১ কিলোমিটার চালু হলেও পুরো

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ। বাকি অংশের কাজ ২০২৪ সালের মাঝামাঝিতে শেষ হবে।

Dhaka Elevated Expressway

An elevated expressway is a type of highway constructed above the ground level, typically on pillars or columns. Dhaka Elevated Expressway is the country's first elevated expressway project. This elevated expressway is connecting the Shahjalal airport with Kutubkhali via Mohakhali, Tejgaon and Kamalapur of Dhaka. To ease traffic jam in the capital, this is one of the largest infrastructure projects taken by the present government. The length of the expressway is 19.73 km with the total length of 46.73 km including the connecting ramps. The 19.73 km expressway costs tk 8940 crore. On September 2, 2023, Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the 11.5 km Airport-Farmgate section of the Dhaka Elevated Expressway. Commuters can cover the distance between Kawla and Farmgate in just 10 minutes with the speed reaching up to 60 km per hour. The vehicles using the Dhaka Elevated Expressway are to pay tolls being in four categories. There is a restriction on three wheelers and motorcycles to ply on the expressway. The rest of the project is expected to open by the mid of the next year. Thanks to the Dhaka Elevated Expressway commuters can save travel time and money within the capital city and it will ultimately reduce the traffic congestion as well.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

পদ্মা রেল সেতু

পদ্মা বহুমুখী সেতু হলো বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। ২৫ জুন ২০২২ পদ্মা সড়ক সেতুর উদ্বোধন হলেও রেল সেতুর কাজ অসম্পন্ন থাকায় তা উদ্বোধন করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১০ অক্টোবর ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে রেল চলাচল শুরু হবে পদ্মা সেতু দিয়ে। এ সেতু উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিমি দীর্ঘ নতুন রেলপথ নির্মাণ করছে রেলওয়ে। এর মধ্যে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার চালু হচ্ছে আগামী ১০ অক্টোবর। এই রেলপথ জিটুজি (সরকারের সঙ্গে সরকারের) ভিত্তিতে চীনের অর্থায়নে নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কাজ করছেন চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চায়না রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। ২০১৬ সালের ৩ মে এই প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা তবে পরবর্তীতে এর নির্মাণ ব্যয় বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকায়। গত ৪ এপ্রিল পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল শুরু হয় এই সেতু দিয়ে। এটি বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। এই সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে যাতায়াত ও বাণিজ্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ঢাকা যশোর ট্রেনে চলাচল করা যাবে দুই ঘণ্টারও কম সময়ে। এতে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সময় বাঁচবে। পদ্মা সড়ক সেতু ও রেল সেতু হয়ে উঠেছে দেশের অর্থনৈতিক করিডোরের মূল কেন্দ্র। এ সেতুর সড়ক ও রেল সংযোগ আঞ্চলিক নয় আন্তর্জাতিক সংযোগও বটে। ট্রান্স-এশিয়ান রেল ও সড়ক এ সেতুর মাধ্যমেই যুক্ত হবে। পদ্মা রেল সেতু চালু হলে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ২১ জেলার সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে। ফলে এ অঞ্চলের কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং মাঝারি শিল্পের পণ্য পরিবহনে সময় ও অর্থ কম লাগবে, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করবে।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে মশাবাহিত ভাইরাস ঘটিত রোগ। এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয়ে থাকে। এ রোগে প্রথমবার আক্রান্ত হলে রোগীর বিশেষ কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। শুধু অল্প কিছু ক্ষেত্রেই রোগের প্রভাব গভীর হয়। ডেঙ্গুর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো উচ্চ জ্বর (১০২ ডিগ্রী থেকে ১০৪ ডিগ্রী), তীব্র মাথা ব্যাথা, প্রচণ্ড পেট ব্যাথা, চোখের নিচে যন্ত্রণা, ক্রমাগত বমি হওয়া, মাড়ি ও নাক থেকে রক্তপাত, তকের নিচে রক্তক্ষরণ, অনেক সময় অনিয়মিত পায়খানা এবং প্রস্রাব ও মলের সাথে রক্তপাত হওয়া। আগে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর অবস্থা ৬ দিন পর সংকাটাপন্ন হতো। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ১ বা ২ দিন পরই রোগীর অবস্থা অবনতি হচ্ছে। একজন ব্যক্তি সারাজীবনে একাধিকবার এমনকি চারবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারেন। যেহেতু ডেঙ্গু জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই সেহেতু ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার যেমন (ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের জুস এবং খাবার স্যালাইন) খেতে হবে এবং অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। তাছাড়া রোগীকে ভিটামিন সি, জিঙ্ক, আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তবে রোগীকে অবশ্যই আমিষ, চর্বি ও তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। ডেঙ্গু রোগের প্রতিকার হিসেবে নিজেকে এডিশ মশার কামড় থেকে বাঁচাতে হবে এজন্য শরীর ঢাকা জামাকাপড় পড়তে হবে, রাতে শোবার সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। মশা নিরোধক কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে আর সর্বোপরি বাড়ির চারপাশে জল জমতে দেওয়া যাবে না। এক পরিসংখ্যান থেকে উঠে এসেছে যে বাংলাদেশে ২০২১ সালে ডেঙ্গু জ্বরে মারা যাওয়া রোগীর সংখ্যা ১০৫ জন তা ২০২২ এসে দাঁড়ায় ২৮১ জনে আর ২০২৩ সালে এ ডেঙ্গু জ্বর মহামারি আকার ধারণ করেছে। এ বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ ৬১৮ জন রোগী মারা গেছে যা অতীতের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

Dengue Fever

Dengue is a viral infection caused by the dengue virus, transmitted to humans through the bite of infected Aedes mosquitoes, particularly Aedes aegypti. Dengue is found in

tropical and sub-tropical climates worldwide, mostly in urban and semi-urban areas. It is common in more than 120 countries, mainly in Southeast Asia, South Asia and South America. In Bangladesh, there is highest dengue death this year. Till September 2023, 618 people have died so far and 2023 is the deadliest year in the history of Bangladesh. WHO has already declared dengue in Bangladesh as a pandemic. The number of dengue death was 105 in 2021 whereas in 2022 the number was 281. Most people with dengue have mild or no symptoms and will get better in 1–2 weeks. Rarely, dengue can be severe and lead to death. The symptoms include high fever (40°C/104°F), severe headache, pain behind the eyes, muscle and joint pains, nausea, vomiting and rash. Individuals infected for the second time can have severe abdominal pain, persistent vomiting, rapid breathing, bleeding gums or nose, fatigue, restlessness, blood in vomit or stool, being very thirsty, pale and cold skin and feeling weak. The mosquitoes that spread dengue are active during the day. People can lower the risk of getting dengue by protecting themselves from mosquito bites by using clothes that cover as much of your body as possible, mosquito nets during the day or window screens, mosquito repellents and coils and vaporizers. The dengue patients should take rest, drink plenty of liquids and should contact a doctor as soon as possible if severe symptoms are noticed. As there is no specific treatment for dengue/severe dengue, and early detection and access to proper medical care greatly lower fatality rates of severe dengue.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

ক্যাশলেস বাংলাদেশ (শর্টনোট)

বিনিময় প্রথা থেকে শুরু করে কাণ্ডজে মুদ্রার গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে অনলাইন এবং মোবাইল ব্যাংকিং এখন মানুষের দোরগোড়ায়। ব্যাংক চেক, তারবার্তার মাধ্যমে মানি ট্রান্সফার, ওয়্যারলেস ট্রান্সফার পরিষেবা ও ইলেকট্রনিক যুগে এটিএম কার্ডসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার সংযোজন ঘটেছে। বাংলাদেশের অনেক মানুষ এই ইলেকট্রনিক লেনদেনে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোভিড-১৯ সময়ে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে টাকা পরিশোধ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশকে ক্যাশলেস বাংলাদেশে রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' স্লোগানকে সামনে রেখে প্রায় ১২০০ মার্চেন্ট নিয়ে রাজধানীর মতিঝিলে ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে কিউআর কোডভিত্তিক সার্বজনীন পরিশোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ ক্যাশলেস বা নগদবিহীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। নগদ অর্থে লেনদেন না করে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার মূল্য প্রদান করাকেই ক্যাশলেস পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে দেশের সকল ফিন্যান্সিয়াল ট্রানজিকশন মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, মোবাইল অ্যাপসে পেমেন্ট, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং অন্য যেকোনো অনলাইন পেমেন্ট করা অর্থ আদান-প্রদানও নগদবিহীন লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত। ক্যাশলেস বাংলাদেশের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সকল আর্থিক লেনদেন হবে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে। অ্যাপে বাংলা কিউআর কোডের মাধ্যমে সব ব্যাংকের গ্রাহক পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে। এছাড়া বিকাশ, নগদ, এমক্যাশ, রকেটের মতো মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অ্যাপ দিয়েও পণ্যের দাম পরিশোধ করা যাবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে লেনদেনকে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল লেনদেনের আওতায় নিয়ে আসতে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী ৪ বছরের মধ্যে (২০২৭) ৭৫ শতাংশ লেনদেন ক্যাশলেস মাধ্যমে আনার লক্ষ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। যেসব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাশলেস বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তাদের সেবার আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের ব্যবসাও বাড়বে। বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। ক্যাশলেস বাংলাদেশ সেবা চালুর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। এছাড়া এ পদ্ধতিতে

ক্রেতা ও বিক্রেতা কাউকেই ক্যাশ টাকা হাতে রাখার প্রয়োজন হবে না, ফলে উভয়ই চুরি-ডাকাতি ও চিনতাই এর হাত থেকে রেহাই পাবে। ক্যাশলেস অর্থনীতির প্রধান সুবিধা হচ্ছে-মুদ্রা মুদ্রণ এবং পরিচালনার খরচ হ্রাস। এছাড়া খুচরা টাকার ঝামেলা ও সময়ের অপচয় কমে, নকল বা জাল টাকার জালিয়াতি থেকে সুরক্ষিত। আর এ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশে সকল লেনদেনের অর্থাৎ নগদ অর্থবিহীন লেনদেনই হলো ক্যাশলেস বাংলাদেশ।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

সর্বজনীন পেনশন

বাংলাদেশে বর্তমান গড় আয়ুষ্কাল ৭২ বছর। এক প্রাক্কলনে দেখানো হয়েছে ২০৭৫ সালে সেটি হবে ৮৫ বছর। বার্ষিক্যজনিত কারণে একটা জনগোষ্ঠী অভাবগ্রস্থ হবে এবং একটা সময়ে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এই সাহায্য লাভের অধিকার দেশের প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। বর্তমানে দেশে শুধু সরকারি কর্মচারীরা পেনশন পেলেও বেসরকারি চাকরিজীবীসহ সবাইকে পেনশনের আওতায় আনার প্রয়োজন ছিল। দেশের এই অংশ বঞ্চিত হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনগণের মাঝে সঙ্ঘর্ষের প্রবণতা বৃদ্ধি করা, জীবনযাত্রার মানকে দারিদ্রসীমার উপরে রাখার লক্ষ্যে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন-২০২২' এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দেন মন্ত্রিসভা। একে চূড়ান্তরূপ দিতে ২৩ জানুয়ারি ২০২৩, জাতীয় সংসদে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল ২০২৩' কঠোরভাৱে পাস হয়। এবং ১৭ আগস্ট ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী এ পেনশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী দেশের ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল নাগরিক এই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারবে। বিশেষ ব্যবস্থায় এর বেশি বয়সীরাও এ পেনশনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীরাও এ ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারবে। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের আপাতত নতুন জাতীয় পেনশন-ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে। সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচিতে চারটি স্কিম রাখা হয়েছে এগুলো হলো যথাক্রমে প্রবাস স্কিম, প্রগতি স্কিম, সুরক্ষা স্কিম এবং সমতা স্কিম। প্রবাস স্কিম বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য। প্রগতি স্কিম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যেকোনো কর্মচারী বা ওই প্রতিষ্ঠানের মালিকের জন্য। সুরক্ষা স্কিম

অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা নিজ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির যেন-কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলেদের জন্য। সমতা ফ্রিম হলো দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের জন্য অর্থাৎ যাদের আয় বছরে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা। পেনশনধারীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি মাসে এই পেনশন সুবিধা ভোগ করবে। নির্ধারিত চাঁদা জমাকারী পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে জমাকারীর নমিনি বাকি সময়কালের জন্য মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো পেনশনভোগী ব্যক্তি যদি ৬৫ বছর বয়সে মারা যান, তাহলে তাঁর নমিনি আরও ১০ বছর পেনশন সুবিধা পাবে। তবে জীবিত থাকলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ সুবিধা পাবে। অর্থাৎ পেনশন সুবিধা পাওয়া যাবে ৬০ বছর হওয়ার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। মোট কথা দেশের সকল বয়স্ক নাগরিককে ৬০ বছরের পর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জনগণের মাঝে সম্বয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে এক মাইলফলক।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

কর্ণফুলী টানেল

কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মাণাধীন দুই টিউববিশিষ্ট বহুলেনের টানেল হচ্ছে কর্ণফুলী টানেল। একে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বা বঙ্গবন্ধু টানেল বা বঙ্গবন্ধু সুড়ঙ্গ বা কর্ণফুলী সুড়ঙ্গ নামেও ডাকা হয়। এ টানেল যুক্ত করেছে চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা এবং দক্ষিণের আনোয়ারা প্রান্তকে। এ টানেলের মধ্য দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সহসড়ক যুক্ত হবে। কর্ণফুলী টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। তাছাড়া প্রতিটি টিউবের চওড়া ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা ১৬ ফুট। ২০১৯ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি টানেলের বোরিং কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে চীনা প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিসিসিসি) লিমিটেড। ১০ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে সরকার এবং চীনের এক্সিম ব্যাংক। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ৯৮ শতাংশের অধিক কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ২ শতাংশের কাজ শেষ করার ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২৮ অক্টোবর ২০২৩ প্রকল্পটির উদ্বোধনের দির্ঘ ধার্য করেছে সরকার। টানেলটি নির্মাণ হলে এটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে প্রথম ও দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ। তাছাড়া টানেলটি

চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ অঞ্চলে সুচিত হবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। টানেল চালুর প্রথম বছরেই ৫০ লাখ গাড়ি যাতায়াত করবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। কক্সবাজারের সঙ্গে চট্টগ্রামের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমে যাবে। ২০২৫ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২৮,৫০৫ টি যানবাহন যাতায়াত করতে পারবে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে নতুন অর্থনৈতিক দ্বার উন্মোচিত হবে বাড়বে জিডিপির পরিমাণ। ফলে চীনের সাংহাইয়ের আদলে চট্টগ্রামও হয়ে উঠবে ওয়ান সিটি টু টাউন।

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন

জিআই পণ্য

জিআই (GI)-এর পূর্ণরূপ Geographical indication। এই জিআই পণ্যের স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো WIPO (World Intellectual Property Organization)। কোনো একটি দেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মাটি, পানি, আবহাওয়া ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এবং সেখানকার জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাহলে সেটিকে সে দেশের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় অর্থাৎ পণ্যটি শুধু ওই এলাকা ছাড়া অন্য কোথায় উৎপাদন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্টস, ডিজাইনস এবং ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের পণ্যের ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করে আর তা করে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ববিষয়ক সংস্থার (WIPO) নীতিমালা অনুসারে। জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পেতে একটা পণ্যকে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, পণ্যটি যে মৌলিক তারও প্রমাণ দিতে হয় অর্থাৎ মৌলিকভাবে শুধু যে বাংলাদেশে হয় তার প্রমাণ দিতে হয়। জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্ববাজারে জিআই পণ্যের চাহিদা বাড়ে, রপ্তানি বাড়ে সাথে ঐসকল পণ্যের দামও বাড়ে। কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে এ পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে, বিশ্বব্যাপী পণ্যগুলোর চাহিদা বেড়ে যায়। বাংলাদেশ জিআই পণ্যের স্বীকৃতি চেয়ে আবেদনকৃত পণ্যের মধ্যে ১৭টি পণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। জিআই সনদ পাওয়া ১৭টি পণ্য হলো ইলিশ মাছ, চাপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরসাপাতি আম, দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল ও বাংলাদেশের কালিজিরা চাল, জামদানি শাড়ী, ঢাকাই মসলিন, রাজশাহীর সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি, নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদামাটি, ফজলি আম, বাগদা চিংড়ি, বাংলাদেশের শীতলপাটি, বগুড়ার

দই, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া ও আশ্বিনা আম, শেরপুরের তুলশীমালা ধান এবং নাটোরের কাঁচাগোল্লা।

GI Products

The full form of GI is Geographical indication. The only institution that gives recognition of GI production is WIPO (World Intellectual Property Organization). In Bangladesh Department of Patents, Designs and Trademarks under Ministry of Industries gives the recognition of GI products according to the standard and instruction of WIPO (World Intellectual Property Organization). To achieve the GI tag, both the product and its quality must depend on the geographical place of production. The Geographical Indication Rights prevent all the third-parties and unauthorized users or manufacturers from using the indication in the products that do not conform to the applicable standards. It allows expanding business a global level. The right builds a global reputation around the world and therefore it helps in the growth of the tourism industry of that particular region as well. Currently, Bangladesh has 17 GI registered products, namely hilsa, the Khirsapat mango of Chapainawabganj, Kataribhog rice of Dinajpur, Kalijira rice of Bangladesh, the Jamdane, Maslin of Dhaka, silk of Rajshahi, Shatranji of Rangpur, White Clay (Sada Mati) of Vijoypur in Netrakona, Fazli Mango, Bagda Shrimp, Shitolpati of Bangladesh, the Langra mango of Chapainawabganj, the Ashini mango of Chapainawabganj, Tulshimala Rice of Sherpur and Curd of Bogra and Natorer Kachagolla.

Prepared by: এম.আর.জেড.তুহিন